বৈদ্যজাতির বর্ণ ও গৌরব।

বৈদ্যব্রাহ্মণ-সমিতির অন্যতম বিশিষ্টসভ্য

শ্রীজ্ঞানেন্দ্রমোহন সেনশর্ম্ম-

প্রণীত ও প্রকাশিত।

কলিকাতা,

১২৪।৪ মাণিকতলা ষ্ট্রীট

সন ১৩৩৩ শাল।

নিবেদন।

আর্য্যসমাজ ব্রাহ্মণাদি চারি বর্ণে গঠিত। বর্ণ গুণ ও কর্ম্মের বিভাগ ব্যতীত আর কিছুই নহে এবং জাতি বর্ণের অধিকারজ্ঞাপক মাত্র। যে ব্যক্তি যে বর্ণীয় কর্ম্মের অধিকারী, সে সেই জাতি বলিয়া গণ্য হয়; কিন্তু তত্তৎ গুণের অর্জ্জন ব্যতীত সেই বর্ণ বলিয়া কথিত হইতে পারে না। সুতরাং জাতি ও বর্ণ এক কথা নহে। এক্ষণে চাতুর্ব্বর্ণ্য সমন্বিত আর্য্য-সমাজে বর্ণ ও জাতি কালবশে নষ্টপ্রায়। বহুকাল হইতে ম্লেচ্ছসংসর্গে ম্লেচ্ছভাবাপন্ন হইলেও উক্ত সমাজ এখনও স্বীয় বর্ণ ও জাতীয় নাম পরিত্যাগ করিতে প্রস্তুত নহে এবং কখন যে প্রস্তুত হইবে তাহাও বোধ হয় না। অনেকে এই জাতিভেদ উঠাইয়া দিবার জন্য অশেষবিধ চেষ্টা করিয়াছেন, কিন্তু এ পর্য্যন্ত কেহই কৃতকার্য্য হইতে পারেন নাই। বরং তদ্বিপরীতে এক্ষণে নামধারী সকল জাতিকেই স্ব স্ব জাতীয় মর্য্যাদা রক্ষা বা পুনঃ প্রাপ্তির জন্য যত্নশীল দেখিতে পাওয়া যায়। সুতরাং ইহার মধ্যে শ্রীভগবানের কিছু না কিছু মঙ্গল অভিপ্রায় নিহিত আছে বলিয়া মনে হয়। এ কারণ কোন জাতিরই স্ব স্ব জাতীয় নাম ও মর্য্যাদা রক্ষাবিষয়ে অবহেলা করা উচিত নহে। তবে উহার মধ্যে বৃথা আত্মাভিমান ও দ্বেষাদ্বেষি ত্যাগ করিয়া সত্যের আদর করা কর্ত্তব্য অর্থাৎ জাতীয় নাম ও মর্য্যাদা যাহাতে শাস্ত্রসঙ্গতভাবে হয় তাহা করা আবশ্যক। নতুবা তাহা অযথা দ্বন্দ্ববৃদ্ধি ও নানা অশান্তি উৎপাদনের কারণ হইয়া থাকে।

মর্য্যাদাজ্ঞান সর্ব্বপ্রকার উন্নতির মূল। সকলেরই মর্য্যাদাজ্ঞান থাকা আবশ্যক। জাতিগত মর্য্যাদা, কৌলিক মর্য্যাদা, বিদ্যার মর্য্যাদা ও সত্যের মর্য্যাদা বোধ থাকিলে ঐ সকল মর্য্যাদারক্ষা কল্পে লোকের প্রবৃত্তি ও চেষ্টা জন্মে। এই মর্য্যাদাজ্ঞান থাকিলে অনেক সময়ে অপকর্ম্মের হস্ত

হইতে রক্ষা পাওয়া যায়। কোন ব্রাহ্মণসন্তানকে যদি কেহ বলেন যে, তুমি ব্রাহ্মণসন্তান হইয়া ঐরূপ কার্য্য করিতেছ কেন, তাহা হইলে সে অনেক সময়ে লজ্জা পাইয়া কুকর্ম্ম হইতে বিরত হয়। অন্য দিকে আবার অনেকে পিতৃপিতামহাদির বংশমর্য্যাদা স্মরণ করিয়া বিশেষ আয়াস স্বীকার করিয়াও পূর্ব্বপুরুষের কীর্ত্তিরক্ষায় যত্নবান্ হন। এ সমস্ত মর্য্যাদা-জ্ঞানেরই ফল। হিন্দুসমাজের এই পতনাবস্থায় প্রত্যেকেরই মর্য্যাদাজ্ঞান বিশেষভাবে জাগ্রত রাখা উচিত; কারণ তাহা হইলে সেই মর্য্যাদালাভের উপযুক্ত হইবার চেষ্টা আসিতে পারে। কিন্তু বড়ই দুঃখের বিষয় যে, সর্ব্বপ্রকার মর্য্যাদাজ্ঞানই এক্ষণে আমরা হারাইয়াছি। বংশগত মর্য্যাদার জ্ঞান যে টুকু আছে তাহা দাম্ভিকতা মাত্রে পর্য্যবসিত, বংশগত গুণ অর্জ্জন তাহার উদ্দেশ্য নহে। যাঁহার মর্য্যাদাবিষয়ক জ্ঞান আছে তিনি কখন অপরের মর্য্যাদাহানি করিতে চাহেন না। কিন্তু এক্ষণে সকলকে পরস্পর পরস্পরের যথাযথ মর্য্যাদা রক্ষার পরিবর্ত্তে মর্য্যাদার হানি করিতেই যত্নশীল দেখিতে পাওয়া যায়। এরূপ চেষ্টাকে মর্য্যাদাজ্ঞানের অভাবই বলিতে হয়।

আমরা এই প্রবন্ধে বৈদ্যদিগের জাতিগত মর্য্যাদার বিষয়ই আলোচনা করিব। এ দেশে বৈদ্যজাতি একটা অভিনব বা অনির্ব্বচনীয় বস্তু। কারণ তাহাদের স্বরূপ কি, তদ্বিষয়ে সাধারণ ত দূরের কথা, ব্রাহ্মণ পণ্ডিত-গণও এক মত নহেন। কেহ বৈদ্যকে ব্রাহ্মণ ও কেহ বৈশ্য বলিয়া নির্দ্দেশ করেন এবং কেহ বা বৈদ্যদিগের উপনয়ন সংস্কারাদি প্রত্যক্ষ করিয়াও তাহাদিগকে শূদ্র বা বর্ণসঙ্কর বলিতে কুণ্ঠিত হন না। এই জাতির বর্ত্তমান অবস্থা যদি আবহমান কাল হইতে একই ভাবে চলিয়া আসিত, তাহা হইলে সমাজমধ্যে এরূপ মতভেদ সম্ভব হইত না, যাহা সত্য তাহা সকলেই অবগত হইতেন। কিন্তু নানা কারণে সেই সত্য আবৃত হওয়ায় লোকের মধ্যে মতভেদ ঘটিয়াছে। ঐ মতভেদ হয় অজ্ঞানজনিত, না হয়

বিদ্বেষপ্রসূত ইহা অবশ্য স্বীকার্য্য। দেখা যায়, ভারতে বৈদ্যেরা কোথাও ব্রাহ্মণাচারী, কোথাও বৈশ্যাচারী, আর কোথাও বা শূদ্রাচারী রূপে প্রতীয়মান। এই প্রকার ভিন্ন ভিন্ন আচারের সকলগুলিই যে শাস্ত্রসিদ্ধ তাহা কখন হইতে পারে না, কারণ শাস্ত্রে বৈদ্যের আচাব একই প্রকার নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। এই হেতু বৈদ্যমাত্রেরই শাস্ত্রনির্দ্দিষ্ট আচার অবগত হইয়া তদনুসরণ পূর্ব্বক আচারসাম্য ও জাতীয় মর্য্যাদা বক্ষা করা নিতান্ত প্রয়োজনীয়।

বাস্তবিক বৈদ্যসম্বন্ধে এ দেশে একটা ঘোরতর মিথ্যাচার প্রবর্ত্তিত বহিয়াছে। এ বিষয়ে অবশ্য ব্রাহ্মণ, বৈদ্য, কায়স্থ প্রভৃতি সকল জাতিই অল্পাধিক পরিমাণে দায়ী। কিন্তু এক্ষণে বৈদ্যগণ শাস্ত্রাদির সাহায্যে তাঁহাদের বর্ণাধিকার ও মর্য্যাদা বিষয়ে সত্যোদ্ঘাটনে যত্নবান্ হইয়াছেন। এদিকে মিথ্যাচার আমাদের এরূপ অস্থিমজ্জাগত হইয়া পড়িয়াছে যে, যদি কেহ সত্য দেখাইয়া দেন তাহা হইলে আমরা তাঁহার প্রতি বিরক্তি ও অবজ্ঞা প্রকাশ পূর্ব্বক নিজ দাম্ভিকতার পরিচয় প্রদান কবি ও নানা ছলে তাঁহাকে সেই কার্য্য হইতে প্রতিনিবৃত্ত করিবার চেষ্টা করি। কিন্তু ইহা আমরা অবগত নহি যে, সত্যকে কখনই চির অবরুদ্ধ করিয়া রাখা যায় না, উহা কোন না কোন সময়ে আত্মপ্রকাশ করিবেই করিবে। সেই সত্যেরই প্ররোচনায় বৈদ্যদিগের এই বর্ত্তমান প্রয়াস। অতএব ব্রাহ্মণ পণ্ডিতদিগেরও বৈদ্যদিগকে যথাযোগ্য মর্য্যাদা দান করিয়া সত্যের মর্য্যাদা রক্ষা করা অবশ্য কর্ত্তব্য।

প্রাচীন আর্য্যজাতির সর্ব্বপ্রধান গুণ ছিল—সত্যপ্রিয়তা বা সত্যের প্রতি ভালবাসা। তাঁহারা মিথ্যার আশ্রয় গ্রহণ করিয়া আপনাদিগকে গণ্য মান্য ও ধন্য বলিয়া খ্যাপন করা অতীব গর্হিত কার্য্য বলিয়া বিবেচনা করিতেন। কিন্তু এক্ষণে এ দেশে সেই সত্যপ্রিয়তার নিতান্ত অভাব

ঘটিয়াছে। নিকৃষ্টজাতি উচ্চজাতি অপেক্ষা বড় হইবার জন্য অথবা এক জাতি অপর জাতিকে তাহার ন্যায়তঃ প্রাপ্য অধিকার ও মর্য্যাদা হইতে বঞ্চিত করিয়া আত্ম-সম্মান অক্ষুণ্ণ রাখিবার জন্য অযথা দ্বন্দ্বের সৃষ্টি করিতেছেন। এমন কি আমাদের সমাজে যাঁহারা এক্ষণে শ্রেষ্ঠ বলিয়া পরিগণিত, সেই ব্রাহ্মণপণ্ডিতগণের মধ্যে অনেকেই এরূপ সত্যবিমুখ হওয়ায় এবং তাঁহাদেরই নেতৃত্বে সমাজ পরিচালিত হওয়ায়, উহা কর্ণধার বিহীন নৌকার ন্যায় দিক্‌ভ্রান্ত ও নিমজ্জিত হইতে বসিয়াছে। অথচ সে দিকে কাহারও দৃষ্টি নাই। আমাদের মনে হয় যে, সত্যনিষ্ঠ শাস্ত্রজ্ঞ সদ্‌ব্রাহ্মণগণ এ বিষয়ে একটু মনোযোগ করিলে অর্থাৎ তাঁহারা এ সকল বিরোধের মীমাংসা কবিয়া দিলে যাবতীয় সামাজিক দ্বন্দ্বজনিত অমঙ্গল অচিরে দূরীভূত হইতে পারে। কারণ তাঁহারাই সমাজের মধ্যে যথার্থ শ্রেষ্ঠ ও পূজ্য। বহু লোকে তাঁহাদিগকে শ্রদ্ধা করে বলিয়া তাঁহাদের বাক্য সহজে কেহ অবহেলা করিতে পারে না। অতএব জাতীয় দ্বন্দ্ব-মীমাংসার জন্য যাহার যাহা কিছু আবেদন তাহা এই সকল মহাত্মাদের নিকটই উপস্থিত করা উচিত। কিন্তু যদি এ সুযোগ না ঘটে অথবা যদি মহাত্মাগণ এ বিষয়ে ভার লইতে সম্মত না হন, তবে সাধারণকে বাধ্য হইয়া উহা স্বহস্তেই গ্রহণ করিতে হইবে। তাহাতে অনেক সময়ে বিপরীত ফল ফলিবার সম্ভাবনা সত্ত্বেও কদাচ পশ্চাৎপদ হওয়া কর্ত্তব্য নহে।

হে বৈদ্য ভ্রাতৃগণ! এ সময়ে আপনাদের জাতীয় ধর্ম্ম ও মর্য্যাদা রক্ষাকল্পে উদাসীন থাকা কখনই শোভা পায় না। ব্রাহ্মণবর্ণই আপনাদের শাস্ত্রনির্দ্দিষ্ট স্বরূপ; একটু চেষ্টা করিলেই আপনারা সেই স্বরূপে সম্যক্‌-রূপে প্রতিষ্ঠিত হইতে পারিবেন, কারণ আপনাদের পৈতৃক ব্রাহ্মণ্য-মর্য্যাদা লাভের প্রয়াস ভিত্তিহীন, মিথ্যাকল্পিত বা অহঙ্কারপ্রসূত নহে—প্রত্যুত সত্যেই প্রতিষ্ঠিত। সত্য দেখাইয়া দিলে সদ্‌ব্রাহ্মণমাত্রেই সানন্দে

আপনাদের আনুকূল্য করিবেন। কয়েক মাসের মধ্যে অযাচিত ভাবে প্রাপ্ত, পরিশিষ্টে উদ্ধৃত ব্রাহ্মণপণ্ডিতদিগের পত্রাবলী দেখিলেই এ কথার যাথার্থ্য প্রমাণিত হইবে। ঐ দেখুন, তাঁহাবা সকলে সর্ব্বান্তঃকরণে আপনাদিগকে কিরূপ উৎসাহিত করিতেছেন! অতএব আপনারা আর বৃথা কালক্ষেপ না করিয়া মোহনিদ্রা পরিহার পূর্ব্বক গাত্রোত্থান করুন এবং জাতীয় সদাচার গ্রহণপূর্ব্বক তদনুরূপ চরিত্রগঠনে মনোনিবেশ করুন, তাহা হইলেই পিতৃপুরুষগণের মুখরক্ষা হইবে এবং আপনারাও ধন্য হইবেন। নতুবা আপনারা নিজেকে যত বড়ই বিদ্বান্, বুদ্ধিমান ও ধার্ম্মিক বলিয়া ভাবুন না কেন, সমাজে আপনাদিগকে পিতৃপুরুষদিগের কলঙ্কস্বরূপ ও ধর্ম্মের নিকট চির অপরাধী হইয়া থাকিতে হইবে সন্দেহ নাই। এই পুস্তকে আপনাদের জাতীয় স্বরূপাবগতির নিমিত্ত কয়েকটি কথা জ্ঞাপন করা হইল। ইহাতে আমরা শাস্ত্র, যুক্তি ও লোকাচার ভিন্ন গায়ের জোরে কোন কথাই উল্লেখ করি নাই। এক্ষণে আপনারা নিরপেক্ষভাবে এ বিষয়ের সত্যাসত্য নিরূপণপূর্ব্বক স্থির সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়া তদনুযায়ী কার্য্য করিতে অগ্রসর হউন, ইহাই আপনাদের নিকট আমাদের বিনীত প্রার্থনা। আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস যে, যে কেহ এই গ্রন্থলিখিত বিষয়গুলি পক্ষপাতশূন্য হইয়া আলোচনা করিবেন, বৈদ্যের বিশুদ্ধ ও মুখ্য ব্রাহ্মণত্ব সম্বন্ধে তাঁহার কিছুমাত্র সংশয় থাকিবে না, ইহা ধ্রুব।

হে বৈদ্য যুবকবৃন্দ! এ বিষয়ে তোমাদেরও বিশেষ কর্ত্তব্য রহিয়াছে। তোমরা শাস্ত্রানুশীলন করিয়া সত্যের আলোকে উদ্ভাসিত হও। তোমাদের পিতৃপরিচয় তোমরা অবগত নহ। তোমরা সিংহ হইয়া অজ্ঞানবশতঃ মেষদলভুক্ত হইয়াছ এবং আপনাদিগকে মেষ বলিয়া মনে করিতেছ। তোমরা অসৎ লোকের শিক্ষায় এবং হীন-সংসর্গে আপনাদিগকে হীন বলিয়া বিবেচনা করিতেছ এবং তোমাদের এমনই দুর্গতি

ঘটিয়াছে যে, তোমরা আত্মপরিচয় না জানা হেতু তোমাদের পিতৃ-পুরুষদিগকে পদে পদে অবমানিত করিতেছ। কিন্তু দেখিতেছ না যে, সেই পাপের ফলেই তোমরা এতাদৃশ মলীন হইয়া পড়িয়াছ ও দিন দিন অধঃপাতিত হইতেছ। অতএব এক্ষণে একবার শাস্ত্রদর্পণে তোমাদের যথার্থ স্বরূপ নিরীক্ষণ করিয়া প্রবুদ্ধ হও এবং সকল দীনতা পরিত্যাগ কর। অজ্ঞ ও অসৎ লোকের কথায় প্রতাবিত হইয়া নিজেকে অবসন্ন হইতে দিও না। তোমাদের পিতৃপুরুগণ বিদ্যাবত্তা, বুদ্ধিমত্তা, সচ্চরিত্রতা, দক্ষতা ও পবিত্রতা গুণে বিভূষিত ও চাতুর্ব্বর্ণ্য সমাজের শিরোমণি ছিলেন। তোমরা তাঁহাদের এই মহত্ব হৃদয়ে অঙ্কিত করিয়া তাঁহাদেরই অনুরূপ চরিত্রগঠনে প্রযত্ন কর। কদাচ হীন কার্য্যে প্রবৃত্ত হইও না। জানিও, তোমরাই ভবিষ্যৎ জাতীয় উন্নতির একমাত্র আশা ভরসাস্থল। সদাচার তোমাদের ব্রত হউক, বিদ্যা তোমাদের তপস্যা হউক এবং তোমাদের বৈদ্যনাম সার্থক হউক! শ্রীভগবানের মঙ্গলময় আশীর্ব্বাদ তোমাদের উপর বর্ষিত হউক! তোমরা পিতৃপুরুষদিগের সেই প্রাচীন মহত্ব লাভ করিয়া ধন্য হও।

এক্ষণে সাধু ও বিজ্ঞ ব্রাহ্মণমহোদয়গণের নিকট আমাদের বিনীত নিবেদন এই যে, তাঁহারা শ্রুতি, স্মৃতি, পুরাণ, ইতিহাসাদি হইতে জাতিতত্ব আলোচনা দ্বারা সত্যনির্ণয় করিয়া দিন, তাহা হইলে সমাজ জাতিবিষয়ক ভ্রান্তি ও বিদ্বেষের তমোজাল ছিন্ন করিয়া সত্যপথে অগ্রসর হইবে। তাঁহারাই সত্যদর্শী, শাস্ত্রপরায়ণ, সর্ব্বজীবের সুহৃৎ বা কল্যাণকামী, শান্তি-প্রিয় এবং তাঁহারাই সমাজের মস্তকমণি। আজ আমরা শাস্ত্র, যুক্তি ও লোকাচার-সম্বলিত পুস্তকখানি লইয়া অবনত মস্তকে তাঁহাদেরই শরণাপন্ন হইলাম।

"পরিশেষে আমাদের বক্তব্য এই যে, বৈদ্যব্রাহ্মণ সমিতি হইতে প্রকাশিত "বৈদ্যপ্রবোধনী" নামক পুস্তিকা ও "বৈদ্যহিতৈষিণী"

নাম্নী মাসিক পত্রিকার প্রচার থাকা সত্ত্বেও বৈদ্যজাতিব তত্ত্ব যাহাতে সংস্কৃতানভিজ্ঞ ব্যক্তিদিগের সুখবোধ্য হয়, তাহাই এই পুস্তক প্রণয়নের প্রধান উদ্দেশ্য। এই জন্যই মূল সংস্কৃত বচনগুলি গ্রন্থ মধ্যে সন্নিবিষ্ট না করিয়া পৃথক্‌ভাবে পরিশিষ্টে প্রদত্ত হইয়াছে [পাঠকগণ যাহাতে মূল বচনগুলি সহজে খুঁজিয়া বাহির করিতে পারেন, তজ্জন্য গ্রন্থমধ্যে বঙ্গানুবাদ-গুলি (   ) চিহ্নিত বন্ধনীর মধ্যে সংখ্যান্বিত করা হইয়াছে এবং উহাদের সংস্কৃত বচনগুলি পরিশিষ্টে সেই সেই সংখ্যা দ্বারাই নির্দ্দেশ করা হইয়াছে]। আরও, বৈদ্যব্রাহ্মণ সমিতি যে কয়েক জন ব্রাহ্মণ পণ্ডিতের পত্র প্রাপ্ত হইয়াছেন তাহা একত্র মুদ্রিত কবাও এই গ্রন্থ প্রণয়নের অন্যতব উদ্দেশ্য। বস্তুতঃ এই পুস্তক "বৈদ্যপ্রবোধনী" ও "বৈদ্যহিতৈষিণী" অবলম্বনেই লিখিত হইয়াছে এবং ইহা প্রণয়নে "বৈদ্যবর্ণ-বিনির্ণয়" "জাতিতত্ত্ববারিধি" "বঙ্গীয় বৈদ্যজাতি" প্রভৃতি গ্রন্থেবও সাহায্য লওয়া হইয়াছে। এস্থলে ইহা উল্লেখ করা আবশ্যক যে, অবসর অভাবে তাড়াতাড়ি এবং রাত্রিকালে প্রুফ্ দেখার জন্য গ্রন্থ মধ্যে অনেক বর্ণাশুদ্ধি রহিয়া গিয়াছে। সুতরাং পাঠকগণ যেন সে দিকে লক্ষ্য না করিয়া গ্রন্থখানি পাঠ করেন, ইহা তাঁহাদের নিকট আমার বিনীত অনুরোধ। আশা করি বর্ণাশুদ্ধি হেতু গ্রন্থলিখিত বিষয় বুঝিবার পক্ষে বিশেষ অসুবিধা হইবে না; এ কারণ শুদ্ধিপত্র দেওয়া হইল না। যাহা হউক, এক্ষণে যদি কাহারও এই পুস্তক পাঠে বৈদ্যজাতি সম্বন্ধে ভ্রান্ত ধারণা অপনোদিত হইয়া শাস্ত্রনির্দ্দিষ্ট স্বরূপের জ্ঞান উদ্বুদ্ধ হয় তাহা হইলে শ্রম সফল জ্ঞান করিব। ইতি—

১০ই আষাঢ় ১৩৩৩ শাল
কলিকাতা

বিনীত নিবেদক
হালিসহর-নিবাসি-
শ্রীজ্ঞানেন্দ্রমোহন সেনশর্ম্মণঃ।

সূচীপত্র।

প্রথম অধ্যায়

বৈদ্যের ব্রাহ্মণত্ব প্রতিপাদনে সদাচার ও জ্ঞানোৎকর্ষ প্রভৃতি।

দ্বিতীয় অধ্যায়

বৈদ্যজাতির স্বরূপ।

তৃতীয় অধ্যায়

চতুর্থ অধ্যায়

বৈদ্যের কর্ত্তব্য।

প্রথম পরিশিষ্ট

দ্বিতীয় পরিশিষ্ট

বৈদ্যজাতির বর্ণ ও গৌরব।

প্রথম অধ্যায়।

বৈদ্যের ব্রাহ্মণত্ব প্রতিপাদনে সদাচার ও জ্ঞানোৎকর্ষ প্রভৃতি।

১। বৈদ্যের অধ্যাপনাধিকার।

মনু কহিয়াছেন—"যজন, যাজন, অধ্যয়ন, অধ্যাপন, দান ও প্রতিগ্রহ ব্রাহ্মণের এই ছয় বৃত্তি। তন্মধ্যে যজন, অধ্যয়ন ও দান এই তিনটি তাহাদের তপস্যা এবং যাজন, অধ্যাপন ও বিশুদ্ধ ব্যক্তির নিকট হইতে প্রতিগ্রহ এই তিনটি জীবিকা।' প্রথম তিনটিতে দ্বিজাতিসাধারণেরই অধিকার আছে, কিন্তু যাজন, অধ্যাপন ও প্রতিগ্রহে একমাত্র ব্রাহ্মণ ব্যতীত ক্ষত্রিয় ও বৈশ্যের অধিকার নাই, ইহা তিনি স্পষ্ট করিয়া বলিয়াছেন। (১)। আবার অধ্যাপনা সম্বন্ধে তিনি বিশেষ করিয়া বলিতেছেন, যথা—'দ্বিজাতি বর্ণত্রয় স্বকর্ম্মে নিরত থাকিয়া বেদাধ্যয়ন করিবেন এবং তাঁহাদের মধ্যে কেবল ব্রাহ্মণই বেদাধ্যাপন করিবেন, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য কদাপি করিবেন না' (২)। আরও, ব্রাহ্মণের যাজন, অধ্যাপন ও প্রতিগ্রহ এই ত্রিবিধ বৃত্তির মধ্যে অধ্যাপনাকেই

সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন, যথা—'স্বকর্ম্ম সমূহের মধ্যে ব্রাহ্মণের বেদাধ্যাপন, ক্ষত্রিয়ের রক্ষণ ও বৈশ্যের বার্ত্তাকর্ম্ম বিশিষ্ট' (৩)।

এই অধ্যাপনাতে বৈদ্যদিগের অধিকার যে আবহমান কাল হইতে প্রচলিত, তাহার যথেষ্ট প্রমাণ পাওয়া যায়। সে দিন পর্য্যন্ত বৈদ্যদিগের টোল এবং অধ্যাপনা নৈপুণ্য সুপ্রসিদ্ধ ছিল। স্বনামধন্য ৺ বঙ্কিম বাবুও তৎপ্রণীত 'ঈশ্বর গুপ্তের জীবনী'তে লিখিয়াছেন যে, কবি ঈশ্বর গুপ্তের জ্যেষ্ঠ পিতামহ পণ্ডিত বিজয়রাম বাচস্পতির একটি টোল ছিল। তাহাতে অনেক ছাত্র সংস্কৃত সাহিত্য, ব্যাকরণ, কাব্য, অলঙ্কার প্রভৃতি তাঁহার নিকট শিক্ষা করিত। আরও, কলিকাতা সংস্কৃত কলেজ যখন ইং ১৮২৪ সনে স্থাপিত হয়, তখন হইতে ইং ১৮৫৪ সন পর্য্যন্ত একমাত্র ব্রাহ্মণ ভিন্ন অন্য কোন জাতি তথায় পড়িতে পারিতেন না। তখন 'ব্রাহ্মণ' বলিলে বৈদ্যকেও বুঝাইত। এ নিমিত্ত বৈদ্যগণও পড়িতে পারিতেন। টোল বিভাগে তখন বৈদ্য অধ্যাপকও ছিলেন। বঙ্গের সংস্কৃত ও বাঙ্গালা উভয় সাহিত্যের শিক্ষাগুরু ব্রাহ্মণ, সেই ব্রাহ্মণ অনেক স্থলে বৈদ্য। যে সংস্কৃত কলেজে ব্রাহ্মণ ব্যতীত অপর কোন বর্ণীয় ব্যক্তি অধ্যাপক পদে বৃত হইতে পারিতেন না, সেই সংস্কৃত কলেজের প্রধান অধ্যক্ষ ছিলেন ৺ কেশবচন্দ্র সেনের পিতামহ ৺ রামকমল সেন। অতএব বৈদ্যদিগের অধ্যাপনাধিকার যে আধুনিক নহে, পূর্ব্ব হইতেই রহিয়াছে তাহা স্পষ্টই বুঝা যাইতেছে। এইরূপ অধিকার থাকার কারণ ইহা ভিন্ন আর কিছুই নহে যে, বৈদ্যগণ ব্রাহ্মণত্ব হেতু মনুপ্রদত্ত অধিকার বরাবর প্রাপ্ত হইয়া আসিতেছেন। এ কথার বিরুদ্ধে কোন প্রকার আপত্তি করা চলে না। তথাপি যদি কেহ আপত্তি করেন, তাহা হইলে বৈদ্যদিগের উক্ত অধিকার কোন্ সময়ে, কি কারণে ও কিরূপে হইল তাহা ঐ আপত্তিকারীকেই নির্দ্দেশ করিতে হইবে ; নতুবা তাহা গ্রাহ্য হইতে পারে না। যাহা হউক,

৭।৮ শত বৎসর হইতে হিন্দুরাজত্বের পতনের সঙ্গে সঙ্গে ব্রাহ্মণ ও বৈদ্যের টোলে প্রাচীন কালের ন্যায় বেদাধ্যাপনা না হইলেও, অপরাপর বিদ্যার অধ্যাপনা চলিয়া আসিতেছে। কিন্তু উভয়ের মধ্যে বৈদ্যগণই আয়ুর্ব্বেদ অধ্যাপনা দ্বারা বেদাধ্যাপনার মর্য্যাদা কতকটা রক্ষা করিয়াছেন বলা যায়।

এতদ্ভিন্ন বৈদ্যগণ ভূরি ভূরি সংস্কৃত গ্রন্থ রচনা করিয়াছেন। গ্রন্থরচনাও প্রকারান্তরে অধ্যাপনা ; যেহেতু লোকশিক্ষার উদ্দেশ্যেই গ্রন্থ রচিত হইয়া থাকে। বৈদ্যপণ্ডিতগণের রচিত কতিপয় গ্রন্থের নাম এ স্থলে উল্লেখ করা যাইতেছে। যথা—বোপদেব গোস্বামীকৃত * মুগ্ধবোধ ব্যাকরণ,কবিকল্পদ্রুম,

---

* বোপদেব গোস্বামী যে বৈদ্য ছিলেন, তাহা তিনি 'শতশ্লোকী' নামক পুস্তিকায় সুস্পষ্টরূপে পরিচয় দিয়াছেন। যথা—'বরদা (করতোয়া) নদীর তটদেশে মহাস্থান নামক যে জনপদ আছে, তথায় ব্রাহ্মণগণের অগ্রগণ্য সহস্র দ্বিজ বাস করিতেন। তাঁহাদের মধ্যে বিদ্বান্‌দিগের শ্রেষ্ঠ ধনেশ ও কেশব নামক বৈদ্যদ্বয়ের যথাক্রমে শিষ্য ও পুত্র শ্রীবোপদেব কবি এই পুস্তকের রচয়িতা' (৪)। এখানে তিনি আপনাকে বৈদ্যের শিষ্য ও বৈদ্যের পুত্র বলিয়া পরিচয় দিলেন এবং বৈদ্যকে ব্রাহ্মণাগ্রণীরূপে পরিচিত করিলেন, ইহাও লক্ষ্য করিবার বিষয়। এই বচনে 'শ্রেষ্ঠ বিদ্বান্' (বিদো বরিষ্ঠৌ) বলিয়া পুনরায় বৈদ্যদ্বয় (বৈদ্যো] বলিয়া উল্লেখ করাতে এই 'বৈদ্য' শব্দ 'বিদ্বান্' অর্থে ব্যবহৃত নহে, প্রত্যুত 'বৈদ্যবংশোদ্ভব' এই অর্থেই প্রযুক্ত বুঝিতে হইবে। মুগ্ধবোধেও তাঁহার পরিচয় এইরূপ লিখিত আছে। যথা বিদ্বান্ (বৈদ্য) ধনেশ্বরের ছাত্র, ভিষক্ কেশবের পুত্র এবং বেদপদের আস্পদ বিপ্র (অর্থাৎ 'বেদ'এই পদ হইতে যে জাতিনাম সিদ্ধ হইয়াছে এরূপ বিপ্র—বৈদ্যব্রাহ্মণ) বোপদেব এই মুগ্ধবোধ রচনা করিয়াছেন।' (৫) এখানেও বোপদেব বৈদ্যরূপে পরিচিত হইয়াছেন। এতদ্ভিন্ন, তিনি নয়খানি বৈদ্যক গ্রন্থ প্রণয়ন করিয়াছেন ইহাও তাঁহার বৈদ্যত্বের প্রকৃষ্ট পরিচায়ক।

শতশ্লোকী, শ্রীমদ্‌ভাগবতের টীকা, মুক্তাফল, পদার্থাদর্শ, অশৌচ-সংগ্রহ, শ্রাদ্ধকাণ্ডদীপিকা (স্মৃতিগ্রন্থত্রয়), কাব্যকামধেনু, সিদ্ধমন্ত্রপ্রকাশ প্রভৃতি বহুগ্রন্থ। জয়দেব গোস্বামীর গীতগোবিন্দ। *

মহেশ্বর কবীন্দ্রের বিশ্বপ্রকাশ কোষ। মেদিনীকরের মেদিনী কোষ, পুরুষোত্তম দেবের দ্বিরূপ কোষ, একাক্ষর কোষ, হারাবলী ও ত্রিকাণ্ড-শেষ। বিশ্বনাথ কবিরাজের সাহিত্যদর্পণ নামক অত্যুপাদেয় অলঙ্কার গ্রন্থ। ত্রিলোচন দাশের কলাপপঞ্জী। গঙ্গাদাশের ছন্দোমঞ্জরী। পিঙ্গল নাগের ছন্দঃশাস্ত্র। ক্রমদীশ্বর দত্তের সংক্ষিপ্তসার ব্যাকরণ। জুমর নন্দীর সংক্ষিপ্তসার বৃত্তি। পদ্মনাভ দত্তের সুপদ্ম ব্যাকরণ। চক্রপাণি দত্তের শব্দচন্দ্রিকা অভিধান। দেবেশ্বর গুপ্তের কবিকল্পলতা নামক অলঙ্কার গ্রন্থ। বল্লাল সেনের দানসাগর (স্মৃতি গ্রন্থ)। মহামহোপাধ্যায় প্রজাপতি দাশের 'পঞ্চস্বরা' নামক প্রসিদ্ধ জ্যোতিষ গ্রন্থ।

---

* জয়দেব গোস্বামী মহারাজ লক্ষ্মণ সেনের পঞ্চরত্ন সভার অন্যতম রত্ন। তিনি লিখিয়াছেন—"ভনতি জয়দেব-কবিরাজ-রাজে।" বঙ্গদেশে ও বঙ্গভাষায় 'কবিরাজ' বলিলে বৈদ্যজাতীয় ব্যক্তিকে বুঝাইয়া থাকে। বঙ্গদেশে কেহ জাতিতে বৈদ্য না হইলে, আপনাকে কবিশ্রেষ্ঠ বুঝাইবার জন্য 'কবিরাজ' শব্দ প্রয়োগ করে না। অতএব জয়দেবের বাক্য হইতেই সপ্রমাণ হইতেছে যে, তিনি জাতিতে বৈদ্য ছিলেন। আরও ব্রাহ্মণদিগের কুলজীতে মহাকবি জয়দেবের নাম নাই। কোন ব্রাহ্মণপণ্ডিত বা কবিকে কবিরাজ বলা হইত এরূপ উল্লেখও নাই। এতদ্ব্যতীত কনোজাগত ব্রাহ্মণসন্তানেরা এত পূর্ব্বে বৈষ্ণব হন নাই। এই সকল প্রমাণ হেতু জয়দেব গোস্বামী যে বৈদ্যবংশীয় ছিলেন তাহা সুনিশ্চয়।

মহামহোপাধ্যায় ভরত মল্লিককৃত সমস্ত মহাকাব্যের টীকা, চন্দ্রপ্রভা ও রত্নপ্রভা নামক কুলপঞ্জিকাদ্বয় এবং অন্যান্য গ্রন্থ। মহামহোপাধ্যায় চতুর্ভুজের কুলপঞ্জী। রামকান্ত দাশ কবিকণ্ঠহারের 'কণ্ঠহার' নামক কুলগ্রন্থ। মহামহোপাধ্যায় চক্রপাণি দত্তের 'চক্রদত্ত', দ্রব্যগুণ, সর্ব্বসারসংগ্রহ প্রভৃতি। শিবদাস সেনের দ্রব্যগুণ ও চক্রদত্তের টীকা। বাগভট্ট গুপ্তের 'অষ্টাঙ্গ হৃদয়' নামক অত্যুপাদেয় চিকিৎসা গ্রন্থ। মাধব কুরের স্বনামপ্রসিদ্ধ নিদান-গ্রন্থ এবং শার্ঙ্গধরের শার্ঙ্গধরসংহিতা প্রভৃতি অসংখ্য বৈদ্যক গ্রন্থ ও অন্যান্য গ্রন্থকারের বহু গ্রন্থ বর্ত্তমান। এই সকল প্রসিদ্ধ সুপণ্ডিত বৈদ্য গ্রন্থকারদিগের অধ্যাপনায় অধিকার ছিল কি না—এ কথাও বলিয়া দিতে হইবে কি ?

ব্রাহ্মণ ভিন্ন ক্ষত্রিয় ও বৈশ্যের গ্রন্থরচনার কথা কদাপি শুনা যায় না। পূর্ব্বে উহা কেবল ব্রাহ্মণদিগেরই অধিকার ভুক্ত ছিল। সুতরাং বৈদ্যেরা যখন অতি প্রাচীনকাল হইতে মনুপ্রদত্ত অধিকারানুযায়ী চতুস্পাঠীতে অধ্যাপনা ও ভূরি ভূরি গ্রন্থ রচনা করিয়া আসিতেছেন, তখন তাঁহাদের ব্রাহ্মণত্বে কোন সংশয় থাকিতে পারে না। মহর্ষি উশনা বৈদ্যের অধ্যাপনাধিকার ও বিপ্রত্ব উভয়ই স্পষ্টতঃ নির্দ্দেশ করিয়াছেন, যথা—'বৈদ্যদিগের মধ্যে নৃপবৈদ্য * শ্রেষ্ঠ। অপর **বিপ্র** (বৈদ্য) নৃপবৈদ্যের শাসনে রোগদুঃখপ্রণাশক বৈদ্য হন। তাঁহারা সকলে আয়ুর্ব্বেদে দীক্ষিত বলিয়া ভিষক্ কথিত হন। চিকিৎসা ও **অধ্যাপনাদি** তাঁহাদের

---

* এখানে উশনা কহিলেন, ভিষক্ বা চিকিৎসক, বৈদ্য অপেক্ষা নৃপবৈদ্য শ্রেষ্ঠ। যে সকল বৈদ্য রাজা হইতেন বা লোকশাসনাদি কার্য্যে নিযুক্ত থাকিতেন তাঁহারা নৃপবৈদ্য নামে অভিহিত হইতেন। বৈদ্যই যে রাজা হইবার বা সর্ব্বলোকের উপর আধিপত্য করিবার প্রকৃত অধিকারী তাহা পরে সপ্রমাণ হইবে।

বৃত্তি বলিয়া জানিবে।' (৬) [৺প্যারীমোহন কবিভূষণ প্রণীত 'বৈদ্য-বর্ণ-বিনির্ণয়' ধৃত বচন]। এখানে 'অধ্যাপনাদি' বলিতে অধ্যাপন, যাজন, প্রতিগ্রহ প্রভৃতি ব্রাহ্মণের ষড়্‌বৃত্তিই বুঝাইয়াছে। ব্রাহ্মণের এই ষড়্‌বৃত্তির অতিরিক্ত চিকিৎসা প্রভৃতি বিশেষ বৃত্তিতে অধিকার থাকা প্রযুক্তই বৈদ্য ব্রাহ্মণ হইতে বিশিষ্ট শ্রেণীরূপে পরিগণিত। যাহা হউক, অন্যান্য প্রমাণের অপেক্ষা না রাখিলেও অধ্যাপনা ও গ্রন্থরচনাই বৈদ্যের ব্রাহ্মণত্ব বিষয়ে যথেষ্ট প্রমাণ।

২। বৈদ্যের স্মার্ত্তত্ব।

উপরোক্ত গ্রন্থসূচী হইতে বৈদ্যপণ্ডিতগণের স্মৃতিশাস্ত্রসম্বন্ধীয় গ্রন্থ রচনার পরিচয় পাওয়া যায়। 'নির্ণয়সিন্ধু' নামক প্রসিদ্ধ স্মৃতিগ্রন্থে কমলাকর ভট্ট অনেক স্থলেই বোপদেবের পদার্থাদর্শ, শ্রাদ্ধকাণ্ডদীপিকা প্রভৃতি স্মৃতিগ্রন্থের মত প্রমাণস্বরূপে উদ্ধৃত করিয়াছেন। স্বয়ং বাসুদেব সার্ব্বভৌমের পুত্র দুর্গাদাস বোপদেবের ব্যাকরণের এবং স্মার্ত্তশিরোমণি হিমাদ্রি তাঁহার 'হরিলীলা' ও 'মুক্তাফল' গ্রন্থের টীককার। বোপদেব অব্রাহ্মণ হইলে ইহা কখনই সম্ভব হইত না। মহারাজ বল্লাল সেনকৃত দানসাগরও স্মৃতি গ্রন্থ।

৩। বৈদ্যের যাজনাধিকার।

আমরা পূর্ব্বেই দেখাইয়াছি যে, মনুর মতে ব্রাহ্মণের যাজন, অধ্যাপন ও প্রতিগ্রহ এই ত্রিবিধ বৃত্তির মধ্যে অধ্যাপনাই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ এবং উশনাও বৈদ্যদিগের অধ্যাপনাধিকার স্পষ্টতঃ নির্দ্দেশ করিয়াছেন। অতএব এই অধ্যাপনাতেই যে বৈদ্যের অধিকার দেখা যাইতেছে, তাঁহাদের তদপেক্ষা নিকৃষ্ট বৃত্তি যাজনেও যে সম্পূর্ণ অধিকার আছে তাহা বলাই বাহুল্য। বিশেষতঃ তাঁহাদের চিরপ্রসিদ্ধ গুরুবৃত্তিই যাজনাধিকার সপ্রমাণ করিতেছে।

তবে তাঁহারা পুণ্যতম চিকিৎসা ও ব্রাহ্মণ সাধারণের শ্রেষ্ঠ বৃত্তি অধ্যাপনা ত্যাগ করিয়া সহজে নিকৃষ্ট বৃত্তি যাজকতায় প্রবৃত্ত হইতেন না।

শ্রীখণ্ডের ঠাকুরগণ, ভাজনঘাট ও বোধখানার গোস্বামিগণ যে অদ্যাবধি দীক্ষাগুরুর কার্য্য করিয়া আসিতেছেন, তাহা সকলেই অবগত আছেন। কাব্যপ্রকাশ-প্রণেতা মম্মথ ভট্ট উক্ত গ্রন্থে গীতা প্রভৃতির ভাষ্যকার শ্রীমৎ অভিনব গুপ্তকে আরাধ্যপাদ গুরু বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন (৭)। 'চৈতন্যচরিত' গ্রন্থে লিখিত আছে—'শ্রীগৌরাঙ্গদেবের পারিষদ সদাশিব কবিরাজের পুত্র পুরুষোত্তম কবিরাজের চারিজন ব্রাহ্মণোত্তম শিষ্য ছিলেন, তাঁহাদের নাম শ্রীমুখ, মাধবাচার্য্য, যাদবাচার্য্য ও দৈবকীনন্দন দাস। দৈবকীনন্দন বৈষ্ণববন্দনা নামক পুস্তক রচনা করিয়া গৌড়মণ্ডলে বিখ্যাত হইয়াছিলেন (৮)। ভরত মল্লিকের চন্দ্রপ্রভাতেও গুরু-বৃত্তিক ঠাকুর বংশের পরিচয় পাওয়া যায়, যথা—'লোকে যাঁহাকে রায় ঠাকুর বলিত তিনি বৈষ্ণবত্ব হেতু জগতে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিলেন। তিনি দয়াপরবশ হইয়া ব্রাহ্মণাদি নিখিল জাতিকে হরিমন্ত্র দান করিতেন' (৯)। ইহা ভিন্ন ঐ গ্রন্থে পুরুষোত্তম ঠাকুর, বংশীবাদন ঠাকুর, শ্রীগৌরাঙ্গ ঠাকুর, চক্রপাণি ঠাকুর, রাম ঠাকুর, রাধামাধব ঠাকুর, কান্দু ঠাকুর, কানু ঠাকুর প্রভৃতি বিভিন্ন বংশীয় ঠাকুরদিগের পরিচয় প্রদত্ত হইয়াছে।

কেহ হয়ত বলিবেন যে, কবিরাজ গোস্বামী প্রভৃতি মহাপুরুষগণ শ্রীচৈতন্যদেবের অনুগৃহীত হইয়া গুরুবৃত্তির অধিকারী হইয়াছিলেন। তদুত্তরে বক্তব্য এই যে, শ্রীচৈতন্যদেব তাৎকালিক সামাজিক প্রথার বিরোধাচরণ করিয়াছিলেন, ইহা মনে করা সঙ্গত নহে। বৈদ্য ব্রাহ্মণ না হইলে তিনি কখনই তাঁহার অনুগৃহীত বৈদ্যদিগকে গুরুবৃত্তির অধিকার দিতেন না। আরও, বহু প্রাচীন বোপদেব গোস্বামী, জয়দেব গোস্বামী

প্রভৃতির দৃষ্টান্তে বৈদ্যেরা মহাপ্রভুর বহু পূর্ব্ব হইতেই গুরুবৃত্তির অধিকারী ছিলেন ইহা জানা যায়। অধিক বলা নিস্প্রয়োজন, ঋগ্বেদীয় আশ্বলায়ন গৃহ্যসূত্রের নিম্নলিখিত বচনেই ইহা সপ্রমাণ হয় যে, প্রধান প্রধান যজ্ঞ সম্পাদন করিবার অধিকার বৈদ্যব্রাহ্মণেরই ছিল, সাধারণ যাজক ব্রাহ্মণদিগের ছিল না। যথা—'যিনি স্বয়ং শূলগব যজ্ঞ অনুষ্ঠান করিয়াছেন সেই অনুষ্ঠানকুশল বৈদ্যব্রাহ্মণকে ঐ যজ্ঞ কার্য্যে উপবেশন করাইবে' ইত্যাদি (১০)। অতএব প্রধান প্রধান বৈদিক যজ্ঞে যাঁহাদের অধিকার থাকা দৃষ্ট হইতেছে, সামান্য যাজকতায় তাঁহাদের অধিকার নাই, এ কথা বলা বাতুলতা বৈ আর কিছুই নহে।

৪। বৈদ্যের বিশুদ্ধ ও পুণ্যতম বৃত্তি।

সেদিন পর্য্যন্তও বৈদ্যদিগের ব্রাহ্মণোচিত ষড়বৃত্তি প্রসিদ্ধ ছিল। অর্থ লইয়া চিকিৎসা করা বৈদ্যের ধর্ম্ম নহে, এজন্য প্রাচীন চিকিৎসকেরা স্বয়ং ঔষধ বিক্রয় করিতেন না, ধনবান্ রোগী প্রভৃতিকে দিয়া ঔষধ প্রস্তুত করাইতেন এবং চতুর্থাংশ 'ধন্বন্তরি ভাগ' লইয়া উহা বিনা মূল্যে বিতরণ করিতেন। ঔষধ বিক্রয় করিলে পাছে পাতিত্য হয়, এই আশঙ্কায় তাঁহারা অধিক ঔষধ ঘরে রাখিতেন না। তাঁহারা রোগী দেখিয়া প্রথমে একটি প্রণামী এবং আরোগ্যলাভের পর তাহার স্বেচ্ছাপ্রদত্ত সিধা, তৈজস ও দক্ষিণা প্রভৃতি বিদায় পাইতেন। এখনও বিরল হইলেও স্থানে স্থানে এ প্রথার অস্তিত্ব দেখিতে পাওয়া যায়। ব্রাহ্মণের পক্ষে যেরূপ যাজন ও অধ্যাপনা দ্বারা অর্থ সংগ্রহ করা নিষিদ্ধ, বৈদ্যের পক্ষেও চিকিৎসা দ্বারা অর্থোপার্জ্জন করা শাস্ত্রমতে তদ্রূপই অবিধেয়। এখনকার কথা স্বতন্ত্র।

মহর্ষি চরক বলেন—'নিজ স্বার্থসিদ্ধির জন্য বা কোন কাম্যবস্তু লাভের জন্য চিকিৎসা না করিয়া যিনি কেবল ভূতগণকে দয়া করিবার জন্য চিকিৎসা করেন, তিনি সকলকে অতিক্রম করেন অর্থাৎ তিনি সর্ব্বাপেক্ষা উৎকৃষ্ট ফললাভ করেন। কিন্তু যে ব্যক্তি পণ্যদ্রব্যের ন্যায় চিকিৎসা বিক্রয় করে, সে কাঞ্চনরাশি ত্যাগ করিয়া ভস্মরাশি ভজনা করে' (১১)। ভাবপ্রকাশ গ্রন্থেও লিখিত আছে—'লোভবশতঃ কখন চিকিৎসার পুণ্য বিক্রয় করিবে না' (১২)। শাস্ত্রে ইহাও উক্ত আছে—'কোটী গাভী দান করিলে যে ফললাভ হয় একটিমাত্র রোগীকে আরোগ্য করিতে পারিলে তাহার কোটীগুণ ফল লাভ হয়' (১৩)। অধিক কি, আরোগ্যই ধর্ম্মার্থকামমোক্ষরূপ চতুর্ব্বর্গসাধনের মূল বলিয়া সেই আরোগ্য প্রদানে বৈদ্যের চতুর্ব্বর্গ অপেক্ষা অধিক ফললাভ হয়। সুতরাং চিকিৎসা অপেক্ষা পুণ্যজনক বৃত্তি আর কি হইতে পারে? এই নিমিত্তই বৈদ্যগণ যাজনাধ্যাপনাদির অধিকারী হইয়াও ঐ সকল অপেক্ষা চিকিৎসাবৃত্তির অনুশীলনই অধিকতর শ্রেয়স্কর বলিয়া বিবেচনা করিতেন। অগ্নিবেশ বলেন—'ভিষক্ **সর্ব্বোত্তম ধর্ম্ম** লাভের ইচ্ছা করিয়া রোগীগণকে স্বীয় সন্তানের ন্যায় সংরক্ষণ করিবেন' (১৪)। এখানে চিকিৎসাকে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ধর্ম্ম বলা হইল। চরক এবং সুশ্রুত উভয়েই চিকিৎসাকে পুণ্যতম বৃত্তি বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। যথা চরক বলিতেছেন—'বেদসমূহের মধ্যে যাহা ইহ ও পর উভয় লোকের হিতকর, বেদবিদ্‌গণের মতে পুণ্যতম সেই আয়ুর্ব্বেদ বলিতেছি' (১৫)। সুশ্রুতও বলিয়াছেন—' আরোগ্যই ধর্ম্মার্থকামমোক্ষরূপ চতুর্ব্বর্গসাধনের মূল ; এজন্য দেহিগণের পক্ষে চিকিৎসা বা রোগপ্রতীকার অপেক্ষা অধিকতর মঙ্গলজনক আর কিছুই নাই' এবং 'চিকিৎসিত হইতে পুণ্যতম আর কিছু শুনি নাই' (১৬)। যাঁহারা আয়ুর্ব্বেদের এই কথার উপর সম্যক্ বিশ্বাস স্থাপন করিতে

অসমর্থ তাঁহাদিগকে নিম্নলিখিত গৌতম সূত্রটী স্মরণ করিতে অনুরোধ করি। ন্যায় দর্শনে উক্ত হইয়াছে—'ঋগাদি বেদ আপ্তপ্রমাণ হেতু মন্ত্র ও আয়ুর্ব্বেদের ন্যায় প্রামাণ্য (১৭)। এস্থলে আয়ুর্ব্বেদের সহিত তুলনায় অন্যান্য বেদের প্রামাণিকতা প্রতিপাদিত হইয়াছে। ইহাতে প্রমাণের বল অন্যান্য বেদ অপেক্ষা আয়ুর্ব্বেদেরই অধিক বলিয়া সপ্রমাণ হয়। মহাভারতেও লিখিত আছে—'পুরাণ, মনুস্মৃতি, অঙ্গসহ চতুর্ব্বেদ এবং চিকিৎসাশাস্ত্র এই চারিটি আজ্ঞাসিদ্ধ, উহাদের আজ্ঞা তর্ক দ্বারা খণ্ডনীয় নহে' (১৮) এরূপ প্রামাণ্য সর্ব্বোৎকৃষ্ট আয়ুর্ব্বেদকে বেদ নয় বা উপবেদ বলিয়া অগ্রাহ্য করা ধৃষ্টতামাত্র।

এক্ষণে অনেকেই চিকিৎসাকে বৈশ্যবৃত্তি বা ব্যবসা-বিশেষ বলিয়া মনে করেন। ইহা সম্পূর্ণ ভ্রমাত্মক। চিকিৎসার গুরুত্ব উপলব্ধি করিলে এই ভ্রান্ত ধারণা কাহারও হৃদয়ে স্থান লাভ করিতে পারে না। যে দেহ ধর্ম্ম, অর্থ, কাম ও মোক্ষলাভের মূল, চিকিৎসা তাহারই রক্ষা ও স্বাস্থ্য বিধায়ক। এ হেন মূল্যবান্ চিকিৎসাকে সামান্য জীবিকা বা অর্থোপার্জ্জনের বিনিময়ে ব্যবহার করা যে কতদূর সঙ্গত তাহা যে কেহ একবার স্থিরচিত্তে ভাবিয়া দেখিলেই বুঝিতে পারিবেন। পক্ষান্তরে শাস্ত্রে কৃষি, গোরক্ষা ও বাণিজ্য এই তিনটীই বৈশ্যবৃত্তিরূপে নির্দ্দিষ্ট (১৯); সুতরাং উপরোক্ত চিকিৎসাকে বৈশ্যদিগের ধর্ম্মবৃত্তি বলিয়া নির্দ্দেশ করা যাইতে পারে না। পরন্তু চিকিৎসা যে উৎকৃষ্ট ব্রাহ্মণেরই বৃত্তি তাহা নিম্নে প্রদর্শিত হইল।

চরক বলিতেছেন—"ব্রাহ্মণ প্রজাদিগের অনুগ্রহার্থ আয়ুর্ব্বেদ অধ্যয়ন করিবেন, ক্ষত্রিয় আত্মরক্ষার্থ এবং বৈশ্য বৃত্ত্যর্থ (জীবিকার জন্য) অধ্যয়ন করিবে' (২০)। এই বচনে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য এই তিন বর্ণেরই সাধারণতঃ আয়ুর্ব্বেদ অধ্যয়ন বা চিকিৎসা করিবার অধিকার দৃষ্ট

হইলেও একটু লক্ষ্য করিলেই বুঝা যাইবে যে, একমাত্র ব্রাহ্মণ ভিন্ন ক্ষত্রিয় ও বৈশ্যের উপর চিকিৎসা করিবার ভার অর্পিত হয় নাই। আত্ম-রক্ষার্থ বা জীবিকার্থ চিকিৎসা করা চিকিৎসা-পদবাচ্য নহে, উহা স্বার্থসাধন মাত্র ; কিন্তু লোকোপকারার্থ যে চিকিৎসা তাহাকেই প্রকৃত চিকিৎসা বলা যায়, যেহেতু তাহাই চিকিৎসার যথার্থ উদ্দেশ্য। এইরূপ চিকিৎসা কেবল ব্রাহ্মণেরই উপযুক্ত এবং তাহাতে ব্রাহ্মণেরই অধিকার ইহা চরক কহিয়াছেন। ব্রাহ্মণই যে চিকিৎসা করিবার একমাত্র অধিকারী তাহা ঋগ্বেদ হইতেও জানা যায়। যথা—'রাজা যেমন রাক্ষস বধার্থ অস্ত্র প্রয়োগ করেন, সেইরূপ যে ব্রাহ্মণ ব্যাধির চিকিৎসা করেন, তিনিই ভিষক্ (অর্থাৎ বৈদ্য—মহীধর ভাষ্য) বলিয়া উক্ত হন' (২১)। এই বাক্যা-নুসারে প্রাচীন কালে ব্রাহ্মণ চিকিৎসকগণই ভিষক্ নামে উক্ত হইতেন—অন্য চিকিৎসক নহেন ইহা বুঝা যাইতেছে। আরও, তথায় লিখিত আছে যে, ওষধিগণ তাহাদের রাজা সোমের নিকট বিজ্ঞাপিত করিতেছেন—'হে রাজন্! ব্রাহ্মণ যে রোগীর নিমিত্ত আমাদের মূল খনন করিতেছেন তুমি তাহাকে রোগমুক্ত কর' (২২)। এখানে ওষধিগণ রোগমুক্তির জন্য কেবল ব্রাহ্মণ ভিষকের কথা নিবেদন করাতে স্পষ্টতঃ ইহাই প্রকাশ পাইয়াছে যে, একমাত্র ব্রাহ্মণ ভিষক্ই রোগমুক্ত করিবার অধিকার প্রাপ্ত হইয়াছেন—অপর কোন জাতীয় চিকিৎসক নহেন। সকল জাতীয় চিকিৎসকের কথা নিবেদন করা উদ্দেশ্য হইলে 'ব্রাহ্মণ' শব্দের পরিবর্ত্তে 'চিকিৎসক' বা 'ভিষক্' শব্দের প্রয়োগ করিলেই সঙ্গত হইত। কিন্তু ব্রাহ্মণই চিকিৎসা করিবার প্রকৃত অধিকারী বলিয়া এখানে ব্রাহ্মণ শব্দের প্রয়োগ হইয়াছে।

মনুসংহিতা তৃতীয় অধ্যায়ের শেষে মনু 'মুখ্য দ্বিজাতিগণের বৃত্তিসমূহের বিধান বলিতেছি শ্রবণ কর' ইহা কহিয়া পরবর্ত্তী অধ্যায়ে এইরূপ উল্লেখ

করিয়াছেন, যথা—'কৃতবিদ্য স্নাতক ব্রাহ্মণগণ আশু বৃদ্ধিবর্দ্ধক, অর্থজনক, হিতকর শাস্ত্রসকল অর্থাৎ বৈদ্যক ও জ্যোতিষাদি (কুল্লূক) এবং বেদের নিগমসমূহ নিত্য আলোচনা করিবেন' (২৩ । কিন্তু অনুষ্ঠান বা প্রয়োগ ব্যতীত কেবল আলোচনা দ্বারা বিদ্যার সার্থকতা বা সম্পূর্ণতা হয় না। সুতরাং এ স্থলে চিকিৎসা শাস্ত্রের আলোচনা মাত্র উক্ত হইলেও, তৎসহ চিকিৎসা-কার্য্যের অনুষ্ঠানও বুঝিতে হইবে। অতএব মনুর এই বাক্যে কৃতবিদ্য মুখ্য ব্রাহ্মণগণের চিকিৎসানিরত হওয়া কর্ত্তব্য এবং চিকিৎসা শ্রেষ্ঠব্রাহ্মণের বৃত্তি ইহা বুঝা গেল। তবে তাঁহাদের পক্ষে লোকানুগ্রহার্থই চিকিৎসা করা কর্ত্তব্য (চরক) জীবিকার্থ নহে। বৈদ্যগণ যে কৃতবিদ্য মুখ্য ব্রাহ্মণদিগেরই অন্যতম ছিলেন তাহা তাঁহাদের কিছু দিন পূর্ব্বের ব্যবহার হইতেই বুঝা যায়। কারণ তাঁহারা ধর্ম্মার্থ বা লোকোপকারার্থই চিকিৎসা করিতেন—জীবিকার জন্য নহে, ইহা আমরা পূর্ব্বে দেখাইয়াছি। পুনশ্চ সাধারণ ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য দূরের কথা, কৃতবিদ্য স্নাতক ব্রাহ্মণদিগের মধ্যেও সকলে চিকিৎসার অধিকার প্রাপ্ত হইতেন না। তাঁহাদের মধ্যে যাঁহারা ব্রহ্মচর্য্যাশ্রমে চতুর্ব্বেদ অধ্যয়নের পর আয়ুর্ব্বেদও অধ্যয়ন করিতেন, কেবল তাঁহারাই বৈদ্য নাম প্রাপ্ত হইয়া চিকিৎসাধিকারী হইতেন (এ বিষয় পরে আলোচিত হইবে)। অপর ব্রাহ্মণগণ গার্হস্থ্যাশ্রমে বিদ্যার্থ আয়ুর্ব্বেদ শাস্ত্র অধ্যয়ন এবং সামান্যতঃ চিকিৎসা করিতে পারিলেও, চিকিৎসার যথার্থ বা সম্যক্ অধিকারী হইতে পারিতেন না। উহা তাঁহাদের ধর্ম্মবৃত্তিরূপে গণ্য হইত না এবং চিকিৎসা হেতু কোন প্রকার দানগ্রহণেরও অধিকার জন্মিত না। এই নিমিত্তই সায়নাচার্য্য পূর্ব্বোক্ত (১১ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য) ঋগবেদ বচনের ভাষ্যে 'ব্রাহ্মণ' শব্দে ওষধি-সামর্থ্যজ্ঞ ব্রাহ্মণ অর্থাৎ বৈদ্য এইরূপ অর্থ করিয়াছেন। এখানে যে কৃতবিদ্য স্নাতক বিপ্রের চিকিৎসা শাস্ত্রের নিত্য আলোচনা বিহিত হইয়াছে, সে

স্থলে ঐ বিপ্র বলিতে সর্ব্ববিদ্যাসম্পন্ন বৈদ্যব্রাহ্মণকেই বুঝিতে হইবে।

দেখা যায়, মন্বাদি ধর্ম্মশাস্ত্রে চিকিৎসা ব্রাহ্মণাদি কোন বর্ণেরই ধর্ম্ম-বৃত্তিরূপে নির্দ্ধারিত হয় নাই। যাঁহারা সর্ব্ববেদবিৎ ও সর্ব্বশাস্ত্রে পারদর্শী, চিকিৎসাবৃত্তিকে সেই বিশিষ্ট বিদ্বান্‌দিগেরই অধিকারভুক্ত করা হইয়াছে। ব্রাহ্মণত্ব এই অধিকার প্রাপ্তির কারণ নহে, বিশিষ্ট বিদ্যাবত্তাই কারণ। মনু যে চিকিৎসাকে মুখ্য দ্বিজাতিদিগের বৃত্তি মধ্যে গণনা করিয়াছেন তাহার কারণ ব্রাহ্মণ ভিন্ন অপরে বিদ্বান্ পদবাচ্য হইতে পারে না। যাহা হউক, এই বিশিষ্ট বিদ্বান্‌গণই যে বৈদ্য আখ্যা প্রাপ্ত হইতেন তাহা পরে বুঝা যাইবে। বৈদ্যের লক্ষণ সম্বন্ধে প্রাচীন উক্তি এইরূপ, যথা—'আয়ুর্ব্বেদে সম্যক্‌রূপে অভ্যস্ত হওয়া, ধর্ম্মশাস্ত্রপরায়ণতা, অধ্যয়ন, অধ্যাপন ও চিকিৎসা এই কয়টী বৈদ্যের লক্ষণ' (২৪)। কোন্ ব্যক্তি বৈদ্য হইবার যোগ্য তৎসম্বন্ধে চাণক্য বলিয়াছেন—'আয়ুর্ব্বেদে সম্যক্ অভ্যস্ত, শাস্ত্রজ্ঞ, প্রিয়দর্শন, আর্য্যোচিত (শ্রেষ্ঠ) আচার ও গুণসম্পন্ন ব্যক্তিই বৈদ্য হইবার উপযুক্ত' (২৫)। বৈদ্য-কে ? মহর্ষি উশনা বলিতেছেন—'যিনি সর্ব্ববেদে নিপুণ, সর্ব্ব শাস্ত্রে বিশারদ এবং চিকিৎসাকুশল তিনিই বৈদ্য নামে অভিহিত' (২৬)। সুশ্রুত বলিতেছেন—'যিনি প্রত্যুৎপন্নমতি, ধীমান্, অধ্যবসায়যুক্ত, শাস্ত্র-বিশারদ এবং সত্য ও ধর্ম্মপরায়ণ তিনিই ভিষক্‌পদবাচ্য' (২৭)। এইরূপ চরকও বলিয়াছেন—'সমস্ত বেদে পারদর্শিতা, চিকিৎসা বিষয়ে বহুদর্শন, দক্ষতা ও পবিত্রতা এই চারিটি বৈদ্যের গুণ' (২৮)। এই যে সর্ব্ববেদে ও সর্ব্বশাস্ত্রে সম্যক্ অভিজ্ঞতা, বুদ্ধিমত্তা, সচ্চরিত্রতা, দক্ষতা, পবিত্রতা ও সত্যধর্ম্মপরায়ণতা প্রভৃতি বৈদ্যোচিত গুণগুলি প্রদর্শিত হইল, সেগুলি কি বৈশ্যদিগের স্বভাবজাত গুণ ? না, উহা সর্ব্বোৎকৃষ্ট ব্রাহ্মণের

লক্ষণ? ঐ গুণগুলি ব্রাহ্মণ সম্প্রদায়ের মধ্যেও দুষ্প্রাপ্য নহে কি? এইরূপ শ্রেষ্ঠ আচার ও গুণসম্পন্ন ব্যক্তি কি বৈশ্য নামে অভিহিত হইবার যোগ্য? না, ঐরূপ উচ্চাধিকারীর উপযুক্ত বৃত্তি কদাচ বৈশ্যবৃত্তিরূপে গণ্য হইতে পারে? কি ভ্রমেই আমরা পড়িয়াছি! বৈদ্যের গুণ বা লক্ষণ যাহা উক্ত হইল, তাহার বিষয় ভাবিয়া দেখিলে অনায়াসেই বুঝা যাইবে যে, বৈদ্যই শ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণ এবং চরক ও সুশ্রুত যে চিকিৎসাকে পুণ্যতম অর্থাৎ সর্ব্বোৎকৃষ্ট বৃত্তি বলিয়াছেন তাহাও যথার্থ।

বৈদ্যক শাস্ত্রে দৈবী মানবী ও আসুরী নামক ত্রিবিধ চিকিৎসার উল্লেখ আছে এবং আতুরের আরোগ্য বিধানের জন্য মন্ত্র বলি ও শান্তিকর্ম্মাদির উপদেশ দৃষ্ট হয়। বালরোগাধিকারে, স্ত্রীরোগাধিকারে এবং উন্মাদ-রোগাধিকারে দৈবী চিকিৎসাই প্রশস্ত। পূর্ব্বে বৈদ্যকে দৈবী চিকিৎসাও করিতে হইত। পারত্রিক মঙ্গলের জন্য পুরোহিত যেমন হোম স্বস্ত্যয়নাদি করিয়া থাকেন, পূর্ব্বে বৈদ্যেরাও সেইরূপ রোগোপশমের জন্য মন্ত্র জপ, হোমাদি করিতেন। কেবল নাড়ী টিপিয়া ঔষধের ব্যবস্থা করিলেই চিকিৎসা সম্পূর্ণ হয় না, যে পাপের ফলে মনুষ্যদেহে রোগোৎপত্তি হইয়া থাকে তাহার প্রতিকার করাকেই প্রকৃত চিকিৎসা বলে। সুতরাং চিকিৎসানুরোধে বৈদ্যকে ঐ সকল ব্রাহ্মণোচিত কার্য্যও করিতে হইত, ইহা স্পষ্টই বুঝা যাইতেছে। বৈদ্য অব্রাহ্মণ হইলে তাঁহারা ঐ সকল কার্য্য করিবার অধিকার প্রাপ্ত হইতেন না এবং বৈদ্যক্ শাস্ত্রে দৈবী চিকিৎসার বিধান দৃষ্ট হইত না, ইহা বলাই বাহুল্য।

আর এক কথা, যে সময়ে সদাচারনিষ্ঠ ব্রাহ্মণগণ ভক্ষ্যাভক্ষ্য, স্পৃশ্য অস্পৃশ্যাদি বিষয়ে বিশেষরূপে বিচার করিয়া চলিতেন, এবং কোন প্রকার অপবিত্র বস্তু ভক্ষণ বা গ্রহণে বিরত থাকিতেন, সে সময়েও তাঁহারা বৈদ্য-প্রদত্ত ঔষধ পবিত্র জ্ঞানে সেবন করিতেন। বৈদ্যেরা বিশুদ্ধ ব্রাহ্মণ বলিয়াই

তাঁহারা বৈদ্যপাচিত ঔষধ সেবন করিতে কিছুমাত্র দ্বিধা বোধ করিতেন না। এতদ্ভিন্ন, তৎকালে ব্রাহ্মণগণ ঈশ্বরের প্রতি অত্যধিক নির্ভরশীল হওয়ায় সহজে ঔষধগ্রহণে প্রবৃত্ত হইতেন না, কিন্তু বৈদ্যের মন্ত্রপূত ঈশ্বরানবেদিত ঔষধ সেবনে তাঁহাদের আপত্তি হইত না; পরন্তু তাঁহারা উহা ঈশ্বরপ্রসাদ-জ্ঞানে পরম শ্রদ্ধার সহিতই গ্রহণ করিতেন। অতএব বৈদ্যকে নিকৃষ্ট জাতি বা সামান্য চিকিৎসকমাত্র বলিয়া জ্ঞান করা বিষম ভ্রম। তাঁহারা বিশুদ্ধ ব্রাহ্মণজাতীয় শ্রেণীবিশেষ ভিন্ন নহেন।

যাহা হউক, এক্ষণে বৈদ্যদিগের মধ্যে অনেকে জীবিকার্থ চিকিৎসা এবং ঔষধাদি বিক্রয়রূপ বৈশ্যোচিত কার্য্য করিতেছেন দেখিয়া তাঁহাদের উপর বৈশ্যত্ব আরোপ করা চলে না; যেমন এই কলিকালে ব্রাহ্মণগণ সন্ধ্যোপাসনাবর্জ্জিত ও শূদ্রসম আচারবিশিষ্ট হইয়াছেন (২৯)) [মহানির্ব্বাণ তন্ত্র] বলিয়া তাঁহাদিগকে শূদ্র বলা হয় না। কালবশে সকলই বিপরীত ভাবাপন্ন হইয়া পড়িয়াছে, সে স্বতন্ত্র কথা।

৫। বৈদ্যের প্রতিগ্রহাধিকার।

আমরা পূর্ব্বেই সপ্রমাণ করিয়াছি যে অর্থ লইয়া চিকিৎসা করা বৈদ্যের পক্ষে নিষিদ্ধ। সুতরাং রোগীদিগের নিকট যদৃচ্ছালব্ধ দান হইতে বৈদ্যের সংসারযাত্রা নির্ব্বাহ হওয়া দুঃসাধ্য হইত। এই নিমিত্তই শাস্ত্রে তাঁহাদিগকে সর্ব্বপ্রকার প্রতিগ্রহের অধিকার প্রদত্ত হইয়াছে। প্রসিদ্ধিই আছে—'রাজা, ভিষক্ এবং গুরুকে রিক্ত হস্তে দর্শন করিবে না।' (৩০) [শব্দ-কল্পদ্রুমধৃত]। যদি বৈদ্যেরা চিকিৎসা দ্বারা অর্থোপার্জ্জন ও ঔষধাদি বিক্রয় করিতে পারিতেন, তাহা হইলে এই বিধিবাক্যের কোন প্রয়োজনই হইত না।

রামায়ণে লিখিত আছে—[শ্রীরামচন্দ্র ভরতকে জিজ্ঞাসা করিতেছেন] 'হে রাঘব! তুমি বৃদ্ধদিগকে, বালকদিগকে এবং মুখ্য বৈদ্যদিগকে অর্থাদি দান দ্বারা, ভক্তি ও স্নেহদ্বারা এবং মিষ্ট বাক্যদ্বারা সন্তুষ্ট রাখিতেছ ত?' (৩১)। বৈদ্যকে যে অর্থ ও দ্রব্যাদি দান দ্বারা পরিতুষ্ট করিতে হয়, তাহা এই বাক্যে প্রকাশ পাইতেছে। যাজ্ঞবল্ক্য সংহিতাতেও লিখিত আছে—'ঋত্বিক, পুরোহিত এবং আচার্য্যগণের আশীর্ব্বাদ দ্বারা অভিনন্দিত হইয়া জ্যোতির্ব্বিদ ও বৈদ্যগণকে দর্শন করিবেন এবং তাঁহাদিগকে সুবর্ণ, গো এবং ভূমি প্রদান করিবেন। পরে শ্রোত্রায়গণকে কন্যালঙ্কারাদি গার্হস্থ্যোপযুক্ত দ্রব্য এবং গৃহ প্রদান করিবেন' (৩২) [বঙ্গবাসী সংস্করণের অনুবাদ]। ঋগ্বেদে দেখা যায়, মন্ত্রদ্রষ্টা ঋষি বৈদ্যকে গভীর শ্রদ্ধার সহিত বলিতেছেন—'হে চিকিৎসক! আমি তোমাকে অশ্ব, গাভী, বস্ত্র, এমন কি আত্মা পর্য্যন্ত প্রদান করিতেছি, (৩৩) [ইহা সায়নকৃত ভাষ্যের অনুবাদ]। এই সকল প্রমাণ দ্বারা স্পষ্টই বুঝা যাইতেছে যে, বৈদ্য অতীব শ্রদ্ধেয় এবং দানের পরম উপযুক্ত পাত্র। মনুও বলিয়াছেন—'শ্রাদ্ধকর্ত্তা দেবপিতৃ উদ্দেশ্যে অন্নাদি শ্রোত্রিয় (বেদজ্ঞবিশুদ্ধ) ব্রাহ্মণকেই প্রদান করিবেন। কেন না পূজ্যতম বিপ্রকে দান করিলে মহা ফল লাভ হয়। দৈব ও পিত্র্যকর্ম্মে একজন বিদ্বান্‌কে ভোজন করাইলে যে বিশিষ্ট ফল লাভ হয়, বেদানভিজ্ঞ বহুব্রাহ্মণকে ভোজন করাইলেও তাদৃশ ফল প্রাপ্তি হয় না।' (৩৪)। এখানে 'বিদ্বান্' অর্থে প্রধানতঃ বৈদ্য-ব্রাহ্মণই লক্ষিত হইয়াছেন, ইহা পরে বুঝা যাইবে।

ভূমিদান সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ দান। ব্রাহ্মণ ভিন্ন অন্য কেহ ভূমি প্রতিগ্রহ করিবার অধিকারী নহেন। তাম্রশাসনাদিতে বৈদ্যদিগকে ভূমিদানের উল্লেখ দেখা যায়। বরেন্দ্র অনুসন্ধান সমিতির প্রকাশিত এবং প্রত্নতত্ত্ববিদ্ [illegible]কুমার মৈত্রেয় মহাশয় যাহার পাঠোদ্ধার করিয়াছেন সেই শ্রীচন্দ্রদেবের

তাম্রশাসনে শ্রীপীতবাস গুপ্তশর্ম্মাকে তাম্রশাসন পূর্ব্বক ভূমিদানের উল্লেখ আছে। যথা—'× × × মকর গুপ্তের প্রপৌত্র, বরাহ গুপ্তের পৌত্র, সুমঙ্গল গুপ্তের পুত্র শান্তিবারিক শ্রীপীতবাস গুপ্তশর্ম্মাকে বিধিবৎ উদকক্রিয়া পূর্ব্বক তাম্রশাসন লিখিয়া প্রদান করিলাম' (৩৫) [সাহিত্যপত্রিকা ১৩২০ শ্রাবণ সংখ্যা]। এখানে "গুপ্তশর্ম্মা" উপাধি দ্বারাই প্রতিগ্রহীতার বৈদ্যত্ব সূচিত হইয়াছে। আরও প্রসিদ্ধ স্বর্গীয় পণ্ডিত রামগতি ন্যায়রত্নমহাশয় নিম্নলিখিত তাম্রশাসনের পাঠোদ্ধার করিয়া "সাহিত্যবিষয়ক" গ্রন্থে যাহা লিখিয়াছেন তাহার কিয়দংশ এস্থলে উদ্ধৃত হইল। যথা—শ্রীমল্লক্ষ্মণ সেন তাম্রশাসন পূর্ব্বক এক ব্রাহ্মণকে ভূমিদান করিয়াছিলেন। ঐ তাম্রশাসনে লিখিত আছে—'এই প্রকার চতুঃসীমা-বিশিষ্ট মণ্ডলগ্রামীয় কিয়ৎপরিমাণ ভূভাগ জগদ্ধর-দেবশর্ম্মার প্রপৌত্র, নারায়ণ ধর দেবশর্ম্মার পৌত্র, নরসিংহ ধর দেবশর্ম্মার পুত্র গার্গ্যগোত্রীয় অঙ্গিরা, বৃহস্পতি, শিনি, গর্গ, ও ভরদ্বাজ এই পঞ্চ প্রবর দ্বারা বিখ্যাত ঋগ্বেদীয় আশ্বলায়ন শাখ্যাধ্যায়ী শান্তিবারিক শ্রীকৃষ্ণ ধর দেবশর্ম্মাকে পবিত্র দিনে বিধিবৎ উদকক্রিয়া পূর্ব্বক তাম্রশাসন লিখিয়া প্রদান করিলাম' (৩৬)। গ্রহীতার নাম শ্রীকৃষ্ণ ধর দেবশর্ম্মা। নামান্তে 'দেব' ও 'শর্ম্মন্' শব্দ প্রযুক্ত হওয়ায় ইঁহার ব্রাহ্মণত্ব লক্ষিত হইতেছে। ইনি গার্গ্য গোত্রীয়। গার্গ্য গোত্রজ ব্রাহ্মণ বাঙ্গালার কুত্রাপি দৃষ্ট হয় না। অথচ বৈদ্যসাধ্য বংশে ঐ গোত্র আছে। আরও ধর, কর প্রভৃতি উপাধি বৈদ্যদিগের মধ্যেই বিদ্যমান (যেমন মাধব কর, উমাপতি ধর ইত্যাদি)। ঐ সকল উপাধি এক্ষণে দাক্ষিণাত্য বৈদিক ব্রাহ্মণদিগের মধ্যে দেখা যায় বটে, কিন্তু লক্ষণ সেনের সময়ে তাঁহারা বঙ্গদেশে আগমন করেন নাই। এই সকল কারণে শ্রীকৃষ্ণ ধর দেবশর্ম্মাকে বৈদ্যশ্রেণীর ব্রাহ্মণ বলিয়াই বুঝা যাইতেছে। বৈদ্যব্রাহ্মণ সমিতির বর্ত্তমান সহকারী সভাপতি শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রমোহন সেন শর্ম্মা

গীতাচার্য্য মহাশয়ের বৃদ্ধ প্রমাতামহ ৺নন্দরাম বিশারদকে প্রায় দুই শত বৎসর পূর্ব্বে মেদিনীপুর জেলার এক জমিদার ব্রহ্মত্রা ভূমি দান করিয়াছিলেন। তাহার দলিল বর্ত্তমান উত্তরাধিকারী হালিসহর-নিবাসী শ্রীবিনয়কৃষ্ণ গুপ্তশর্ম্মার নিকট আছে। এইরূপ বৈদ্যপণ্ডিত ও কবিরাজ-দিগকে প্রদত্ত ব্রহ্মত্রা জমি এখনও স্থানে স্থানে বিদ্যমান আছে, ইহা যে কেহ অনুসন্ধান করিলেই জানিতে পারিবেন। বৈদ্য ব্রাহ্মণ না হইলে ব্রহ্মোত্তর জমি ভোগ করেন কিরূপে?

৬। বৈদ্যের ব্রাহ্মণোচিত উপাধি।

আমরা পূর্ব্বে দেখাইয়াছি যে, কাঁচরাপাড়া-নিবাসী কবি ঈশ্বর গুপ্তের জ্যেষ্ঠ পিতামহ বিজয়রাম পণ্ডিত 'বাচস্পতি' উপাধিধারী ছিলেন, ইহা ৺বঙ্কিম বাবু স্বয়ং লিখিয়া গিয়াছেন। বাখরগঞ্জের ইতিহাসে লিখিত আছে—'রামহরি গুপ্ত নামক একজন কবিরাজ নবাবপত্নীর চিকিৎসা করতঃ (বরিশালে) হাবেলি সিলামাবাদ পরগণার জমিদারী প্রাপ্ত হইয়া দেউড়ী গ্রামে বসবাস নির্দ্ধারণ করেন। তাঁহার পৌত্র নরেন্দ্রনারায়ণ গুপ্ত (চৌধুরী) পর্য্যন্ত ঐ গ্রামে বাস করেন। উক্ত চৌধুরী রামকৃষ্ণ **বিদ্যার্ণব** নামক এক ব্যক্তির সহিত স্বীয় কন্যার বিবাহ দেন' ইত্যাদি। এখানে বৈদ্যের বিদ্যার্ণব উপাধি থাকার পরিচয় পাওয়া গেল। ইতিপূর্ব্বে বৈদ্যদিগের গ্রন্থকর্ত্তৃত্ব বর্ণনকালে কয়েকজন মহামহোপাধ্যায় উপাধিধারী বৈদ্যগ্রন্থকারের নামোল্লেখ করা হইয়াছে। এই সে দিনকার দ্বারকানাথ ও বিজয়রত্ন কবিরাজ মহামহোপাধ্যায় উপাধিকারী ছিলেন এবং এক্ষণে কবিরাজ গণনাথ সেন সরস্বতী মহাশয় উক্ত উপাধিতে ভূষিত রহিয়াছেন, ইহা সকলেই অবগত আছেন।

এস্থলে ইহা উল্লেখ করা আবশুক যে, শাস্ত্রে মহামহোপাধ্যায়,সার্ব্বভৌম, শিরোমণি, বাচস্পতি, বিদ্যার্ণব, বিদ্যাভূষণ, বিদ্যানিধি প্রভৃতি বিদ্যাবত্তার পবিচায়ক উপাধিগুলি ধারণ করিবার অধিকার একমাত্র ব্রাহ্মণ ভিন্ন অন্য কোন জাতিকেই দেওয়া হয় নাই। ছান্দোগ্য শ্রুতি এবং মনু ও বিষ্ণু সংহিতা প্রভৃতিতে উক্ত আছে যে, ব্রহ্মবিদ্যা ব্রাহ্মণের নিকট গমন করিয়া কহিতেছেন 'আমি তোমার ধন অর্থাৎ তোমার আশ্রিত বস্তু, তুমি আমাকে প্রতিপালন কর। যে বিপ্র সর্ব্বদা শুচি, সংযতেন্দ্রিয় ব্রহ্মচারী ও অপ্রমত্ত সেই নিধিপালক বিপ্রের হস্তেই আমাকে সমর্পণ করিও', ইত্যাদি (৩৭)। এখানে ইহা স্পষ্ট বুঝা গেল যে, বিদ্যা স্বয়ং আপনাকে ব্রাহ্মণের হস্তেই বরণ করিলেন, ক্ষত্রিয়াদির হস্তে নহে। শাস্ত্রের এই অনুশাসন হইতে সমাজে এইরূপ নিয়ম প্রবর্ত্তিত হইয়াছে যে, ব্রাহ্মণেতর জাতিসকল অর্থাৎ ক্ষত্রিয় বৈশ্যাদি বিদ্যাধনের উপসত্ব ভোগ করিতে পারিবেন, কিন্তু কদাচ বিদ্যার স্বামী হইতে পারিবেন না—সুতরাং স্বামিত্বসূচক উপাধি ধারণ করিতেও পারিবেন না। একারণ উপরোক্ত উপাধিগুলি এবং বৈদ্য (অর্থাৎ সমাপ্তবিদ্য) কবিরাজ (বিদ্বান্ শ্রেষ্ঠ) শ্রোত্রীয়, (বেদজ্ঞ), ত্রিবেদী (তেওয়ারী) চতুর্ব্বেদী (চৌবে) পণ্ডিত (পাঁড়ে) প্রভৃতি বিদ্যামূলক উপাধিসমূহ ক্ষত্রিয় বৈশ্যাদির ব্যবহার্য্য নহে। এই উপাধিধারণ-বিষয়ক নিয়ম অদ্যাপি প্রবর্ত্তিত রহিয়াছে অথচ বৈদ্যগণ ব্রাহ্মণের ন্যায় সমভাবেই ঐ সকল উপাধি ধারণ করিয়া আসিতেছেন। ইহা তাঁহাদের ব্রাহ্মণত্বের পরিচায়ক ভিন্ন আর কি হইতে পারে?

যাহা হউক, মহামহোপাধ্যায় ভরত মল্লিকের চন্দ্রপ্রভা, রামকান্ত কবি-কণ্ঠহারের কণ্ঠহার, মহামহোপাধ্যায় চতুর্ভুজের এবং যশোরঞ্জিণী প্রভৃতি বৈদ্য-কুলপঞ্জিকাতে প্রাচীন বৈদ্যদিগের ব্রাহ্মণোচিত উপাধির ছড়াছড়ি দেখিতে পাওয়া যায়। যেমন **চন্দ্রপ্রভায়**—অভিরাম কবীন্দ্র (ইনি

পরে মহামহোপাধ্যায় হইয়াছিলেন), শ্রীপতি দাশ বিদ্যাভূষণ, রামেশ্বর দাশ বাচস্পতি, বিশ্বেশ্বর দাশ বাচস্পতি, সুদাম দাশ শিরোমণি, রূপনারায়ণ চূড়ামণি, রত্নেশ্বর বাচস্পতি, মুরারি গুপ্ত শিরোমণি প্রভৃতি; **কণ্ঠহারের**—রমানাথ সার্ব্বভৌম, নরহরি সার্ব্বভৌম, অনন্ত সেন বিদ্যাধর, রামচন্দ্র শিরোমণি, দুর্গাদাস শিরোমণি, রঘুনাথ চূড়ামণি, গোপীকান্ত সরস্বতী প্রভৃতি; **যশোরঞ্জিণীর**—জগন্নাথ সার্ব্বভৌম প্রভৃতি। (৩৮)। এক এক বংশেই এইরূপ কত শত উপাধিমান্ ব্যক্তির উল্লেখ দৃষ্ট হয়। বৈদ্যগণ তৎকালে সমাজে ব্রাহ্মণ বলিয়া স্বীকৃত না হইলে কথনই তাঁহারা এইরূপ ব্রাহ্মণোচিত উপাধিতে ভূষিত হইতে পারিতেন না।

এতদ্ভিন্ন, বৈদ্যদিগের পাঁড়ে, দোবে, ওঝা, মিশ্র প্রভৃতি বংশগত বা জাতীয় উপাধির দৃষ্টান্ত বাঁকুড়া জেলার তিলুড়ী প্রভৃতি গ্রামে, ঢাকার জপ্‌সা প্রভৃতি গ্রামে এবং অপরাপর স্থানেও অদ্যাপি দেখা যায় [ইহাঁদের নাম ও ঠিকানা বৈদ্যব্রাহ্মণ সমিতির কার্য্যালয়ে দ্রষ্টব্য]। কুলগ্রন্থেও বৈদ্যের ব্রাহ্মণোচিত মিশ্রও চক্রবর্ত্তী উপাধি উল্লিখিত আছে। যথা— 'নিরোলে শ্যাম সেন মিশ্রকে কনিষ্ঠা কন্যা দিয়াছিলেন' 'পরমানন্দ গুপ্ত শিলাগ্রাম-নিবাসী চক্রবর্ত্তীকন্যার পতি' 'গাঙ্গেয়ী-নিবাসী বিশ্বনাথের দৌহিত্রদ্বয় চক্রবর্ত্তী ছিলেন", (৩৯) ইত্যাদি। বৈদ্যদিগের এইরূপ ব্রাহ্মণোচিত উপাধি ধারণ তাঁহাদের ব্রাহ্মণত্বের সুষ্ঠু পরিচায়ক।

৭। বৈদ্যের ব্রাহ্মণোচিত উপনয়ন।

বৈদ্যদিগের উপনয়ন-সংস্কার চিরপ্রচলিত। পূর্ব্ব বঙ্গে বৈদ্যগণ নানা ঘটনা-বিপর্য্যয়ে এক সময়ে উপনয়ন-সংস্কার বর্জ্জিত হইয়া পড়িলেও

পশ্চিম বঙ্গে ও রাঢ় দেশে তাহাদের উপবীতবিভ্রাট ঘটে নাই। বৈদ্য-রাজা রাজবল্লভ যখন পূর্ব্ব বঙ্গীয় ব্রাত্য বৈদ্যদিগের পুনঃ সংস্কার সাধন করেন, তখন স্মার্ত্ত ব্রাহ্মণদিগের প্রদত্ত ব্যবস্থাতেও রাঢ়ীয় সমাজে অখণ্ডিত উপনয়নের উল্লেখ দেখা যায়। অতএব বৈদ্যেরা কিছু দিন পূর্ব্বে উপবীত গ্রহণ করিয়াছেন এরূপ সিদ্ধান্ত করা নিতান্ত ভ্রান্তি-সঙ্কুল।

মন্বাদি স্মৃতির মতে একমাত্র ব্রাহ্মণেরই কার্পাস সূত্রময় উপবীত, মৌঞ্জী, মেখলা, বিল্ব বা পলাশ দণ্ড ও কৃষ্ণসার চর্ম্মধারণের বিধি আছে। বৈদ্যদিগের চিরদিনই এই বিধি অনুসারে উপনীত করা হয়—বৈশ্যোচিত মেষলোমের উপবীত ও শণতন্তুময়ী মেখলা দেওয়া হয় না। বৈদ্য ব্রহ্মচারী ভিক্ষাগ্রহণকালে অন্য ব্রাহ্মণ বালকের ন্যায়ই "ভবতি ভিক্ষাং দেহি" বলিয়া থাকেন, বৈশ্যোচিত উপনয়ন হইলে "ভিক্ষাং দেহি ভবতি" বলিবার ব্যবস্থা হইত (মনুসংহিতা ২য় অঃ ৪২।৪৪।৪৫।৪৯ শ্লোক দ্রষ্টব্য)। অতএব ব্রাহ্মণোচিত উপনয়ন হেতু বৈদ্যের ব্রাহ্মণত্ব সিদ্ধ।

৮। বৈদ্যের চিরন্তন বেদাধ্যয়ন প্রসিদ্ধি।

বৈদ্যদিগের মধ্যে অধিকাংশই যজুর্ব্বেদীয় 'কাম্বশাখাধ্যায়ী বলিয়া ক্রিয়া-কলাপ অনুষ্ঠান করেন, কেহ কেহ সামবেদীয় কৌথুমী শাখাধ্যায়ী এবং বাঁকুড়া জেলায় অনেকে ঋগ্বেদীয় আশ্বলায়ন শাখাধ্যায়ী বর্ত্তমান আছেন। উদাহরণ স্বরূপ নিরোলের স্বর্গীয় চন্দ্রনারায়ণ কবিরাজের, বংশ, কবিরাজ শ্রীরাখালদাস সেন শর্ম্মা কাব্যতীর্থ এবং বালির শ্রীযুক্ত কিশোরীমোহন সেন শর্ম্মা চৌবে মহাশয়ের উল্লেখ করা যাইতে পারে। ইঁহারা সামবেদী। সামবেদে এবং যজুর্ব্বেদীয় কাম্বশাখায় ব্রাহ্মণেতর কোন বর্ণের অধিকার

কুত্রাপি দেখা যায় না। সুতরাং ইহাও বৈদ্যের ব্রাহ্মণত্ব সপ্রমাণ করে।

৯। বৈদ্যের গোত্র।

অনেকেই জানেন, ব্রাহ্মণগণ গোত্রপরিচয়ে স্ব স্ব বংশের আদিপুরুষ গোত্রকারী মুনির নামোল্লেখ করিয়া থাকেন এবং ব্রাহ্মণেতর জাতিসমূহ স্ব স্ব কুলপুরোহিতদিগের গোত্র ভজনা করেন। স্মার্ত্ত রঘুনন্দনও ইহা বলিয়াছেন; যথা—'বংশপরম্পরা-প্রসিদ্ধ আদিপুরুষ ব্রাহ্মণের গোত্ররূপ, আর ক্ষত্রিয় বৈশ্য ও শূদ্রদিগের পুরোহিত গোত্র ও প্রবর (৪০)। বৈদ্যগণ চিরদিনই স্ব স্ব গোত্রকারী আদি পুরুষের নামোল্লেখে গোত্রের পরিচয় দেন এবং দৈব ও পিত্র্য কার্য্য সম্পাদন করেন। আড়াই শত বৎসর পূর্ব্বে ভরত মল্লিক, 'চন্দ্রপ্রভা'তে লিখিয়া গিয়াছেন—'বৈদ্যেরা যিনি যে মুনির সন্তান, তিনি সেই মুনির গোত্রভাক্। তৎপর তাহাদের ব্যক্তিগত উৎকর্ষ ও অপকর্ষ তাহাদের স্ব স্ব কর্ম্মানুসারে জানিবে' (৪১)। বৈদ্যদিগের ধন্বন্তরি, বৈশ্বানর, শালঙ্কায়ন, আদ্য, মহর্ষি, মার্কণ্ড, জম্বু, ও ধ্রুব এই আটটি গোত্র যাজক শ্রেণীর ব্রাহ্মণদের মধ্যে নাই। এই সকল গোত্র বৈদ্যদিগেরই নিজস্ব। সুতরাং বৈদ্যেরা পুরোহিতদিগের গোত্রভাক্ এ কথা কখনই বলা যায় না। পক্ষান্তরে, হরিবংশ প্রভৃতি গ্রন্থপাঠে জানা যায় যে, ধন্বন্তরি‧বৈশ্বানর প্রভৃতি বৈদ্যদিগের গোত্র হইতেই বহু ব্রাহ্মণগোত্রের উদ্ভব হইয়াছে। যথা—কাশ্যের পৌত্র দীর্ঘতমা ছিলেন। দীর্ঘতমার পুত্র আয়ুর্ব্বেদপ্রবর্ত্তক ধন্বন্তরি। ধন্বন্তরির প্রপৌত্র দিবোদাস। দিবোদাসের পুত্র ব্রহ্মর্ষি মিত্র ও প্রতর্দ্দন। ব্রহ্মর্ষি মিত্র হইতে মৈত্রেয় ব্রাহ্মণবংশের উৎপত্তি হইয়াছে। আর প্রতর্দ্দনের পুত্র বাৎস্য ও ভার্গ।

বাৎস্য হইতে বাৎস্যবংশ ব্রাহ্মণগণের উৎপত্তি হইয়াছে। ভার্গের পুত্র বৈশ্বানর; তৎপুত্র ভৃগু ও জমদগ্নি। এই ভৃগু ও জমদগ্নি হইতে বহু ব্রাহ্মণবংশের উদ্ভব হইয়াছে। যাহা হউক, বৈদ্যেরা যখন অদ্যাপি স্ব স্ব বংশের আদিপুরুষ গোত্রকারী মুনিদিগের নামোল্লেখে গোত্রের পরিচয় দিয়া থাকেন অর্থাৎ তাঁহারা যখন সেই সেই বংশে জাত, তখন তাঁহারা যে জাতিতে ব্রাহ্মণ তাহা কখনই অস্বীকৃত হইতে পাবে না।

বৈদ্যদিগের সেন, ধর, কর, দত্ত, নন্দী প্রভৃতি কতকগুলি উপাধি নিম্ন জাতির মধ্যেও দৃষ্ট হয়; কিন্তু তাহাদের গোত্রের সহিত তত্তদুপাধিবিশিষ্ট বৈদ্যদিগের গোত্রের মিল নাই। কারণ শূদ্রত্ব হেতু তাঁহারা পুরোহিতদিগের গোত্র ভজনা করেন, আর বৈদ্যগণ স্ব স্ব আদি পুরুষের গোত্র ভজনা করিয়া থাকেন।

১০। বৈদ্যের ব্রাহ্মণত্ব-প্রসিদ্ধি ও লোকাচার।

অদ্যাপি দেখা যায়, নিম্ন জাতীয়েরা বৈদ্যকে 'বদ্দিবামুন' বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়া থাকে। এ সম্বন্ধে পণ্ডিতাগ্রগণ্য ৺ উমেশ চন্দ্র গুপ্ত বিদ্যারত্ন মহাশয় তদীয় জাতিতত্ত্ববারিধি নামক গ্রন্থে লিখিয়াছেন—'১৮৭৩ হইতে ১৮৭৬ সন পর্য্যন্ত আমি চোরবাগানে কল্যানীয় শ্রীমান মন্মথ নাথ বসু মহাশয়ের বাটীতে ভাড়াটীয়া-স্বরূপ বাস করিতাম। মন্মথ বাবুর বর্ষীয়সী মাতা প্রতিবেশিনীদিগের নিকট পরিচয় দান কালে আমাদিগকে 'বদ্দি-বামুন' বলিয়া আখ্যাত করিতেন। ইহা তাঁহাদের পুরুষপরম্পরাগত সংস্কার ও অভিজ্ঞতা ভিন্ন আর কিছুই নহে। বহুকাল হইতে লোকে যে 'বামুন কায়েত' শব্দটী উচ্চাচরণ করিয়া আসিতেছে, তাহাতে পূর্ব্বে বৈদ্যগণ ব্রাহ্মণের মধ্যেই ধৃত হইতেন।' এক্ষণে সর্ব্বসাধারণের অনভিজ্ঞতা

ও বিদ্বেষ হেতু বৈদ্যেরা ব্রাহ্মণ হইতে পৃথক্ জাতিরূপে গণ্য হইতেছেন।

কুমারহট্ট (বর্ত্তমান হালিসহর) নিবাসী ভক্তসাধক বৈদ্য রামপ্রসাদ সেন দেড় শত বৎসর পূর্ব্বে স্বরচিত প্রত্যেক সঙ্গীতে "দ্বিজ রামপ্রসাদ ভণে" এইরূপ উল্লেখ করিয়া নিজ ব্রাহ্মণত্ব বিশেষরূপে খ্যাপন করিয়া গিয়াছেন। তিনি বৈশ্যবর্ণীয় হইলে কখনই আপনাকে দ্বিজ বলিয়া ঘোষণা করিতে পারিতেন না, যেহেতু 'দ্বিজ' শব্দ ব্রাহ্মণেরই অববোধক। কবিকঙ্কন মুকুন্দরামের চণ্ডীতে এইরূপ লেখা আছে—"উঠিয়া প্রাতঃকালে,উর্দ্ধ ফোঁটা করি ভালে, বৈদ্যগণ গুজরাটে ফিরে" (এই গুজরাট বঙ্গের কোন স্থান বিশেষ)। বঙ্গীয় বৈদ্যগণ চিকিৎসাকার্য্য উপলক্ষে ভ্রমণকালে উর্দ্ধ ফোঁটা ধারণ করিতেন। উর্দ্ধ ফোঁটা কেবল ব্রাহ্মণই ধারণ করিতে পারেন। প্রমাণ যথা—'ব্রাহ্মণ উর্দ্ধপুণ্ড্র ধারণ করিবে, ক্ষত্রিয় ত্রিপুণ্ড্র, বৈশ্য অর্দ্ধচন্দ্র এবং শূদ্র বর্ত্তুলাকার পুণ্ড্র ধারণ করিবে' (৪২) [আহ্নিক-তত্ত্বধৃত ব্রহ্মাণ্ডপুরাণ বচন—শব্দকল্পদ্রুম]। কলিকাতা শোভাবাজারে রাজা নবকৃষ্ণের পুত্র রাজা রামকৃষ্ণ কোন সময়ে এক বৈদ্য কবিরাজের উর্দ্ধপুণ্ড্র ধারণে আপত্তি করিলে, তৎকালের প্রসিদ্ধ পণ্ডিত জগন্নাথ তর্কপঞ্চানন মহাশয় প্রকাশ্য সভায় বৈদ্যদিগের উৎকৃষ্ট ব্রাহ্মণত্ব সপ্রমাণ করেন ও তাঁহাদের উর্দ্ধপুণ্ড ধারণের অধিকার সমর্থন করেন। অতএব ইহা স্পষ্টই বুঝা যাইতেছে যে, তৎকালে বৈদ্যেরা ব্রাহ্মণাচারীই ছিলেন কিন্তু তাঁহাদিগকে জোর করিয়া সমাজে অবনমিত করিবার চেষ্টা করা হইত।

শাস্ত্রানুসারে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য এই তিন বর্ণেরই শালগ্রাম শিলা অর্চ্চনা করিবার অধিকার আছে। ব্রহ্মাণ্ডপুরাণে স্পষ্টই লিখিত আছে—'ব্রহ্মা ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্যকে যজন, অধ্যয়ন ও দান এই ত্রিবিধ কর্ম্মে

সমান অধিকার দিলেন' (৪৩)। কিন্তু উক্ত তিন বর্ণের যজন কার্য্যে সমান অধিকার দেওয়া হইলেও, বঙ্গদেশে কালক্রমে কেবল ব্রাহ্মণেরই অধিকার দাঁড়িয়াছে। তথাপি রাঢ়ীয় সমাজের অনেক বৈদ্যকে শালগ্রাম শিলা অর্চ্চনা করিতে দেখা যায়। অদ্যাপি পশ্চিম বঙ্গ ও রাঢীয় সমাজের সমস্ত পল্লীগ্রামে ব্রাহ্মণ ও বৈদ্যদিগকে ব্রাহ্মণদের বাটীতেও এক সময়ে ভোজন করান হয়। অনেক গৃহে উভয়কে সমানভাবে ভোজন-দক্ষিণাও দেওয়া হয়। প্রায় ৪০ বৎসর পুর্ব্বে বৈদ্যেরা কায়স্থদিগের বাটীতেও কখন অন্নগ্রহণ করিতেন না। পূজাদি উপলক্ষে নিমন্ত্রণ হইলে লুচি ও মিষ্টান্নমাত্র গ্রহণ করিতেন, ব্রাহ্মণপাচিত হইলেও তরকারী গ্রহণ করিতেন না। ইহা তাঁহাদের ব্রাহ্মণাচারেরই পরিচায়ক। ২০।২৫ বৎসর পূর্ব্বেও বৈদ্য অধ্যাপকগণ শ্রাদ্ধাদিতে আমন্ত্রিত হইতেন ও প্রতিগ্রহ করিতেন। অসৎ প্রতিগ্রহজনিত পাপের ভয়ে বৈদ্যেরা শেষে পান সুপারি ও যজ্ঞোপবীত মাত্র গ্রহণ করিতেন। এখনও ঐ নিয়ম কোন কোন স্থানে 'অধিষ্ঠান' নামে বর্ত্তমান আছে।

১১। বৈদ্যরাজগণের ব্রাহ্মণত্ব।

বাঙ্গালার সামাজিক ইতিহাস-প্রণেতা মহাত্মা দুর্গাচন্দ্র সান্যাল বৈদ্যরাজগণের সম্বন্ধে এইরূপ লিখিয়াছেন—"পুরাতন শ্রোত্রীয়েরা এই বৈদ্যরাজগণের অজস্র প্রশংসা করিয়াছেন। সেই প্রশংসা কিছুমাত্র অসঙ্গত বলিয়া মনে হয় না। তাঁহারা ক্ষত্রিয় রাজাদের ন্যায় যুদ্ধপ্রিয় ছিলেন না। * * * সদাচার, সুবিচার ও প্রজাপালন বিষয়ে তাঁহারা ক্ষত্রিয় রাজাদের অপেক্ষা সর্ব্বাংশে শ্রেষ্ঠ ছিলেন। ক্ষত্রিয় রাজারা প্রায়ই মুর্খ ছিল। কিন্তু বৈদ্যরাজারা সকলেই বিদ্বান ও বিদ্যোৎসাহী

ছিলেন। বৈদ্য রাজবংশের সুশাসনই বাঙ্গালা দেশের উন্নতির মূল।' এই উক্তি দ্বারা সেনবংশীয় নৃপতিগণ যে ক্ষত্রিয় হইতে বিভিন্ন এবং ব্রাহ্মণ্য গুণসম্পন্ন ছিলেন তাহা স্পষ্টরূপে ব্যক্ত হইয়াছে। তাঁহারা স্বয়ং আপনাদিগকে বিপ্র অথবা ব্রহ্মক্ষত্রিয় অর্থাৎ ক্ষত্রবৃত্তি-অবলম্বী ব্রাহ্মণ বলিয়া পরিচয় দিতেন, ইহা তাঁহাদের প্রদত্ত তাম্রশাসনাদি হইতে জানা যায়। বাখরগঞ্জ জেলার অন্তর্গত মজিলপুর গ্রামে প্রাপ্ত এক তাম্রশাসনে—যাহাতে মহারাজ লক্ষ্মণ সেন শ্রীকৃষ্ণ ধর দেবশর্ম্মাকে ভূমি দান করিয়াছিলেন (ইহা পূর্ব্বে উক্ত হইয়াছে) সেই তাম্রশাসনের শেষে লক্ষ্মণ সেনের বিশেষণরূপে "ক্ষৌনীভানু" "সন্ধিবিগ্রহকেশ," "বিপ্র" ও "বাধিনায়স্কর" এই চারিটি পদ ব্যবহৃত হইয়াছে। ইহাতে বাধিনায়স্কর অর্থাৎ বদ্ধ-করবাল (অয়স্কর অর্থে অসি) এবং বিপ্র এই দুইটি বিশেষণ পদ দ্বারা তিনি আপনাকে ব্রহ্মক্ষত্রিয়রূপে পরিচিত করিয়াছেন। এই তাম্রশাসনের শেষ শ্লোকে তাঁহাকে ক্ষত্রিয়ধর্ম্মাশ্রিত বলা হইয়াছে। যথা—'বাহুবীর্য্যে শত্রুগণের দমনকারী, সংগ্রামপ্রিয়, **রাজন্যধর্ম্মাশ্রিত** এবং সৌজন্যের সীমাভূমিস্বরূপ রাজা লক্ষ্মণ সেন ইঁহা হইতে জন্মিয়াছিলেন' (৪৪)। 'রাজন্যধর্ম্মাশ্রিত' অর্থাৎ যিনি ক্ষত্রিয় ধর্ম্ম আশ্রয় করিয়াছিলেন—এই কথা বলাতে তিনি যে ক্ষত্রিয় ছিলেন না, তাহা স্পষ্ট বুঝান হইয়াছে। বাখরগঞ্জ জেলার অন্তর্গত ৺কানাইলাল ঠাকুরের জমিদারীতে প্রাপ্ত এক তাম্রশাসনে রাজা লক্ষ্মণ সেন বিশ্ববন্দ্য নৃপ বলিয়া কীর্ত্তিত হইয়াছেন; যথা—'ক্ষিতিপালদিগের শিরোভূষণস্বরূপ **বিশ্ববন্দ্য** রাজা উৎপন্ন হইলেন' (৪৫)। এইরূপ রাজসাহী গোদাগারি থানার অন্তঃপাতী বারিন্দা নামক একটি ক্ষুদ্র গ্রামে প্রাপ্ত প্রস্তরফলকে লিখিত আছে—'সেই সেনবংশে শত শত শত্রুকুলনাশন, **ব্রহ্মবাদী** সামন্ত সেন **ব্রহ্মক্ষত্রিয়-কুলের** শিরোভূষণ স্বরূপে জন্মিয়াছিলেন' (৪৬)। লক্ষ্মণ সেন ও সামন্ত

সেনের বিশেষণরূপে ব্যবহৃত "বিশ্ববন্দ্য" ও "ব্রহ্মবাদী" এই দুইটী শব্দ দ্বারা তাঁহারা সর্ব্বোৎকৃষ্ট ব্রাহ্মণ বলিয়া বর্ণিত হইয়াছেন।

মজিলপুরে প্রাপ্ত তাম্রশাসনের তৃতীয় শ্লোকে লিখিত আছে—'সেবাবনত কোটি কোটি নৃপবৃন্দের তরল মুকুটপ্রভারূপ জলসেক দ্বারা যাঁহাদের পদনখনিঃসৃত জ্যোতিরূপ লতা কর্ত্তৃক শত্রুগণের তেজোরূপ বিষজ্বর নষ্ট হইত, সেই সকল ভূপতিগণ চন্দ্রবংশে (বৈদ্যবংশে) প্রকাশিত বা জাত হইয়াছিলেন' (৪৭)। এইরূপ রাজা কেশব সেনের প্রদত্ত তাম্রশাসনে বর্ণিত হইয়াছে যে, বহুতর নৃপতি বিজয় সেনের চরণযুগলে প্রণাম করিতেন এবং প্রণামকালে নৃপতিগণের মস্তকস্থিত মুকুটসকল তাঁহার পদনখশ্রেণী দ্বারা যেরূপ শোভাপ্রাপ্ত হইত, তাহাতে (একত্রে দশটি মস্তক প্রণত হওয়ায়) বোধ হইত যেন দশানন হরচরণে প্রণাম করিতেছেন' (৪৮)। অতএব সেনবংশীয় নৃপতিগণ সদাচারী ব্রাহ্মণশ্রেষ্ঠ না হইলে যাবতীয় রাজগণ তাঁহাদের চরণে এরূপ ভাবে প্রণত হইবেন কেন ?

মহারাজ লক্ষ্মণ সেনের পঞ্চরত্ন নামক সভার অন্যতম পণ্ডিত হলায়ুধ ভট্ট 'ব্রাহ্মণসর্ব্বস্ব' নামক প্রসিদ্ধ গ্রন্থভূমিকায় লক্ষ্মণ সেনকে "ক্ষ্মাপাল-নারায়ণ," অর্থাৎ ব্রাহ্মণরাজা বলিয়া স্পষ্টতঃ উল্লেখ করিয়াছেন ['ক্ষ্মা' অর্থে পৃথিবী, 'ক্ষ্মাপাল' অর্থে রাজা এবং 'নারায়ণ' অর্থে ব্রহ্ম বা ব্রাহ্মণ ; অতএব 'ক্ষ্মাপাল নারায়ণ' অর্থে ব্রাহ্মণ রাজা]। বিশেষতঃ হলায়ুধ কর্ত্তৃক ব্রাহ্মণসর্ব্বস্ব' নামক গ্রন্থ বৈদ্যদিগের জন্যই লিখিত হওয়ায় ('বৈদ্যহিতৈষিণী' ১ম বর্ষ ৩য় সংখ্যা দ্রষ্টব্য) এবং 'বৈদ্যসর্ব্বস্ব' নামের পরিবর্ত্তে ব্রাহ্মণসর্ব্বস্ব নাম প্রদত্ত হওয়ায়, তাঁহার বৈদ্যকে ব্রাহ্মণ রূপেই নির্দ্দেশ করা হইয়াছে। আরও, আধুনিক সুপ্রসিদ্ধ ঐতিহাসিক ভিন্‌সেণ্ট্ স্মিথ্ ও তৎপ্রণীত বাঙ্গলার ইতিহাসে (The oxford History of Bengal নামক গ্রন্থে)

লিখিয়াছেন—"The Sen kings were originally Brahmans comming from deccan" অর্থাৎ 'সেনরাজগণ পূর্ব্বে ব্রাহ্মণ ছিলেন ও তাঁহারা দাক্ষিণাত্য হইতে বাঙ্গালায় আসিয়াছেন।' 'পূর্ব্বে ব্রাহ্মণ ছিলেন' এই বাক্যের তাৎপর্য্য এই যে, দাক্ষিণাত্যে তাঁহারা ব্রাহ্মণ নামেই প্রসিদ্ধ ছিলেন কিন্তু বঙ্গে তাঁহারা সাধারণ ব্রাহ্মণ সম্প্রদায় হইতে পৃথক্ এবং জাতিতে বৈদ্য নামে পরিচিত। বৈদ্য যে ব্রাহ্মণজাতিরই একটা শাখা, তাহা তিনি এ দেশীয় লোকের নিকট হইতে জানিতে পারেন নাই। সুতরাং এই বিদেশীয় পণ্ডিত যে টুকু সত্য অবগত হইয়াছেন তাহাই মাত্র ব্যক্ত করিয়াছেন। যাহা হউক, এই রাজগণ ব্রাহ্মণ হইলেও বঙ্গদেশে বৈদ্য নামেই চিরপ্রসিদ্ধ। ব্রাহ্মণ, বৈদ্য ও কায়স্থদিগের কুলপঞ্জিকাতে ইঁহারা বৈদ্যকুলোদ্ভব বলিয়া বর্ণিত হইয়াছেন (৪৯)। মহারাজ আদিশূর ধন্বন্তরি-গোত্রীয় এবং বল্লাল বৈশ্বানর-গোত্রীয় ছিলেন। বাঙ্গলায় বৈদ্য ভিন্ন অপর কোন জাতির মধ্যে এই দুই গোত্র বিদ্যমান নাই।

১২। ভারতের অন্যত্র বৈদ্যের মুখ্যব্রাহ্মণত্ব।

বঙ্গদেশ ভিন্ন ভারতের অন্য সকল দেশেই বৈদ্যগণ ব্রাহ্মণবর্ণান্তর্গত; সে সকল স্থলে ব্রাহ্মণজাতি হইতে পৃথক্ বৈদ্য নামে কোন জাতি নাই। দৃষ্টান্ত যথা—

(ক) পশ্চিমে গয়ার গয়ালী ব্রাহ্মণ, অযোধ্যা ও মথুরায় অমৃতসেনী চৌবে ও মাথুর ব্রাহ্মণ এবং গুর্জ্জরে বৈদ্যব্রাহ্মণ প্রভৃতি সকলেই ব্রাহ্মণ। ইঁহারা 'সেন শর্ম্মা' 'গুপ্তশর্ম্মা' 'দত্তশর্ম্মা' প্রভৃতি উপাধিধারী এবং বঙ্গীয় বৈদ্যগণের সহিত গোত্র প্রবর ও বেদশাখায় সমান; অনেকে আবার ধন্বন্তরি-গোত্রসম্ভূত। (ধন্বন্তরিরই অপর নাম অমৃতাচার্য্য এবং এই নাম

হইতে অমৃতসেনী ব্রাহ্মণ নাম হইয়াছে)। এই সকল ব্রাহ্মণ তীর্থগুরুরূপে ব্রাহ্মণাদি সকল বর্ণেরই পূজিত।

(খ) এইরূপ, উত্তর পশ্চিমের শাকদ্বীপি ও পঞ্জাবের বৈদ্ ও পণ্ডিত উপাধিধারী ব্রাহ্মণগণের মধ্যে অনেকে চিকিৎসাবৃত্তিক এবং তাঁহাদের মধ্যে বৈদ্যদিগের উপাধিও বর্ত্তমান আছে, অথচ তাঁহারা সকলেই ব্রাহ্মণ।

(গ) মহারাষ্ট্র দেশের সেনাহ্বী (সেনবি) ব্রাহ্মণগণের অনেকেই 'বৈদ্য' উপাধিধারী, মৎস্যাশী এবং বঙ্গদেশাগত বলিয়া প্রসিদ্ধ। ইঁহারা ধন্বন্তরি, বৈশ্বানর ও কৃষ্ণাত্রেয় গোত্র। উক্ত প্রথম দুইটি গোত্র বঙ্গের বৈদ্যের মধ্যেই দেখা যায়, অন্য ব্রাহ্মণের মধ্যে নাই।

(ঘ) মেদিনীপুর ও উড়িষ্যায় দাশ ধর কর প্রভৃতি উপাধিধারী অনেক ব্রাহ্মণ আছেন,তাহাদের গোত্র প্রবর ও বেদশাখা সেই সেই উপাধি-বিশিষ্ট বৈদ্যদিগের সহিত সমান। উৎকলের ব্রাহ্মণগণের কুলগ্রন্থ মধ্যে নিম্নলিখিত তালিকা দৃষ্ট হয়, যথা—'করশর্ম্মা ভরদ্বাজ গোত্র, ধরশর্ম্মা পরাশর (মতান্তরে কৌশিক) গোত্র, দাশশর্ম্মা মৌদ্গল্য, গুপ্তশর্ম্মা কাশ্যপ, সেনশর্ম্মা ধন্বন্তরি, দত্তশর্ম্মা পরাশর, এবং চন্দ্রশর্ম্মা শাণ্ডিল্য গোত্র ইঁহারা অম্বষ্ঠ দেশীয় ব্রাহ্মণ' (৫০)। বৈদ্যদিগের কুলজী গ্রন্থে এই সকল উপাধিধারীর এই সকল গোত্রই সুপ্রসিদ্ধ। ৺লালমোহন বিদ্যানিধির 'সম্বন্ধ নির্ণয়' নামক গ্রন্থের পরিশিষ্টেও করশর্ম্মা, ধরশর্ম্মা' নন্দীশর্ম্মা, দাশশর্ম্মা ও সেনশর্ম্মার উল্লেখ আছে।

(ঙ) আসামের "বেজবড়ুয়া' নামক ব্রাহ্মণগণ তত্রত্য ব্রাহ্মণ সমাজেরই অন্তর্ভুক্ত। আসামী ভাষায় 'বেজবড়ুয়া • নামের অর্থ বৈদ্যব্রাহ্মণ। (বৈদ্যের অপভ্রংশ বেজ এবং বড়ুয়া অর্থে ব্রাহ্মণ—ইহা ব্রাহ্মণবাচক 'বটু' শব্দের অপভ্রংশ)। বাঙ্গালার বৈদ্যদিগের মত বেজবড়ুয়াগণের • মধ্যেও চিকিৎসাবৃত্তির প্রচুর প্রচলন ও 'বৈদ্য' বলিয়াই প্রসিদ্ধি আছে।

অতএব ভারতের সর্ব্বত্রই যখন বৈদ্যগণকে ব্রাহ্মণবর্ণ বলিয়া দেখা যাইতেছে তখন ব্রাহ্মণবর্ণই যে তাহাদের শাস্ত্রনির্দ্দিষ্ট বর্ণ, তাহাতে আর কোন সন্দেহ নাই। সুতরাং বঙ্গদেশে বৈদ্যদিগের মধ্যে যে বৈশ্যাচার প্রবেশ করিয়াছে উহাকে কখনই তাহাদের শাস্ত্রবিহিত আচার বলা যাইতে পারে না, উহা সামাজিক মিথ্যাচার মাত্র। শাস্ত্রে যখন ব্রাহ্মণবর্ণ হইতে সম্পূর্ণ পৃথক্ বৈদ্যনামক জাতির উল্লেখ নাই এবং দৃষ্টান্তেও কোন দেশে উহার অস্তিত্ব দেখা যায় না, তখন বঙ্গদেশে অজ্ঞ সাধারণের নিকট বৈশ্যবর্ণ অথবা অন্যরূপে প্রতীয়মান্ বৈদ্যনামক জাতির সত্ত্বা "আকাশ কুসুম" "অশ্বডিম্ব" প্রভৃতির ন্যায় অলীক কল্পনা বৈ আর কিছুই নহে। শাস্ত্রোক্ত 'বৈদ্য' উপাধি ব্রাহ্মণ ভিন্ন অপরের হইতে পারে না, ইহা আমরা পূর্ব্বে বুঝিয়াছি; এ নিমিত্ত বৈদ্যকে শাস্ত্রানুসারে অব্রাহ্মণরূপে প্রতিপন্ন করিবার প্রয়াস বিড়ম্বনা মাত্র। এইরূপ দুশ্চেষ্টাবশতই বঙ্গে বৈদ্যের স্বরূপ সম্বন্ধে কেহই একমত হইতে পারিতেছেন না এবং যাঁহার যেরূপ ইচ্ছা তিনি বৈদ্যকে গালি দিয়া আত্মতৃপ্তি লাভ করিতেছেন।

১৩। বৈদিক ব্রাহ্মণের সহিত বৈদ্যের যৌন সম্বন্ধ।

বৈদ্যকুলজী 'চন্দ্রপ্রভা'য় উড়িষ্যাবাসী বৈদিক ব্রাহ্মণের সহিত বাঙ্গালী বৈদ্যের অনেকগুলি যৌন সম্বন্ধের কথা লিখিত আছে। অতএব তিন চারি শত বৎসর পূর্ব্বেও উড়িষ্যার দাশোপধিক ব্রাহ্মণের সহিত বাঙ্গালার বৈদ্যব্রাহ্মণদিগের আদান প্রদান প্রচলিত ছিল দেখা যাইতেছে। 'পৃথিবীর ইতিহাস' লেখক দুর্গাদাস লাহিড়ী মহাশয় উৎকলদেশীয় ব্রাহ্মণগণকে দুই শ্রেণীতে বিভক্ত বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। এক দাক্ষিণাত্য ও অপর যাজপুরী। তন্মধ্যে দাক্ষিণাত্য ব্রাহ্মণগণ বৈদিক ও কুলীন। ইঁহাদের সঙ্গেই বৈদ্যদিগের আদান প্রদান চলিত,

যাজপুরীদিগের সহিত নহে। চন্দ্রপ্রভাতে লিখিত আছে—'দুর্দ্দৈববশতঃ কটকস্থিত শ্যাম দাশ মিশ্রের কন্যা রাম সেন কর্ত্তৃক গৃহীত হইয়াছিল'—'অনন্তর শরণকৃষ্ণ কর্ত্তৃক বালেশ্বর-নিবাসী মহেশ দাশের কন্যা দৈবদোষে গৃহীত হইয়াছিল'—'বান সেন, শশী সেন, পুণ্ডরীকাক্ষ সেন, ইহারা সকলে ঔড্রদেশীয় বিদ দাশের কন্যার পতি'—'ধনিরাম ভদ্রকনিবাসী গোবিন্দ দাশ কন্যার পতি' ইত্যাদি (৫১)। যাহা হউক, উড়িষ্যাবাসী বৈদিক ব্রাহ্মণ-দিগের সহিত এইরূপ আদান প্রদান বৈদ্যগণ গৌরবজনক বলিয়া মনে করিতেন না—পরন্তু মর্য্যাদাহানিকর বলিয়াই বিবেচনা করিতেন, ইহা উপরোক্ত "দুর্দ্দৈববশতঃ" "দৈবদোষে" ইত্যাদিরূপ বাক্যে প্রকাশ পাইয়াছে।

১৪। বিদ্যাবত্তায় বৈদ্যের শীর্ষস্থানীয়তা।

ঋক্, সাম, যজুঃ ও অথর্ব্ব এই চারি বেদ। ইহাদের মধ্যে অথর্ব্ববেদ সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। বিষ্ণুপুরাণে লিখিত আছে—'বেদব্যাস মুনি যজুঃসমূহ দ্বারা আধ্বর্য্যব, ঋক্সমূহ দ্বারা হোম, সামসমূহ দ্বারা ঔদ্গাত্র এবং অথর্ব্বসমূহ দ্বারা **ব্রহ্মত্ব সংস্থাপন** করিলেন। তিনি অথর্ব্ববেদ দ্বারা রাজার সমুদায় কর্ম্ম করাইলেন ও **ব্রহ্মত্বের ব্যবস্থা** করিলেন' (৫২)। যে বেদ দ্বারা ব্রহ্মত্ব সংস্থাপিত হয় তাহাই শ্রেষ্ঠ বেদ। 'অথর্ব্ব' শব্দের ধাত্যর্থের প্রতি অনুধাবন করিলেও উহা প্রতিপাদিত হয়। যথা—অথ (মঙ্গল)+ঋ ধাতু [গমন করা]—বন্ প্রত্যয় করিয়া 'অথর্ব্ব' শব্দ নিষ্পন্ন হইয়াছে। সুতরাং যে বেদ মঙ্গলস্বরূপ ব্রহ্মে গমন করে বা লইয়া যায় তাহাই অথর্ব্ব বেদ। গোপথ ব্রাহ্মণেও অথর্ব্ববেদকে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বলা হইয়াছে এবং উহার নাম ব্রহ্মবেদ দেওয়া হইয়াছে। পূর্ব্বে যে ঋক্ সাম ও যজুর্ব্বেদ অধ্যয়নান্তে

অথর্ব্ববেদ অধ্যয়ন করিবার রীতি ছিল, তাহাতেও অথর্ব্ববেদের শ্রেষ্ঠত্ব প্রকাশ পায়। আবার 'ভাবপ্রকাশ' নামক আয়ুর্ব্বেদীয় গ্রন্থে আয়ুর্ব্বেদকে 'অথর্ব্বসর্ব্বস্ব' বলিয়া বর্ণনা করায়, অথর্ব্ববেদের অংশসমূহের মধ্যে আয়ুর্ব্বেদ নামক অংশকেই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বলা হইয়াছে (৫৩)। মহর্ষি চরক এবং সুশ্রুতও আয়ুর্ব্বেদকে সকল বেদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ (৫৪) ও পুণ্যতম বেদ বলিয়া ঘোষণা করিয়াছেন।

প্রাচীনকালে সকল বেদ ব্রহ্মচর্য্যাশ্রমে অধ্যয়ন করিবার রীতি ছিল। গার্হস্থ্যাশ্রমে বেদাধ্যয়ন প্রকৃত অধ্যয়ন বলিয়া গণ্য হইত না এবং তদ্দ্বারা বেদোক্ত বৃত্তিগ্রহণেও অধিকার জন্মিত না। তৎকালে অথর্ব্ববেদ পড়িতে হইলে প্রথমে ঋক্ সাম ও যজুর্ব্বেদ অধ্যয়ন সমাপ্ত করিয়া পুনরায় অথর্ব্ববেদে উপনীত হইতে হইত, ইহা ডল্বনাচার্য্য সুশ্রুতটীকায় প্রকাশ করিয়াছেন (৫৫)। এইরূপে ব্রহ্মচর্য্যাশ্রমে অথর্ব্ববেদ পর্য্যন্ত অধ্যয়ন করিলেও বেদবিদ্যার পরিসমাপ্তি হইত না, কারণ তখনও আয়ুর্ব্বেদ অবশিষ্ট থাকিত। আয়ুর্ব্বেদ অথর্ব্ববেদের অন্তর্গত বলিয়া কথিত হইলেও, বিশিষ্টতা হেতু উহা অথর্ব্ববেদ হইতে পৃথক্ পঞ্চম বেদ স্বরূপে গণ্য হইত। এ কারণ অথর্ব্ববেদে উপনীত হইলেও আয়ুর্ব্বেদ অধ্যয়নের অধিকার লাভ হইত না। যিনি বেদত্রয় অধ্যয়নান্তে আয়ুর্ব্বেদে উপনীত হইতেন তাঁহাকে অগ্রে গন্ধর্ব্ববিদ্যা, ধনুর্ব্বিদ্যা, জ্যোতির্ব্বিদ্যা প্রভৃতি অথর্ব্ববেদের অংশসমূহ পড়িয়া অবশেষে আয়ুর্ব্বেদ বিদ্যা লাভ করিতে হইত—যেহেতু ঐ সমস্ত বিদ্যা অপেক্ষা আয়ুর্ব্বেদ-বিদ্যাই শ্রেষ্ঠ এবং আয়ুর্ব্বেদ অধ্যয়ন করিলেই বেদবিদ্যা সম্পূর্ণ হইত। এইরূপে যে বিপ্রের ব্রহ্মচর্য্যাশ্রমেই বেদবিদ্যা সম্পূর্ণ হইত, তিনিই বৈদ্য আখ্যা প্রাপ্ত হইতেন, অপরে নহে। এক্ষণে যেমন বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষোত্তীর্ণ না হইলে কেহ এম এ, এম ডি প্রভৃতি উপাধি লাভ করিতে পারেন না, সেইরূপ ব্রহ্মচারী অবস্থায় আয়ুর্ব্বেদ পর্য্যন্ত সর্ব্ববিদ্যা সমাপন না

করিলে কেহ বৈদ্য আখ্যা প্রাপ্ত হইতে পারিতেন না এবং এইরূপে বৈদ্যত্ব প্রাপ্তি ভিন্ন কাহারও চিকিৎসায় অধিকার জন্মিত না। মহর্ষি চরক স্পষ্টই বলিয়াছেন—'বিদ্যা সমাপ্ত হইলে ভিষকের সম্যক্ জ্ঞান-লাভরূপ তৃতীয় জন্ম হয়। তখন তিনি বৈদ্য নাম প্রাপ্ত হন। তৎপূর্ব্বে মাতৃগর্ভ হইতে প্রথম এবং বৈদিক উপনয়নসংস্কাররূপ দ্বিতীয় জন্ম দ্বারা কেহ বৈদ্য হয় না। বিদ্যাসমাপ্তিতে জ্ঞান হেতু বৈদ্যের হৃদয়ে ব্রাহ্ম ও আর্ষ সত্ত্ব * নিশ্চয় প্রবেশ করে এবং এই সত্ত্ব অর্থাৎ অধিকার প্রাপ্তির জন্য তিনি ত্রিজ বলিয়া কথিত হন' (৫৬)।

'বৈদ্য' কথাটির ব্যুৎপত্তিগত অর্থ এইরূপ। উহা 'বিদ্যা' বা 'বেদ'শব্দ হইতে নিষ্পন্ন। শতপথ ব্রাহ্মণে ঋক্, সাম ও যজুঃ এই তিন বেদকে বিদ্যা নামে অভিহিত করা হইয়াছে (৫৭)। সুতরাং 'বিদ্যা' শব্দের মুখ্য অর্থ বেদ। পুরাণোক্ত চতুর্দ্দশ বা অষ্টাদশ বিদ্যা বিদ্যানামে অভিহিত হইলেও, ত্রয়ী বা বেদই 'বিদ্যা' শব্দের মুখ্য অর্থ। পাণিনীয় সূত্র অনুসারে 'যাঁহারা এই বিদ্যা জানেন এবং অভ্যাস করেন' তাঁহারাই বৈদ্য (৫৮) [এখানে বিদ্যা + অন্ = বৈদ্য]। প্রকৃতিবাদ অভিধান অনুসারে **'বৈদ্য' শব্দের অর্থ**— বিদ্বান্, পণ্ডিত, ভিষক্, চিকিৎসক [উৎপত্তি যথা—বেদ (বিদ্যা) + অ (ষ্ণ) কুশলার্থে অর্থাৎ **বেদকুশল বা বিদ্যাকুশল** মেধাতিথিও অর্থ করিয়াছেন—বিদ্বান্ অথবা ভিষক্ (৫৯)। এইরূপ 'বেদ হইতে জাত হইলে বৈদ্য হন' এই শঙ্খ বচনের টীকায় ধরণীধর লিখিয়াছেন—বেদ হইতে=বেদজ্ঞান হইতে। যেরূপ বেদবাচক 'ব্রহ্মণ' শব্দ হইতে

* ব্রাহ্মসত্ত্ব = ব্রহ্মবিষয়ক অধিকার। আর্ষসত্ত্ব = ঋষিদিগের অধিকার। বিদ্যাসমাপ্তিতে জ্ঞান হেতু বৈদ্য ব্রাহ্ম ও আর্ষসত্ত্ব প্রাপ্ত হন—ইহার অর্থ এই যে, তখন বৈদ্য বিধি-নিষেধকে অতিক্রম করেন এবং তাঁহার কার্য্যই বিধি-নিষেধের পরিচায়ক হয়।

[যিনি বেদ জানেন এই অর্থে] ব্রাহ্মণ শব্দ সিদ্ধ হইয়াছে, সেইরূপ বৈদ্য শব্দও [বেদজ্ঞান-নিপুন এই অর্থে] 'বেদ' শব্দ হইতে নিষ্পন্ন হইয়াছে' (৬০)। অতএব বুঝা যাইতেছে যে, বৈদ্য ও ব্রাহ্মণ উভয় শব্দেরই ব্যুৎপত্তিগত অর্থ—বেদজ্ঞ বা বিদ্বান্। বেদজ্ঞানই ব্রাহ্মণত্বের হেতু, বেদজ্ঞানহীন ব্রাহ্মণ ব্রাহ্মণনামের অযোগ্য এবং সেই বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণের নামই বৈদ্য। মহাভারত উদ্যোগ পর্ব্বে লিখিত আছে—'যাঁহারা বৈদ্য (বেদজ্ঞ) নহেন, তাঁহারা ব্রাহ্মণনামের অনধিকারী' (৬১)। কাত্যায়ন সংহিতার নিম্নলিখিত বচনেও 'বৈদ্য' শব্দ 'বিদ্বান্' অর্থেই ব্যবহৃত। যথা—'বৈদ্য (বিদ্বান্) কখন অবৈদ্যকে (বিদ্যাহীনকে) বিদ্যা লব্ধ ধন দান করিবেন না' (৬২)।

এইরূপ বৈদ্য অর্থে সাধারণতঃ বিদ্বান্ ব্রাহ্মণ বুঝাইলেও পূর্ব্বে উক্ত শব্দ বিশিষ্ট বিদ্বান্ ব্রাহ্মণের প্রতিই প্রযুক্ত হইত। তৎকালে ভিষক্ ব্রাহ্মণগণই বিশিষ্ট বিদ্বান্ বলিয়া বিবেচিত হইতেন। সেই হেতু তাঁহারা বৈদ্য নামে পরিচিত। বৈদ্যক্ গ্রন্থ 'চক্রদত্তের' টীকায় শিবদাস লিখিয়াছেন—'ইহার (ভিষকের) প্রশস্ত বিদ্যা আছে এই অর্থে বৈদ্য কথিত হন' (৬৩)। আমরা পূর্ব্বে ঋগ্বেদ হইতে সপ্রমাণ করিয়াছি যে, পুরাকালে ব্রাহ্মণগণই ভিষক্ হইতেন এবং ব্রাহ্মণ ভিন্ন অপর কোন জাতি ভিষক্ পদবাচ্য হইতে পারিতেন না; আর চরকের বাক্যেও অবগত হইয়াছি যে; ভিষক্‌কে সর্ব্ববিদ্যা সমাপ্তি দ্বারা বৈদ্য বা ত্রিজ হইতে হইত। অতএব ভিষক্-ব্রাহ্মণেরাই ব্রাহ্মণদিগের মধ্যে শ্রেষ্ঠ বিদ্বান্ বলিয়া খ্যাত হইতেন। ভিষক্‌গণ ব্রহ্মচর্য্যাবস্থায় চতুর্ব্বেদ সমাপনানন্তর আয়ুর্ব্বেদ অধ্যয়ন করিতেন বলিয়া তাঁহাদেরই বেদবিদ্যা সম্পূর্ণ হইত এবং তজ্জন্য তাঁহারা বৈদ্যনাম প্রাপ্ত হইতেন। কিন্তু ব্রহ্মচর্য্যাবস্থায় আয়ুর্ব্বেদ অধ্যয়ন না করায় বেদবিদ্যার অসমাপ্তি হেতু চতুর্ব্বেদবেত্তা ব্রাহ্মণও বৈদ্যনামের অধিকারী

হইতেন না। সর্ব্ববেদের অন্তে আয়ুর্ব্বেদ পড়িতে হইত বলিয়া আয়ুর্ব্বেদজ্ঞ হইলেই সমাপ্তবিদ্য (অর্থাৎ বৈদ্য) বা সর্ব্ববেদজ্ঞ বুঝাইত। এই নিমিত্ত বৈদ্য বা সর্ব্ববেদজ্ঞ বলিলে কেবল ভিষক্‌কেই বুঝাইত, অপর ব্রাহ্মণকে বুঝাইত না। 'বৈদ্য' শব্দ ভিষকে রূঢ় হওয়ায়, পরে উক্ত শব্দের অর্থ 'ভিষক্' হইয়া পড়িয়াছে। ইংরাজীতে Doctor (ডাক্তার) কথাটি প্রথমে আইন, বিজ্ঞান প্রভৃতিতে অসাধারণ পণ্ডিতকে বুঝাইতে ব্যবহৃত হইত [যথা—ডি এল্, ডি এস্‌সি ইত্যাদি]। ক্রমে অসাধারণ চিকিৎসক অর্থেও উহার প্রচলন হইল। কিন্তু এক্ষণে শুধু Doctor (ডাক্তার) বলিলে যেমন কেবল সুবিজ্ঞ চিকিৎসককেই বুঝায়, আইন বা বিজ্ঞানাদিতে সুপণ্ডিতকে বুঝায় না, সেইরূপ বৈদ্য বলিলে কেবল সুবিদ্বান্ ভিষক্ ব্রাহ্মণকেই বুঝাইত—বিদ্বান্ ব্রাহ্মণমাত্রকেই নহে। আরও, ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য এই তিন বর্ণ ই 'দ্বিজ'পদবাচ্য হইলেও, যেমন 'দ্বিজ' বলিলে ক্ষত্রিয় ও বৈশ্যকে না বুঝাইয়া দ্বিজশ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণকেই বুঝাইয়া থাকে, তদ্রূপ কৃতবিদ্য স্নাতক বিপ্র মাত্রেই এক অর্থে বৈদ্য-পদবাচ্য হইলেও, বৈদ্য শব্দে ঐরূপ বিপ্রগণের মধ্যে যাঁহারা সর্ব্বোৎকৃষ্ট সেই ভিষক্ ব্রাহ্মণগণই লক্ষিত হইতেন।

পূর্ব্বে ভিষক্ ব্রাহ্মণগণই যে সর্ব্বাপেক্ষা অধিক বিদ্বান্ ছিলেন তাহা তাঁহাদের বর্ত্তমান 'কবিরাজ' উপাধিই সাক্ষ্য প্রদান করিতেছে। অমরকোষে লিখিত আছে যে—বিদ্বান্, সুধী, বুধ, মনীষি, প্রাজ্ঞ, পণ্ডিত ও কবি এই শব্দগুলি একার্থবাচক (৬৪)। অতএব 'কবিরাজ' শব্দের অর্থ—কবি বা বিদ্বান্‌দিগের মধ্যে রাজার ন্যায় অর্থাৎ শ্রেষ্ঠ। ইহাতে স্পষ্টই বুঝা যাইতেছে যে, পূর্ব্বে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বিদ্বান্‌গণই ভিষক্ হইতেন; যেহেতু ভিষক্‌গণের ঐরূপ বিদ্যাবত্তার পরিচায়ক 'কবিরাজ' এবং 'বৈদ্য' নাম প্রাপ্ত হইবার অপর কোন যুক্তিযুক্ত কারণ বিদ্যমান নাই। এস্থলে

ইহা লক্ষ্য করিবার বিষয় যে, অমরকোষের এই বচন 'ব্রহ্মবর্গে' লিখিত হওয়ায়, কবি বা কবিরাজকে ব্রাহ্মণবর্ণ মধ্যে গণনা করা হইয়াছে। এতদ্ভিন্ন ব্রাহ্মণ ব্যতীত অপর কাহারও বিদ্যামূলক উপাধিধারণের অধিকার ছিল না, সুতরাং বিদ্যাবত্তার প্রধান পরিচায়ক 'বৈদ্য' উপাধি ব্রাহ্মণ ভিন্ন অন্য জাতির হইতেই পারে না।

মনু বলিয়াছেন—'ধন, সম্বন্ধ, বয়স, কর্ম্ম ও বিদ্যা এই পাঁচটি মান্যের হেতু; ইহাদের মধ্যে পর পরটি পূর্ব্ব পূর্ব্ব অপেক্ষা অধিকতর মান্য' এবং 'বিপ্রগণের জ্যেষ্ঠতা জ্ঞানানুসারে হইয়া থাকে' (৬৫) ইত্যাদি। এতদনুসারে সর্ব্ববেদজ্ঞ ভিষক্ ব্রাহ্মণেরাই ব্রাহ্মণদিগের মধ্যে শ্রেষ্ঠ বলিয়া বুঝা যাইতেছে। মনু আরও বলিয়াছেন—'ব্রাহ্মণগণের মধ্যে বিদ্বান্‌গণ শ্রেষ্ঠ; বিদ্বান্‌দিগের মধ্যে কৃতবুদ্ধিগণ (অর্থাৎ সেই লব্ধবিদ্যার অনুষ্ঠান দ্বারা সম্যক্ বুদ্ধিসম্পন্নেরা) শ্রেষ্ঠ; তাঁহাদের মধ্যে আবার কর্ত্তৃগণ (অর্থাৎ যে সকল সম্যক্ বুদ্ধিসম্পন্ন ব্যক্তি সমাজকে নিয়মিত করিতে সমর্থ, সেই প্রভুত্ব-গুণবিশিষ্টেরা) শ্রেষ্ঠ এবং তাঁহাদের মধ্যেও ব্রহ্মজ্ঞগণ শ্রেষ্ঠ' (৬৬)। কৃষ্ণদ্বৈপায়ন ব্যাসও মহাভারত উদ্যোগ-পর্ব্বে এই কথার প্রতিধ্বনি করিয়াছেন, যথা—'নরগণের মধ্যে দ্বিজগণ শ্রেষ্ঠ, দ্বিজগণের মধ্যে বৈদ্যগণ শ্রেষ্ঠ, বৈদ্যগণের মধ্যে কৃতবুদ্ধি, কর্ত্তা ও ব্রহ্মবিদ্‌গণ যথাক্রমে শ্রেষ্ঠ (৬৬)। এখানে মনু যে ব্রাহ্মণগণের মধ্যে বিদ্বান্‌গণ শ্রেষ্ঠ বলিয়াছেন, মহাভারতে অবিকল সেই অর্থেই দ্বিজগণের মধ্যে বৈদ্যগণ শ্রেষ্ঠ বলা হইয়াছে। অতএব বিদ্যাবত্তায় ভিষকের বা সমাপ্তবিদ্য বৈদ্যের প্রাধান্য হেতু মনূক্ত 'বিদ্বান্' পদে প্রধানতঃ ভিষক্ ব্রাহ্মণই লক্ষিত হইয়াছেন এবং মর্য্যাদাবিষয়েও মনুর মতে ব্রাহ্মণদিগের মধ্যে ভিষক্ বৈদ্যগণই শ্রেষ্ঠ' ইহা বুঝিতে হইবে।

১৫। বৈদ্যের গৌরব।

প্রাচীন কালে যে সকল ব্রাহ্মণ সর্ব্ববেদজ্ঞ ও সম্যক্ বুদ্ধিসম্পন্ন হইতেন, তাঁহারাই সর্ব্ববর্ণের রক্ষক ও পিতৃস্বরূপ হইয়া 'বৈদ্য' 'তাতবৈদ্য' (তাত = পিতা),'সর্ব্বতাত' (সকলের পিতৃস্বরূপ) প্রভৃতি নামে আখ্যাত হইতেন। যেমন রামায়ণে উক্ত হইয়াছে—[শ্রীরামচন্দ্র ভরতকে জিজ্ঞাসা করিতেছেন] 'তুমি দেবগণকে, পিতৃগণকে, পিতৃসম গুরুগণকে, ভৃত্যগণকে (এখানে ভৃত্য অর্থে ভরণীয় বা সেবণীয়—সেবক নহে) বৃদ্ধগণকে, তাত (পিতৃস্থানীয়) বৈদ্যগণকে এবং ব্রাহ্মণগণকে সম্বর্দ্ধনা করিতেছ ত (৬৭) ? এইরূপ ঋগ্বেদে লিখিত আছে—(ইন্দ্র কহিতেছেন) 'আমি শততম নগরটি (কাশীধাম) সর্ব্বতাত (সকলের পিতৃস্বরূপ) অতিতেজস্বী বৈদ্য দিবোদাসকে (ধন্বন্তরিকে) তাঁহার বাসার্থ প্রদান করিয়াছি' (৬৮)।

বশিষ্ঠ, ধন্বন্তরি, চন্দ্র প্রভৃতি মহাপুরুষগণও যে বৈদ্য নামে পরিচিত ছিলেন তাহা শাস্ত্র হইতে অবগত হওয়া যায়। রামায়ণে লিখিত আছে—'তৎপরে প্রকৃতিমান্, পিতৃপুরোহিত, বৈদ্য বশিষ্ঠদেব ভরতকে উঠাইয়া এই বাক্য কহিলেন (৬৯) ইত্যাদি। [শক্তি গোত্র ও বশিষ্ঠগোত্র বৈদ্যগণ এই বংশসম্ভূত]। গরুড় পুরাণে কথিত আছে—'সমুদ্রমন্থন-কালে বৈদ্য ধনন্তরিদেব অমৃতপূর্ণ কমণ্ডলুহস্তে আবির্ভূত হইয়াছিলেন' (৭০)। (ধন্বন্তরি গোত্রীয় বৈদ্যগণের ইনিই আদি পুরুষ)। আরও, বৃহদ্ধর্ম্মপুরাণ উত্তরখণ্ড চন্দ্রস্তোত্রে উক্ত হইয়াছে—'চন্দ্র অমৃতময়, শ্বেতবর্ণ, বিধু, বিমলরূপবান্, যজ্ঞরূপ, যজ্ঞভাগী, বৈদ্য এবং বিদ্যাবিশারদ' ([illegible])। [এখানে 'বিদ্যাবিশারদ' এই কথাটির স্বতন্ত্র উল্লেখ থাকায়, বৈদ্য [illegible] 'বিদ্বান্' অর্থে প্রযুক্ত নহে—চিকিৎসক অর্থেই ব্যবহৃত]।

এইরূপ মৌদ্গল্য, ভরদ্বাজ, আত্রেয়, কৃষ্ণাত্রেয়. কাশ্যপ, কৌশিক প্রভৃতি—বৈদগণের গোত্রপ্রবর্ত্তক মহর্ষিগণও যে বৈদ্য ছিলেন তাহারও প্রমাণ পাওয়া যায় (চরক সূত্র ২১—২৬ অধ্যায় দ্রষ্টব্য)।

ঋগ্বেদে লিখিত আছে—'হে ওষধে, তোমাকে গন্ধর্ব্বেরা খনন করিয়াছিল, তোমাকে দেবরাজ ইন্দ্র খনন করিয়াছিলেন, তোমাকে দেবগুরু বৃহস্পতি (কোন কোন বৈদ্যের গোত্রভূত) খনন করিয়াছিলেন এবং বিদ্বান্ (বৈদ্য) রাজা সোম তোমাকে জানিয়া যক্ষ্মারোগ হইতে মুক্ত হইয়াছিলেন' (৭২)। এখানে ইন্দ্র, বৃহস্পতি ও চন্দ্রকে বৈদ্য বলা হইয়াছে। ইন্দ্র বৈদ্য বলিয়াই স্বর্গের রাজা ছিলেন এবং তিনি মর্ত্ত্যে বৈদ্য দিবোদাস ধন্বন্তরিকে কাশীর রাজা করিয়াছিলেন। ব্রহ্মা তাঁহার জ্যেষ্ঠ পুত্র অঙ্গিরাকে আয়ুর্ব্বেদ শিক্ষা দিয়াছিলেন। ইঁহার অপর নাম অথর্ব্বা (ভিষক্ অথর্ব্বন্) এবং ইনি আদি বৈদ্য। 'আদ্দি কালের বদ্দিবুড়া' এই যে প্রবাদ বাক্য অদ্যাপি প্রচলিত রহিয়াছে তাহা ব্রহ্মার জ্যেষ্ঠ পুত্র এই অঙ্গিরা বা অথর্ব্বাকে লক্ষ্য করিয়াই উক্ত হইয়া থাকে। যাহা হউক, অঙ্গিরা স্বীয় পুত্র বৃহস্পতিকে আয়ুর্ব্বেদ শিখাইয়াছিলেন, এজন্য বৃহস্পতিও বৈদ্য। ব্রহ্মার পুত্র অত্রি ব্রহ্মা হইতে আয়ুর্ব্বেদ বিদ্যা লাভ করেন এবং তিনি স্বপুত্র চন্দ্রকে তাহা শিখাইয়াছিলেন। সুতরাং অত্রি ও চন্দ্র উভয়েই বৈদ্য। চন্দ্র রাজা হইলেও বৈদ্য ছিলেন। এই চন্দ্রবংশে অনেক বৈদ্য উৎপন্ন হইয়াছিলেন। সুপ্রসিদ্ধ ধন্বন্তরিও চন্দ্রবংশীয়।

১৬। বৈদ্যের চাতুর্ব্বর্ণ্য-সমাজ নেতৃত্ব।

মনু বলিয়াছেন—'বেদশাস্ত্রবিৎ ব্যক্তি সৈনাপত্য, রাজ্যাধিকার, দণ্ড-এবং সর্ব্বলোকের উপর আধিপত্য করিবার যোগ্য' (৭৩)। এখানে

'বেদশাস্ত্রবিৎ' কথাটির অর্থ কি বা উক্ত শব্দ কাহার প্রতি প্রযুক্ত হইয়াছে, ইহাই জিজ্ঞাস্য। সৈনাপত্য প্রভৃতি কার্য্য ক্ষত্রবৃত্তিরূপে গণ্য এবং বেদশাস্ত্র ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য সকলেই কিছু না কিছু জানেন। সুতরাং এখানে 'বেদশাস্ত্রজ্ঞ' অর্থে ক্ষত্রিয়কে অথবা ব্রাহ্মণকে লক্ষ্য করা হইয়াছে, ইহা নিরূপণ করিতে হইবে। আমরা পূর্ব্বে দেখাইয়াছি যে, বিদ্যাবত্তার পরিচায়ক শব্দ কদাচ ব্রাহ্মণ ভিন্ন ক্ষত্রিয়াদির প্রতি প্রযোজ্য নহে। সুতরাং 'বেদশাস্ত্রজ্ঞ' কথাটি ক্ষত্রিয়কে বুঝাইতে পারে না। বিশেষতঃ, 'দ্বিজ' শব্দে যেমন দ্বিজশ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণকে বুঝায়, সেইরূপ 'বেদশাস্ত্রবিৎ' বলিলে যিনি বেদশাস্ত্রজ্ঞানে প্রধান তাঁহাকেই বুঝাইয়া থাকে। অতএব ঐরূপ ব্যক্তি ব্রাহ্মণ ভিন্ন ক্ষত্রিয় হইতেই পারে না ইহা নিশ্চয়। আবার, ব্রাহ্মণের পক্ষেও আপৎ কাল ব্যতীত ক্ষত্রবৃত্তি অবলম্বন নিষিদ্ধ। সুতরাং ব্রাহ্মণকে ঐ সকল ক্ষত্রকার্য্য করিবার যোগ্য অধিকারী বলিয়া নির্দ্দেশ করা নিতান্ত অসম্ভব। অতএব ইহা স্পষ্ট বুঝা যাইতেছে যে, 'বেদশাস্ত্রবিৎ' এই বাক্য ব্রাহ্মণ অথবা ক্ষত্রিয় কাহারও প্রতি উক্ত হয় নাই—উক্ত বাক্যে যিনি বেদশাস্ত্রে সম্যক্ অভিজ্ঞ কেবল তাঁহাকেই লক্ষ্য করা হইয়াছে। ঐ বাক্য এখানে যোগরূঢ়ী অর্থে ব্যবহৃত এবং উহা বেদশাস্ত্রজ্ঞদিগের মধ্যে যাঁহারা সর্ব্বশ্রেষ্ঠ, সেই সমাপ্তবিদ্য অর্থাৎ সর্ব্ববেদজ্ঞ ও সর্ব্বশাস্ত্রে বিশারদ বৈদ্যব্রাহ্মণকেই বুঝাইয়াছে, সামান্য ব্রাহ্মণ বা ক্ষত্রিয়কে নহে। আমরা মহর্ষি চরকের বাক্যে বুঝিয়াছি যে, বৈদ্যের বিদ্যাসমাপ্তিতে সম্যক্ জ্ঞান হেতু ব্রাহ্ম ও আর্ষ সত্ত্ব লাভ হয় অর্থাৎ তখন তিনি সাধারণ বিধিনিষেধকে অতিক্রম করিয়া বিশিষ্ট অধিকার প্রাপ্ত হন। এই নিমিত্তই বৈদ্য ব্রাহ্মণ হইলেও ক্ষত্রিয়াদির যে কোন বৃত্তি অবলম্বন করিলে তাঁহার পাতিত্য ঘটে না। মনুও বলিয়াছেন,—'যেমন জাতবল অগ্নি আর্দ্র কাষ্ঠসমূহকেও দগ্ধ করে, তদ্রূপ বেদজ্ঞ ব্যক্তি আপনার কর্ম্মজনিত দোষসকলকে দগ্ধ

করেন। বেদশাস্ত্রতত্বজ্ঞ ব্যক্তি যে কোন আশ্রমেই বাস করুন (অর্থাৎ যেরূপ ব্যবহারপরায়ণ হউন না কেন) তিনি ইহলোকে থাকিয়াই ব্রহ্মত্ব প্রাপ্তির যোগ্য হন' (৭৪)। পাণ্ডিত্য ত দূরের কথা, সর্ব্ববেদজ্ঞ বৈদ্যই ব্রাহ্মণোচিত যাজন, অধ্যাপনাদি এবং ক্ষত্রোচিত রাজকার্য্য, সৈনাপত্য প্রভৃতি কার্য্যের সর্ব্বোৎকৃষ্ট অধিকারী।

পুরাকালে ক্ষত্রিয় দ্বিবিধ ছিল, যথা—ব্রহ্মক্ষত্রিয় ও সামান্য ক্ষত্রিয়। সে সময়ে পৃথিবীতে যে সকল রাজা ছিলেন তাঁহারা সকলেই ব্রাহ্মণ রাজা, সেজন্য তাঁহারা ব্রহ্মক্ষত্রিয় নামে প্রসিদ্ধ ছিলেন; কিন্তু অজ্ঞ লোকে তাঁহাদিগকে সামান্য ক্ষত্রিয় বলিয়া মনে করে। যেমন চন্দ্রবংশীয় সুবিখ্যাত রাজা নহুষের পুত্র যযাতি ব্রহ্মক্ষত্রিয়রূপেই বিবেচিত হইতেন, সামান্য ক্ষত্রিয় বলিয়া নহে। তিনি ব্রাহ্মণ শুক্রাচার্য্যের কন্যা দেবযানির পাণিগ্রহণ করেন। যযাতি সামান্য ক্ষত্রিয় হইলে কখনই তাঁহার ব্রাহ্মণকন্যার সহিত বিবাহ হইতে পারিত না এবং প্রতিলোমে অবৈধ সংসর্গ হেতু তজ্জাত পুত্রও বর্ণসঙ্কর সূতজাতিরূপে গণ্য হইত। কিন্তু তাহা না হওয়ায় স্পষ্টই বুঝা যাইতেছে যে, যযাতি ক্ষত্রিয় নামে প্রসিদ্ধ হইলেও জাতিতে ব্রাহ্মণই ছিলেন। আবার রামায়ণে উক্ত হইয়াছে যে, রাজা দশরথের মৃত্যুতে রাজপুত্র ভরত দশ দিনে শুদ্ধ হইয়া স্বর্গীয় পিতার প্রেতত্ব মুক্তির নিমিত্ত কর্ম্মসমুদায় সম্পাদন পূর্ব্বক দ্বাদশদিনে পিতৃশ্রাদ্ধের অনুষ্ঠান করিলেন' (৭৪।১)। এ স্থলে ভরত প্রভৃতির ব্রাহ্মণবিহিত অশৌচপালন হেতু ব্রাহ্মণত্ব প্রকাশ পাইয়াছে। আরও, ক্ষত্রিয়নামে প্রসিদ্ধ কুরুপাণ্ডবগণও যে জাতিতে ব্রাহ্মণ ছিলেন তাহা নিম্নলিখিত ভীষ্মতর্পণ মন্ত্র হইতেও জানা যায়। যথা— 'বৈয়াঘ্রপদ্য যাঁহার গোত্র, সাঙ্কৃতি যাঁহার প্রবর, সেই অপুত্রক ভীষ্মবর্ম্মাকে জল দিতেছি' (৭৪।২)। ব্যাঘ্রপাদ গোত্রকার ঋষি ছিলেন; তৎপুত্র সাঙ্কৃতি—ইনিও একজন গোত্রকার ঋষি এবং সাঙ্কৃতির পুত্র গুরু।

সুতরাং কুরুবংশীয়গণ যখন সাক্ষাৎ গোত্রকার ঋষির সন্তান এবং তদ্গোত্র বলিয়া পরিচিত, তখন তাঁহারা অবশ্যই জাতিতে ব্রাহ্মণ বলিয়া স্বীকার্য্য। তবে যে ভীষ্মের নামান্তে 'বর্ম্মা' শব্দ উক্ত হইয়াছে, তাহা তাঁহার ক্ষত্রিয়াচার অবলম্বন প্রযুক্তই বলিতে হইবে। প্রকৃত কথা এই যে, পুরাকালে ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয় সম্পূর্ণ ভিন্ন জাতি ছিলেন না। এক বংশে জন্মিয়া কেহ ব্রাহ্মণ ও কেহ ক্ষত্রিয় হইতেন। আর এই ক্ষত্রিয়দিগের মধ্যে যাঁহারা সর্ব্ববেদজ্ঞ হইতেন তাঁহারা ব্রহ্মক্ষত্রিয় এবং যাঁহারা তাহা না হইতেন তাঁহারা সামান্য ক্ষত্রিয় বলিয়া বিবেচিত হইতেন। ক্ষত্রবৃত্তিতে ব্রহ্মক্ষত্রিয়গণই উৎকৃষ্ট অধিকারী এবং সামান্য ক্ষত্রিয়েরা তাঁহাদের অধীনে থাকিয়া কার্য্য করিবেন, ইহাই শাস্ত্রের অভিপ্রায়। মহাভারতে লিখিত আছে—[সনৎকুমার বলিতেছেন] 'ব্রহ্মতেজ ক্ষত্রতেজের সহিত এবং ক্ষত্রতেজ ব্রহ্মতেজের সহিত মিলিত হইলে, ঐ মিলিত বল সমুদায় শত্রুনাশে সমর্থ হয়—যেমন অগ্নি ও মারুত পরস্পর সংযুক্ত হইলে ঐ মিলিত তেজ দাবদাহনে সমর্থ হয় (৭৫)। অতএব ক্ষত্রতেজসম্পন্ন ব্রাহ্মণ বা ব্রহ্মক্ষত্রিয়ই যে রাজ্যশাসনাদি করিবার প্রকৃত অধিকারী তাহা সহজেই বুঝা যায়। সর্ব্ববেদজ্ঞ বৈদ্যব্রাহ্মণই ক্ষত্রবৃত্তি অবলম্বন করিলে ব্রহ্মক্ষত্রিয় নামে পরিচিত হইতেন, যেহেতু ত্রিজত্ব প্রাপ্ত না হইলে ব্রাহ্মণের পক্ষে ক্ষত্রকার্য্য করা নিষিদ্ধ। বৈদ্য বা ব্রহ্মক্ষত্রিয় অভাবে সামান্য ক্ষত্রিয় রাজা হইতে পারেন, কিন্তু সে স্থলে তাঁহাকে বিদ্বান্-ব্রাহ্মণের উপদেশ লইয়া কার্য্য করা বিধি। সে যাহা হউক, চন্দ্রবংশীয় দুষ্মন্তপুত্র ভরতের পুত্র না হওয়ায় ভরদ্বাজই বৈদ্যত্ব হেতু ভরতের রাজ্য শাসন করিয়াছিলেন। ভরদ্বাজ চিকিৎসাশাস্ত্রে বিশেষ ব্যুৎপন্ন ছিলেন এবং তিনি কাশীর রাজা দিবোদাস ধন্বন্তরির চিকিৎসা শাস্ত্রের গুরু ছিলেন। এইরূপ ধন্বন্তরির বৈদ্যত্ব হেতু ইন্দ্র তাঁহাকে কাশীর রাজা করিয়াছিলেন।

এই বৈদ্যত্ব হেতুই সেনবংশীয় নৃপতিগণ বঙ্গে রাজত্ব করিয়াছিলেন। তাঁহারা শুধু দেশের শাসনকর্ত্তা ছিলেন না, ব্রাহ্মণসমাজেরও সমাজপতি ছিলেন। সমাজের উপর তাঁহাদের তীক্ষ্ণ দৃষ্টি ছিল এবং যথেষ্ট আধিপত্যও ছিল। ধ্রুবানন্দ মিশ্র তদীয় "গৌড় বংশাবলী" নামক সংস্কৃত গ্রন্থে মহারাজা আদিশূর (৺লক্ষ্মী নারায়ণ সেন) বঙ্গীয় সপ্ত শত হীন জাতিকে ব্রাহ্মণত্ব প্রদান করিয়াছিলেন বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। এড়ু মিশ্রও তাঁহার কারিকায় লিখিয়াছেন যে, মহারাজ বল্লাল সেন চণ্ডীর আরাধনা করিয়া গুণবান্ ব্রাহ্মণসকল সৃষ্টি করেন। এইরূপ বর্ণনা রূপক হইলেও তদ্বারা সমাজের উপর বৈদ্যরাজগণের সম্পূর্ণ আধিপত্য বিজ্ঞাপিত হইয়াছে। মহারাজ বল্লাল আদিশূর আনীত পঞ্চ ব্রাহ্মণবংশীয়গণকে ক্রিয়াহীনতার ফলে আচারভ্রষ্ট হইতে দেখিয়া সদাচারীদিগকে কৌলিন্য মর্য্যাদা দান করেন এবং কদাচারীদিগকে রাজদণ্ডে দণ্ডিত করেন। তিনি বঙ্গীয় ব্রাহ্মণগণের মধ্যে কতক ব্রাহ্মণকে অবৈধ দানগ্রহণদোষে দুষ্ট বলিয়া সমাজচ্যুত করেন, তাঁহারাই নিকৃষ্ট 'অগ্রদানী' আখ্যা প্রাপ্ত হইয়াছেন। এতদ্ভিন্ন, তিনি বরেন্দ্রদেশের কদাচারী আড়াই শত ব্রাহ্মণকে নির্ব্বাসিত করিয়াছিলেন। এই রাজগণ অব্রাহ্মণ হইলে কখনই ব্রাহ্মণসমাজের উপর এতাদৃশ আধিপত্য করিতে সক্ষম হইতেন না, কারণ হিন্দুধর্ম্মাবলম্বী ব্রাহ্মণেতর রাজার পক্ষে ব্রাহ্মণসমাজের উপর এরূপ প্রভুত্ব করা নিতান্ত অসম্ভব, ইহা সকলেই বুঝিতে পারেন। যে বৈদ্যরাজগণ ব্রাহ্মণদিগের মধ্যে ছোটকে বড় ও বড়কে ছোট করিয়াছিলেন, যাঁহারা উক্ত সমাজের দণ্ডমুণ্ডের কর্ত্তা ছিলেন, যাঁহাদের অব্রাহ্মণকে ব্রাহ্মণত্ব দান এবং গুণবান্ ব্রাহ্মণ সৃষ্টি করিবার অধিকার ও সামর্থ্য ছিল, তাঁহারা যে সাধারণ ব্রাহ্মণ অপেক্ষা অনেক উচ্চ তাহা কি আর বলিতে হইবে?

পাবনা জেলার অন্তর্গত মাধাই নগরে প্রাপ্ত একখানি তাম্রশাসনে মহারাজ লক্ষ্মণ সেন সম্বন্ধে এইরূপ লিখিত আছে—'গৌড়েশ্বর যশঃসিন্ধু লক্ষ্মণ সেন ব্রাহ্মণমণ্ডলীর একমাত্র চক্রবর্ত্তীস্বরূপ। * * * ধর্ম্ম, দ্বিজ ও ব্রাহ্মণ প্রভৃতির গৌরববর্দ্ধনকারী অর্জ্জুনতুল্য বীর শ্রীমল্লক্ষ্মণ সেন দেবশর্ম্মা সুব্রাহ্মণ' ইত্যাদি। মহারাজা বল্লাল সেন 'দানসাগর' নামক এক গ্রন্থ রচনা করেন। তাহার শেষে লিখিত আছে 'শ্রীমদ বল্লাল-সেন-দেববিরচিত দানসাগর সমাপ্ত' (৭৬)। এখানে নামন্তে 'দেব' শব্দ ব্যবহৃত হওয়ায় উহা গ্রন্থকারের ব্রাহ্মণত্বেরই জ্ঞাপক হইয়াছে। মহর্ষি যম ব্রাহ্মণের নামান্তে 'শর্ম্মা' এবং 'দেব' এই দুইটি শব্দ ব্যবহার করিবার বিধি দিয়াছেন। (৭৭) দেব শব্দ 'শর্ম্মা' 'বর্ম্মা' প্রভৃতির পূর্ব্বে উক্ত বা উহাদের বিশেষণ রূপে ব্যবহৃত হইলে আর্য্যবোধক হয় কিন্তু নামান্তে প্রযুক্ত হইলে ব্রাহ্মণত্ববোধক হইয়া থাকে। দেখা যায় পূর্ব্বে যে সকল ব্রাহ্মণ বেদহীন ছিলেন, তাঁহারা কেবল 'শর্ম্মা' বলিয়াই ব্রাহ্মণত্বের পরিচয় দিতেন (যেমন বিষ্ণু শর্ম্মা, চিরঞ্জীব শর্ম্মা ইত্যাদি) এবং বেদজ্ঞ বিপ্রেরাই 'দেবশর্ম্মা' ব্যবহার করিতেন। ইহার কারণ বেদ বলেন—বিদ্বান্‌গণই দেবতা' (৭৮)। যাঁহারা বিদ্বান্ নহেন তাঁহারা 'দেব' শব্দ ব্যবহারের যোগ্য নহেন। সুতরাং বুঝা যাইতেছে যে, বিদ্যাবিষয়ে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বলিয়া বৈদ্যগণই নামান্তে শুধু 'দেব' শব্দ ব্যবহার করিবার প্রকৃত অধিকারী এবং বিশিষ্ট বিদ্বান্ ব্রাহ্মণ ব্যতীত সাধারণ ব্রাহ্মণগণও উহার অধিকারী নহেন। বৈদ্যরাজগণ সকলেই সুবিদ্বান্ এবং ব্রাহ্মণাদি সর্ব্বসাধারণের নিকট দেবতার ন্যায় শ্রদ্ধাভাজন ছিলেন বলিয়া, তাঁহারা নামান্তে 'শর্ম্মা' অপেক্ষা 'দেব' শব্দের ব্যবহারই সমধিক উপযোগী ও গৌরবজনক বলিয়া মনে করিতেন। যেহেতু নামান্তে 'দেব' শব্দের ব্যবহার দ্বারা ব্রাহ্মণাদি হইতে উৎকৃষ্ট দেবতাস্বরূপ—এই অর্থই প্রকাশ পায় (যেমন ব্যাসদেব, কপিলদেব, শ্রীচৈতন্যদেব,

শ্রীরামকৃষ্ণ দেব ইত্যাদি)। আরও বল্লাল সেন 'দানসাগর' গ্রন্থে সেন-রাজগণকে 'শ্রুতিনিয়মগুরু' বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। 'শ্রুতি শব্দের অর্থ বেদ, 'শ্রুতিনিয়ম' অর্থে বেদবিহিত নিয়ম অর্থাৎ স্মৃতি শাস্ত্র এবং তাহার গুরু বা আদর্শ—শ্রুতিনিয়মগুরু। এই বাক্যে সেনরাজগণ তাৎকালিক হিন্দুসমাজে স্মৃত্যুক্ত ক্রিয়াকলাপের গুরু বা আদর্শ ছিলেন, ইহাই তিনি বর্ণনা করিয়াছেন। শুধু যে বঙ্গের সেনরাজারাই ঐরূপ ছিলেন এমন নয়, প্রাচীন কাল হইতেই বৈদ্যগণ চিকিৎসা বা রাজকার্য্যাদিতে ব্যাপৃত থাকিলেও সমাজ মধ্যে সদাচার এবং জ্ঞানে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ এবং আদর্শ ছিলেন, মহারাজ বল্লাল সেন উক্ত বাক্য দ্বারা তাহারই ইঙ্গিত করিয়াছেন।

১৭। বৈদ্যের পূজত্ব।

মহর্ষি চরক বলিয়াছেন—'বেদবাক্যে দেখা যায় যে, ব্রাহ্মণগণ ইন্দ্রকে, অগ্নিকে এবং অশ্বিনীকুমার-যুগলকে যেরূপ বহুলরূপে পূজা করিয়া থাকেন, সেরূপ আর কোন দেবতাকে করেন না। যাঁহাদের মৃত্যু নাই, জরা নাই এবং যাঁহারা বিশিষ্টরূপে বুদ্ধিসম্পন্ন এরূপ দেবতারা যখন তাঁহাদের অধিপতি ইন্দ্রের সহিত প্রযত্নভাবে অশ্বিনীকুমারদ্বয়কে (ভিষক্ বা বৈদ্য বলিয়াই) পূজা করিয়া থাকেন, তখন যাহাদিগকে মৃত্যু ব্যাধি ও জরার অধীন হইয়া প্রায়ই দুঃখভোগ করিতে হয়, এরূপ মানবগণ কেন না বৈদ্যগণকে যথাশক্তি পূজা করিবেন? প্রাণিগণকে প্রাণের নিমিত্ত যে লজ্জাশীল, বুদ্ধিমান্, যুক্ত (যোগী বা ঈশ্বরপরায়ণ), ত্রিজাতি ও শাস্ত্রপারগ বৈদ্যের শরণাপন্ন হইতে হয়, তিনি প্রাণিমাত্রেরই গুরুবৎ পূজ্য; যেহেতু তিনি প্রাণাচার্য্য বলিয়া কথিত হন। অতএব ইন্দ্র যেমন অশ্বিনীকুমারদ্বয়কে পূজা করিয়া থাকেন, পণ্ডিতগণও সেইরূপ ধীমান্ বৈদ্যদিগকে

প্রাণাচার্য্যকে অর্থাৎ বৈদ্যকে যথাশক্তি পূজা করিবেন' (৭৯)। এইরূপে চরক বৈদ্যকে ব্রাহ্মণাদি সকল জাতিরই পূজ্য বলিয়া ভেরী-নিনাদে ঘোষণা করিয়াছেন। যদি উহা শাস্ত্র, ইতিহাস ও তাৎকালিক সামাজিক রীতিবিরুদ্ধ হইত, তাহা হইলে চরক কখনই ঐরূপ উল্লেখ করিতে পারিতেন না। আর তাঁহার এই কথার প্রতিবাদ করিতেও কাহাকে দেখা যায় নাই।

বৈদ্য ধন্বন্তরির পূজার ব্যবস্থা শাস্ত্রে বিহিত হইয়াছে। শ্রীমদ্ভাগবতে উক্ত আছে—'তিনি সাক্ষাৎ বিষ্ণুর অংশাংশসম্ভূত ও ধন্বন্তরি নামে খ্যাত হইয়া আয়ুর্ব্বেদ প্রকাশ করিয়াছিলেন; যজ্ঞে তাঁহার ভাগ আছে' (৮০)। অতএব যাবৎ যজ্ঞানুষ্ঠান থাকিবে তাবৎ তাঁহার পূজা হইবে। ব্রহ্মাণ্ড পুরাণকার বলেন—'এই অমৃতসম্ভব ধন্বন্তরিকে দ্বিজগণ দেবতার ন্যায় মন্ত্র ব্রত, জপ, হোম ও চরু দ্বারা পূজা করিয়া থাকেন' (৮১)। মনু কহিয়াছেন—'দ্বিজগণ প্রতিদিন সংস্কৃত অগ্নিতে বৈশ্বদেবোদ্দেশ্যে পক্ক অন্ন দ্বারা বিধিপূর্ব্বক বক্ষ্যমান দেবগণের হোম করিবেন। * * * ধন্বন্তরিকে 'ধন্বন্তরয়ে স্বাহা' বলিয়া হোম করিবেন' (৮২)। ব্রাহ্মণাদি দ্বিজগণের পক্ষে বৈদ্য ধন্বন্তরির অর্চ্চনা না করিয়া আহার করা অবৈধ। তাঁহার পূজা না করিয়া যে জলগ্রহণ করে, সে নিন্দিত বা দ্বিজাপসদ। মহাত্মা ভীষ্ম শরশয্যায় শায়িত হইলে বৈদ্যগণ উপযাচক হইয়া তাঁহার চিকিৎসার্থ অগ্রসর হইয়াছিলেন। সে সম্বন্ধে মহাভারতকার বলিতেছেন—'শল্যোদ্ধারবিশারদ বৈদ্যগণ সমস্ত উপকরণ সমভিব্যাহারে ভীষ্ম সমীপে উপস্থিত হইলেন। তাঁহারা কার্য্যকুশল এবং সুশিক্ষিত। গঙ্গার নন্দন ভীষ্ম তাঁহাদিগকে দেখিয়া দুর্য্যোধনকে বলিলেন—চিকিৎসকদিগকে অর্চ্চনা পূর্ব্বক ধন দান করিয়া বিদায় করা হউক। আমি ক্ষত্রধর্ম্মে প্রশংসনীয় পরম গতি প্রাপ্ত হইয়াছি, এ অবস্থায় আমার বৈদ্যের প্রয়োজন নাই। [তথায় উপস্থিত

রাজন্যবর্গের প্রতি বলিলেন] হে ভূপালগণ! শবশর্য্যাগত ভীষ্মের এইরূপ ধর্ম্ম নয়। আমার শরীরে বিদ্ধ এই সকল শবের সহিত আমাকে (অর্থাৎ আমার মৃতদেহকে) দগ্ধ করিতে হইবে। তাঁহার এই বাক্য শ্রবণ করিয়া দুর্যোধন যথাযোগ্য অর্চ্চনা করিয়া বৈদ্যদিগকে বিদায় দিলেন'। মহাভারতের এই বাক্যে বৈদ্যদিগের পূজত্ব খ্যাপিত হইয়াছে। আয়ুর্ব্বেদীয় অথর্ব্বসংহিতায় লিখিত আছে—'রোগী বৈদ্যকে গুরুবৎ ভাবনা করিবে; বৈদ্যের নমস্কার কেহই গ্রহণ করিতে পারেন না, মুনিগণও যদি বৈদ্যের নমস্কার গ্রহণ করেন, তবে তাঁহাদিগকে দীর্ঘকাল রোগী হইয়া থাকিতে হয়' (৮৩)। এস্থলে ইহা লক্ষ্য করিবার বিষয় যে, দেহরক্ষার জন্য বৈদ্যের আজ্ঞা মুনিগণকেও অবনত মস্তকে পালন করিতে হয় এবং বৈদ্য সকলেরই নমস্য, বৈদ্যের নমস্য কেহই নহেন। মহর্ষি অগ্নিবেশ বলেন—'ভিষক্ সর্ব্বোত্তম ধর্ম্ম ইচ্ছা করিয়া রোগিগণকে স্বীয় সন্তানের ন্যায় সংরক্ষণ করিবেন' (১৪)। দেহধারী মনুষ্যমাত্রেই ব্যাধিগ্রস্ত বলিয়া বৈদ্যের সন্তানবৎ পালনীয়। এ কারণ বৈদ্য মনুষ্যমাত্রেরই পিতৃস্থানীয় এবং পূজ্য। ইদানীন্তন কালের ব্রহ্মজ্ঞ শঙ্করাচার্য্য বৈদ্যের পূজ্যত্ব স্বয়ং কীর্ত্তন করিয়াছেন। শঙ্করবিজয় কাব্যে লিখিত আছে—'দেহীদিগের এই শরীর পিতা হইতে উৎপন্ন হয় সত্য, কিন্তু তাহার রক্ষার ভার চিকিৎসকদিগের উপর থাকে। ভিষক্ বিনা শরীর নিষ্ফল (অর্থাৎ উহা রোগাদিপ্রযুক্ত অকর্ম্মণ্য হইয়া পড়ে)। অতএব এই ভিষক্ হরিরই তনুস্বরূপ (অর্থাৎ শরীরধারী বিষ্ণুস্বরূপ' (৮৪)। প্রাণিমাত্রেরই দেহরক্ষার ভার বৈদ্যের উপর অর্পিত বলিয়া বৈদ্য সকলের পিতৃস্থানীয়—সুতরাং পিতৃবৎ পূজ্য। যাহাহউক, যে বৈদ্যেরা এইরূপ বর্ণগুরু ব্রাহ্মণদিগেরও পিতৃস্থানীয়রূপে সম্মানিত হইতেন, যে বৈদ্যগণ 'তাতবৈদ্য' 'সর্ব্বতাত' প্রভৃতি নামে প্রসিদ্ধ ছিলেন, যাঁহারা সর্ব্বাপেক্ষা অধিক বিদ্বান্, নানা গুণে বিভূষিত ও বিশিষ্ট শক্তিসম্পন্ন

ছিলেন, যাঁহাদের উপর ব্রাহ্মণাদি চারিবর্ণকে শাসনাদি দ্বারা নিয়মিত করিবার ভার ছিল, যে বৈদ্য:কে মহর্ষি চরক প্রাণাচার্য্য ও প্রাণিমাত্রেরই গুরুবৎ পূজ্য বলিয়া খ্যাপন করিয়াছেন, ত্রিভুবনে যে বৈদ্যের নমস্য কেহই নাই বলিয়া শাস্ত্র নির্দ্দেশ করিতেছেন এবং যে বৈদ্যকে ব্রহ্মজ্ঞ শঙ্করাচার্য্যও দেহধারী বিষ্ণুস্বরূপে স্তব করিয়াছেন সেই বৈদ্যবংশীয়দিগকে অপসদ ব্রাহ্মণ বা অব্রাহ্মণ বিবেচনা করা অশেষ মূর্খতারই পরিচায়ক সন্দেহ নাই।

শাস্ত্রাদিতে বৈদ্যের প্রতি এইরূপ শ্রেষ্ঠ সম্মান বিহিত হইয়াছে দেখা যায়। সুতরাং বৈদ্যের অবমাননা যে সমূহ অমঙ্গলকর তাহা সকলেই বুঝিতে পারেন। এই নিমিত্ত চরক কহিয়াছেন—'জ্ঞানী ব্যক্তি দীর্ঘায়ু কামনা করিলে তিনি কখন বৈদ্যের অনিষ্ট চিন্তা করিবেন না, তাঁহার উপর পুরুষবাক্য প্রয়োগ করিবেন না এবং তাঁহার প্রতি অহিতাচরণ করিবেন না' (৮৫)। এই জন্যই শ্রীরামচন্দ্র ভরতকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন— হে ভ্রাতঃ! তুমি দেবগণকে, পিতৃগণকে, সেব্যগণকে, পিতৃসম গুরুজন-দিগকে, **পিতৃস্থানীয় বৈদ্যদিগকে** এবং ব্রাহ্মণগণকে **সর্ব্বতোভাবে মান্য** করিতেছ ত? (৬৭) তুমি বৃদ্ধগণকে, বালকগণকে ও মুখ্য বৈদ্যগণকে অর্থাদি দান দ্বারা, ভক্তি বা স্নেহ দ্বারা এবং মিষ্ট বাক্য দ্বারা পরিতুষ্ট করিতেছ ত?' (৩১) ইত্যাদি। আমরা যে কলিকবলিত ও অধঃপতিত, বৈদ্যকে অবজ্ঞা করা তাহার একটি প্রধান কারণ। যেখানে বৈদ্য, বৃদ্ধ, তপস্বী, গুরুজন এবং ব্রাহ্মণের অবমাননা হয়, ধর্ম্ম সেখানে কদাচ স্থান লাভ করিতে পারে না। মহাভারতে লিখিত আছে, কেকয়া-ধিপতি বনমধ্যে রাক্ষস কর্ত্তৃক গৃহীত হইলে তিনি রাক্ষসকে এইরূপ কহিয়া-ছিলেন—'আমি **বৈদ্য** বৃদ্ধ ও তপস্বিগণকে **অবজ্ঞা করি না**। × × × আমি দান দ্বারা বিদ্যা ও সত্য দ্বারা স্বর্গাদি লোক বাঞ্ছা করিয়া

থাকি এবং শুশ্রূষা দ্বারা গুরুগণের অনুগত হই; অতএব রাক্ষস হইতে আমার ভয় নাই' (৮৬)। এই সকল আলোচনা দ্বারা বুঝা যাইতেছে যে সমাজের মঙ্গল প্রার্থনীয় হইলে বৈদ্যকে অবজ্ঞা না করিয়া তাঁহাদের শাস্ত্রবিহিত সম্মান প্রদান করা সকলেরই অবশ্য কর্ত্তব্য।

দ্বিতীয় অধ্যায়।

বৈদ্যজাতির স্বরূপ।

১। বৈদ্যজাতির উৎপত্তি।

পুরাকালে ব্রাহ্মণদিগের মধ্যে যাঁহারা ব্রহ্মচর্য্যাশ্রমে বেদত্রয় সমাপনান্তে পুনরুপনীত হইয়া আয়ুর্ব্বেদ পর্য্যন্ত অধ্যয়ন দ্বারা সর্ব্ববিদ্যা সমাপ্ত করিতেন তাঁহারাই বৈদ্য আখ্যা প্রাপ্ত হইতেন এবং তাঁহাদেরই চিকিৎসা করিবার অধিকার জন্মিত, ইহা আমরা পূর্ব্বে বুঝিয়াছি। এই সর্ব্ববিদ্যাসম্পন্ন বৈদ্যব্রাহ্মণ-বংশীয়দিগকে ব্রাহ্মণসাধারণের অধিকারভুক্ত ষড়্‌বৃত্তির অতিরিক্ত চিকিৎসা প্রভৃতি কয়েকটি বিশেষ বৃত্তিতে অধিকার প্রদত্ত হওয়ায় এবং অপর ব্রাহ্মণের অধিকার ষড়্‌বৃত্তিতেই নিবদ্ধ করিয়া দেওয়ায়, বৈদ্যগণ দ্বিজাতি ব্রাহ্মণ হইতে বিশিষ্ট ত্রিজাতি বা বৈদ্যজাতিরূপে পরিগণিত হইয়াছিলেন। [যেহেতু বৃত্তি দ্বারা জাতি প্রবর্তিত হয় (৮৭) ব্যাস]। এইরূপে বৈদ্যব্রাহ্মণ ও যাজকব্রাহ্মণ ভেদে ব্রাহ্মণ দুই শ্রেণীতে বিভক্ত হয়। অতএব বৈদ্য ও ব্রাহ্মণ উভয়েই

জাতিতে ব্রাহ্মণ বলিয়া উভয়কে যেমন সম্পূর্ণ পৃথক্ জাতি বলা যায় না, তদ্রূপ উভয়ের মধ্যে বৃত্তিগত অধিকারভেদ হেতু উভয়কে সম্পুর্ণ এক জাতি বলাও সঙ্গত নহে। জাতি দ্বিবিধ—সংস্কারমূলক ও বৃত্তিমূলক। ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র এই চারিটি মাত্র সংস্কারমূলক জাতি; কিন্তু বৃত্তি-মূলক জাতি কর্ম্মভেদে বহু হইয়া থাকে। বৃত্তিমূলক জাতি গণনায় অর্থাৎ চিকিৎসাবৃত্তি হেতু বৈদ্যজাতি ব্রাহ্মণ হইতে বিভিন্ন কিন্তু সংস্কারমূলক জাতি গণনায় বৈদ্য ব্রাহ্মণজাতি হইতে অভিন্ন। ইহাই বৈদ্য ও ব্রাহ্মণের ভেদাভেদ সম্বন্ধ। যাহা হউক, এই জাতিবৈদ্যেরা চিরকালই সমাজ মধ্যে বিদ্বান্ জাতি বলিয়া পরিগণিত হইয়া আসিতেছেন। এক্ষণকার সেন্সাস্ রিপোর্টেও যে, সকল জাতি অপেক্ষা বৈদ্যদিগের অধিক বিদ্যাবত্তার পরিচয় পাওয়া যাইতেছে, তাহাতেও তাঁহাদিগকে সেই প্রাচীন কালের সর্ব্ববেদজ্ঞ ও সর্ব্বশাস্ত্রবিশারদ বৈদ্যব্রাহ্মণগণের বংশজাত বলিয়াই উপলব্ধি হয়।

বৈদ্যজাতির উৎপত্তি সম্বন্ধে কুলজীগ্রন্থে যেরূপ ইতিহাস পুরাণাদি হইতে ধৃত হইয়াছে তাহার সংক্ষিপ্ত বিবরণ এইরূপ। যথা—ত্রিলোকের প্রাণিসমূহ রোগগ্রস্ত ও বিপ্রগণ ব্যাধিপ্রপীড়িত হইয়া তপস্যায় অসমর্থ হইলে দেবতা, ঋষি ও মুনীন্দ্রগণের প্রার্থনায় শ্রীভগবান্ লোকসকলের প্রতি অনুকম্পার্থ পৃথিবীতে অমৃতাচার্য্যরূপে অংশতঃ অবতীর্ণ হন। কিন্তু তিনি অযোনিসম্ভব। কুশপুত্তলিকাতে ঋষিগণ কর্ত্তৃক বেদমন্ত্র উচ্চারণ দ্বারা অমৃতাচার্য্য উৎপন্ন হন। তৎপরে তিনি বেদবিদ্যা সমাপন পূর্ব্বক বৈদ্য হইয়া স্বর্গবৈদ্য অশ্বিনীকুমারের কন্যা বিবাহ করেন। ঐ স্ত্রীর গর্ভে পঞ্চবিংশতি কন্যা জন্মে, কোন পুত্র-সন্তান উৎপন্ন হয় নাই। উক্ত কন্যাদিগকে তিনি ভিন্ন ভিন্ন গোত্রীয় ব্রাহ্মণ-মুনিগণের সহিত বিবাহ দেন। ঐ সকল মুনিগণের ঔরসে

অমৃতাচার্য্য-কন্যাদিগের গর্ভে সেন, দাশ, গুপ্ত, ধর, কর, দত্ত, দেব, নন্দা, সোম, কুণ্ড, চন্দ্র, রক্ষিত প্রভৃতি নামক পুত্রসকল জাত হয়। অমৃতাচার্য্যের বরে এই দৌহিত্রগণ খ্যাতনামা মহাতেজস্বী বৈদ্য হন—ইহা 'চন্দ্রপ্রভা' নামক কুলপঞ্জীতে লিখিত হইয়াছে। ইঁহাদেরই বংশধরগণ জাতিবৈদ্য নামে পরিচিত। ইঁহারা অদ্যাবধি নামান্তে স্ব স্ব আদিপুরুষের নাম - সেন দাশ, গুপ্ত প্রভৃতি ব্যবহার করিয়া আসিতেছেন। এইরূপে বৈদ্য অমৃতাচার্য্য হইতে জাতি প্রবর্ত্তিত হওয়ায়, এই জাতির নাম বৈদ্য হইয়াছে।

দুঃখের বিষয় এই যে, বৈদ্য অমৃতাচার্য্য এবং তৎপ্রবর্ত্তিত বৈদ্যজাতিকে বৈশ্যরূপে দাঁড় করাইবার অভিপ্রায়ে এই আখ্যায়িকা মধ্যে বহু কৃত্রিমতা ও জাল বচন প্রবিষ্ট হইয়াছে। সেই হেতু বিশেষ প্রণিধান ব্যতীত ঐ আখ্যায়িকা হইতে সত্য বাহির করা দুঃসাধ্য হইয়া পড়িয়াছে। কিন্তু মিথ্যা যতই সত্যকে আবৃত করিবার চেষ্টা করুক না কেন, তাহাতে কিছু না কিছু ছিদ্র থাকিবেই থাকিবে। সত্য যখন আত্মপ্রকাশ করিতে ইচ্ছা করেন, তখন ঐ ছিদ্রের ভিতর দিয়াই তাহা করিয়া থাকেন। এ স্থলে 'অমৃতাচার্য্য' এই নামটী প্রধান ছিদ্রস্বরূপ। আচারাদি বিষয়ে অমৃতাচার্য্যের উপর বৈশ্যত্ব আরোপিত হইলেও, ঐ সমস্ত যে সম্পূর্ণ মিথ্যা তাহা তাঁহার নামটী হইতেই বুঝা যায়। 'আচার্য্য' এই নাম কখন ব্রাহ্মণ ভিন্ন অপর জাতির হইতেই পারে না। তাহার উপর অমৃতাচার্য্য অর্থাৎ বেদাচার্য্য (অমৃত অর্থে বেদ) এই সমুচ্চ গৌরবজনক নামধারণ হেতু ব্রাহ্মণ বা আচার্য্যগণের মধ্যে তাঁহার শ্রেষ্ঠত্বই বিজ্ঞাপিত হইয়াছে। তাঁহার বরে তাঁহার দৌহিত্রগণ মহাতেজস্বী বৈদ্য হন—এই বাক্য হইতে তাঁহাকে বিশিষ্ট শক্তিসম্পন্ন ব্রাহ্মণ বলিয়া স্বীকার করিতেই হয়। এতদ্ভিন্ন, বেদ প্রচার করা মুনিঋষিদিগের কার্য্য এবং ঋষিগণই প্রথমে আয়ুর্বেদ

প্রচার করেন। অমৃতাচার্য্যও সেই ঋষিগণোচিত সর্ব্ববেদশ্রেষ্ঠ আয়ুর্ব্বেদ প্রচার করিতে আসিয়াছিলেন এবং সেই হেতু তাঁহার নাম অমৃতাচার্য্য হইয়াছিল। অতএব এই মুনিশ্রেষ্ঠ অমৃতাচার্য্যের বৈশ্যবর্ণ হওয়া যে একেবারেই অসম্ভব তাহা সকলেই বুঝিতে পারেন। তিনি স্বর্গবৈদ্যের কন্যাকে বিবাহ করিয়াছিলেন,ইহাতে তাঁহার বৈদ্যত্ব সূচিত হইয়াছে। আর তিনি যে বাছিয়া বাছিয়া মুনিদিগের সহিত তাঁহার কন্যাগণের বিবাহ দিয়াছিলেন, তাহাতে তাঁহার শ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণ্যমর্য্যাদাই প্রকাশ পাইয়াছে। তদ্ভিন্ন তাঁহার কন্যাদিগের গর্ভজাত সন্তানগণের যাহাতে সাধারণ ব্রাহ্মণাদি হইতে জন্মতঃ উৎকর্ষপ্রাপ্তি ঘটে, সেজন্য তিনি মুনিগণের সহিত বিবাহ দেওয়াই উপযুক্ত মনে করিয়াছিলেন। অতএব সেই মুনিগণের ঔরসে এবং বৈদ্যব্রাহ্মণ অমৃতাচার্য্য-কন্যাদিগের গর্ভে সেন, দাশ, গুপ্ত, দত্ত প্রভৃতি পুত্রসকল শ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণরূপেই জন্মিয়াছিলেন সন্দেহ নাই। যাহা হউক, এই আখ্যায়িকা হইতে জানা গেল যে, শ্রীভগবান্ অমৃতাচার্য্য রূপে অবতীর্ণ হইয়া ব্রাহ্মণজাতির মধ্য হইতে কতকগুলি বিশিষ্ট বংশের উপর চিকিৎসার ভার দিয়া একটী স্বতন্ত্র জাতি প্রবর্ত্তিত করিয়াছেন। কিন্তু এই উপাখ্যান মধ্যে বৈদ্যের বৈশ্যত্বপ্রতিপাদক বহু কৃত্রিম বাক্য প্রবিষ্ট হইয়াছে। উহা যে বৈদ্যবিদ্বেষিগণের রচিত তাহাতে আর সন্দেহ নাই। কারণ তদনুসারে যদি সেন, দাশ, গুপ্ত প্রভৃতি উপাধিধারী মাত্রেই বৈশ্যবর্ণায় হইতেন, তাহা হইলে ভারতে ব্রাহ্মণদিগের মধ্যে কখনই ঐ সকল উপাধি বহু পরিমাণে দৃষ্ট হইত না।

আবার এই উপাখ্যানটি স্কন্দ পুরাণের নামে প্রচলিত হইলেও বস্তুতঃ উহা এক্ষণে স্কন্দপুরাণে খুঁজিয়া পাওয়া যায় না এবং প্রকৃত স্কন্দপুরাণও বোধ হয় এক্ষণে বিদ্যমান নাই। সুতরাং বঙ্গীয় বৈদ্যদিগকে ব্রাহ্মণ হইতে পৃথক্ এবং বৈশ্যবর্ণরূপে প্রতিপন্ন করিবার অভিপ্রায়ে তাহাদের সেন, দাশ

গুপ্ত প্রভৃতি উপাধি অবলম্বনে ঐ উপাখ্যান রচিত হইয়াছে এবং উহার প্রামাণিকতার জন্য স্কন্দপুরাণের দোহাই দেওয়া হইয়াছে—এরূপ অনুমান অসঙ্গত বলিয়া মনে হয় না। যাহাই হউক, এই উপাখ্যানে প্রধানতঃ বৈদ্যদিগের উপর বৈশ্যত্ব আরোপ করিবার প্রয়াস দৃষ্ট হইলেও, কার্য্যতঃ তাঁহাদের ব্রাহ্মণত্বই সুসিদ্ধ হইয়াছে, ইহা উপরোক্ত যুক্তিসমূহ দ্বারা প্রতিপাদিত হইল।

যেরূপেই হউক, বৈদ্যনামক বিশিষ্ট জাতির সৃষ্টি হইলে ব্রাহ্মণাদি সকল জাতির চিকিৎসাধিকার রহিত হইয়াছিল। ক্ষত্রিয় ও বৈশ্যগণ সামান্যতঃ চিকিৎসা করিতে পারিলেও কদাচ চিকিৎসার প্রকৃত বা সম্যক্ অধিকারী হইতে পারিতেন না। তাঁহারা বিশিষ্ট বিদ্যাবত্তার অভাবে এবং বিদ্যামূলক উপাধিগ্রহণের অধিকার না থাকা প্রযুক্ত বৈদ্য নাম ধারণ করিতে পারিতেন না এবং সেই হেতু তাঁহাদের বংশাবলীও জাতিবৈদ্য নামে অভিহিত হইত না। জাতিবৈদ্য ভিন্ন ব্রাহ্মণাদি কোন জাতিই যে চিকিৎসা বৃত্তির অধিকারী নহেন তাহা শাস্ত্র হইতেই জানা যায়। মন্বাদি ধর্ম্মশাস্ত্রে ব্রাহ্মণাদি চারিবর্ণের পক্ষে যে যে বৃত্তি নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে, তন্মধ্যে চিকিৎসাবৃত্তির উল্লেখ নাই; সুতরাং উহা তাঁহাদের কাহারও স্বকর্ম্ম নহে। উহা বিশিষ্ট অধিকারীর বৃত্তি এবং ব্রাহ্মণাদি সাধারণের অধিকার বহির্ভূত বলিয়াই তাঁহাদের বৃত্তিমধ্যে চিকিৎসাকে গণনা করা হয় নাই। পুরাকালে ব্রাহ্মণদিগের মধ্যে ত্রিজ বৈদ্যগণই যথাবিধি চিকিৎসা করিবার অধিকারী ছিলেন ইহা আমরা পূর্ব্বে দেখাইয়াছি। • সুতরাং জন্মগত অধিকারে চিকিৎসা কেবল জাতিবৈদ্যের স্বকর্ম্ম এবং উহা তাঁহাদের সম্বন্ধেই পুণ্যতম বৃত্তি। আর ব্রাহ্মণাদি জাতিসকলের পক্ষে উহা পরধর্ম্ম-বিশেষ। মনু বলেন—'পরধর্ম্ম দ্বারা জীবিকা নির্ব্বাহ করিলে সদ্যই জাতি হইতে ভ্রষ্ট হয়' (৮৮)। অত্রিসংহিতায় লিখিত আছে—'যে রাজা

স্বকর্ম্মত্যাগী ও পরধর্ম্মনিরত ব্যক্তিকে শাস্তি প্রদান করেন, তিনি দেহান্তে স্বর্গলাভ করেন' (৮৯)। এ কারণ বৈদ্য ভিন্ন অপর ব্রাহ্মণ চিকিৎসাবৃত্তি দ্বারা জীবিকা নির্ব্বাহ করিলে, স্বকর্ম্মত্যাগ ও পরধর্ম্ম অবলম্বনরূপ দোষ হেতু তাঁহাকে জাতিভ্রষ্ট ও দণ্ডার্হ হইতে হয়। এ বিষয়ে শাস্ত্রে এইরূপ অনুশাসন আছে,যথা—"যে দ্বিজ অর্থলোভ হেতু স্বকর্ম্ম পরিত্যাগ পূর্ব্বক চিকিৎসায় প্রবৃত্ত হন, তিনি শীঘ্র পতিত হইয়া থাকেন (৯০)। আরও অগ্নিপুরাণে স্পষ্ট লিখিত আছে—'ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র এই জাতিসকল বৈদ্যবৃত্তি পরিগ্রহ করিলে তাহাদের জাতি-নাশ ও ধ্বংস প্রাপ্তি হয়' (৯১)।

এক্ষণে কি কারণে চিকিৎসা ব্রাহ্মণাদি কোন বর্ণের ধর্ম্ম্যবৃত্তিরূপে নির্দ্ধারিত হয় নাই এবং চিকিৎসা করিলে কেনই বা তাহাদের জাতিনাশ ও ধ্বংশ প্রাপ্তি হয় তাহা একবার ভাবিয়া দেখা আবশ্যক। প্রথমতঃ, যখন দেখা যাইতেছে যে চিকিৎসা ভিন্ন সভ্য জাতির এক দণ্ড চলে না, তখন উহা যে নগণ্য বলিয়া ব্রাহ্মণাদি কোন বর্ণের বৃত্তিরূপে নির্দ্দিষ্ট হয় নাই, এ কথা কেহই বলিতে পারেন না। দ্বিতীয়তঃ, মনুসংহিতায় উক্ত হইয়াছে যে, উচ্চবর্ণের লোক আপৎকালে নিম্নবর্ণের বৃত্তি অবলম্বন করিতে পারিবেন, কিন্তু নিম্নবর্ণের লোক কদাচ উচ্চবর্ণের বৃত্তি গ্রহণ করিতে পারিবেন না—করিলে তাঁহাকে দণ্ডার্হ হইতে হইবে (১০ম অঃ ৯৫।৯৬ শ্লোক দ্রষ্টব্য)। এতদনুসারে যদি চিকিৎসা ব্রাহ্মণের পক্ষে নিম্নাধিকারীর বৃত্তি হইত, তাহা হইলে উহা নিশ্চয়ই তাহাদের আপৎকালীয় বৃত্তি মধ্যে গণনীয় হইত। কিন্তু তাহা কোন শাস্ত্রেই বিহিত হয় নাই। বরং তদ্বিপরীতে যখন মন্বাদি ঋষিগণ উচ্চাধিকারীর বৃত্তি অবলম্বন অতীব নিষিদ্ধ বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন এবং যখন সকল শাস্ত্রেই চিকিৎসক বিপ্র নিন্দিত বলিয়া

উক্ত হইয়াছেন (অপর জাতির ত কথাই নাই) তখন চিকিৎসা যে সর্ব্বাপেক্ষা উচ্চাধিকারীর বৃত্তি যুক্তি অনুসারে তাহাই প্রতিপন্ন হয়। তৃতীয়তঃ, মনু চিকিৎসাকে শ্রেষ্ঠ দ্বিজাতিগণের বৃত্তি বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন এবং উহা যে সর্ব্ববেদজ্ঞ ও সর্ব্বশাস্ত্রবিশারদ বিশিষ্ট বিদ্বান্‌দিগেরই অধিকারভুক্ত পুণ্যতম বৃত্তি তাহা আমরা পূর্ব্বে বিশেষরূপে সপ্রমাণ করিয়াছি। শাস্ত্র যাহাকে পুণ্যতম ও সর্ব্ববেদজ্ঞ মুখ্য ব্রাহ্মণের বৃত্তি বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন, তাহাকে নিকৃষ্ট বৃত্তি বলিয়া অপসদত্বের কারণ বলা নিতান্ত অনভিজ্ঞতারই পরিচায়ক অথবা তাহা গায়ের জোর ভিন্ন আর কিছুই নহে। বস্তুতঃ চিকিৎসা সর্ব্বাপেক্ষা উচ্চাধিকারীর বৃত্তি এবং বৈদ্যদিগের জন্যই নির্দ্দিষ্ট বলিয়া অপর ব্রাহ্মণ উহাতে অনধিকারী। সুতরাং তাঁহারা অনধিকারে চিকিৎসাবৃত্তি অবলম্বন করিলে চিকিৎসার অপব্যবহার ও মর্য্যাদাহানি ঘটে এবং তন্নিমিত্তই তাঁহারা গুরুতর অপরাধভাজন হইয়া অপসদ, পংক্তিদূষক—এমন কি ঘৃণিত বলিয়া বিবেচিত হন। শাস্ত্রে এইরূপ লিখিত আছে যে. দেবগণ ও পিতৃগণোদ্দেশ্যে প্রদত্ত বস্তু চিকিৎসা-ব্যবসায়ী বিপ্রকে দেওয়া হইলে, তাহা দেবতা ও পিতৃগণের নিকট অমেধ্যরূপে অগ্রাহ্য হয় (মনু); বৈদ্যবৃত্তিক বিপ্র বৃহস্পতিতুল্য জ্ঞানী হইলেও পূজ্য নহেন (অত্রি); তিনি শ্রাদ্ধে, দানে ও সমস্ত হব্যকব্যে বর্জ্জনীয় (মনু ও বিষ্ণু)। এমন কি চিকিৎসক ব্রাহ্মণকে দর্শন করিলেও অশুচি হইতে হয়, ইহা মনু কহিয়াছেন। পক্ষান্তরে, কবিচন্দ্রধৃত আয়ুর্ব্বেদ-সংগ্রহের নিম্নলিখিত বচনে ব্রাহ্মণাদি হইতে বৈদ্যজাতির বিশিষ্টতা এবং একমাত্র জাতিবৈদ্যেরই চিকিৎসাধিকার স্পষ্টতঃ ব্যক্ত আছে। যথা—'বৈদ্য ভিন্ন অপর জাতির পাক করা ঔষধ সকল জাতিরই অস্পৃশ্য; ইহা জানিয়া বৈদ্যকেই পাকে নিয়োগ করিবে। ভ্রমবশতঃ ব্রাহ্মণাদি দ্বিজাতি কর্ত্তৃক পাক করা ঔষধ সেবন করিলে শূদ্রকে

প্রায়শ্চিত্তার্হ এবং দ্বিজাতিকে জাতিভ্রষ্ট হইতে হয়' (৯২)। এই নিমিত্তই এখনও ব্রাহ্মণাদি জাতির মধ্যে এরূপ সংস্কারবিশিষ্ট বৃদ্ধ ও বৃদ্ধাকে দেখিতে পাওয়া যায়, যাঁহারা জাতিবৈদ্যের ঔষধ সেবন না করিয়া মৃত্যু হইলে অগতি হইবার ভয়ে শঙ্কিত হন এবং অন্য জাতির ঔষধ সেবন করিলে জাতি যাইবে বলিয়া বিবেচনা করেন। এই সকল প্রমাণ দ্বারা স্পষ্ট বুঝা গেল যে, একমাত্র জাতিবৈদ্য ভিন্ন চিকিৎসা করিবার অধিকার ব্রাহ্মণাদি কোন জাতিরই নাই।

কেহ কেহ বলেন—সেন, গুপ্ত, দাশ, ধর, কর, দত্ত প্রভৃতি উপাধিগুলি ব্রাহ্মণোচিত উপাধি নহে। সুতরাং যখন বৈদ্যেরা ব্রাহ্মণোচিত মুখোপাধ্যায়, বন্দ্যোপাধ্যায়, ভট্টাচার্য্য প্রভৃতির পরিবর্ত্তে ঐ সকল উপাধি দ্বারা বিভূষিত তখন তাঁহারা কখনই ব্রাহ্মণ হইতে পারেন না। এই আপত্তি সমীচিন নহে, পরন্তু নিতান্ত অকিঞ্চিৎকর। সকলেই জানেন যে, উক্ত উপাধিগুলি বারেন্দ্র শ্রেণীর ব্রাহ্মণদিগের মধ্যেও বিদ্যমান নাই; তাঁহারা লাহিড়ী, সান্ন্যাল, মিশ্র, ভাদুড়ী প্রভৃতি উপাধিযুক্ত বলিয়া কি তাঁহাদিগকে অব্রাহ্মণ বলিতে হইবে? না, পশ্চিমাঞ্চলের দোবে. পাঁড়ে, তেওয়ারী, চোবে প্রভৃতি উপাধিধারী ব্রাহ্মণেরা অব্রাহ্মণ হইবেন? মহারাজ আদিশূর কর্ত্তৃক আনীত পঞ্চ ব্রাহ্মণবংশীয়গণ ত এদেশে আসিয়াই মুখোপাধ্যায়, চট্টোপাধ্যায় প্রভৃতি উপাধি প্রাপ্ত হইয়াছেন, তাঁহাদের আদি উপাধি যাঁহারা কান্যকুব্জে অদ্যাপি ব্যবহার করিয়া আসিতেছেন তাঁহাদিগকে কি অব্রাহ্মণ বলিয়া জ্ঞান করিতে হইবে? এই ভারতে নানা স্থানে ব্রাহ্মণদিগের বহুবিধ উপাধি দৃষ্ট হয়। সে সকল না জানিয়া কয়েকটি মাত্র উপাধিকে ব্রাহ্মণত্বের একমাত্র পরিচায়ক বলিয়া স্থির করা অজ্ঞতা ভিন্ন আর কিছুই নহে। বিশেষতঃ মুখোপাধ্যায় প্রভৃতি যখন ব্রাহ্মণের শাস্ত্রোক্ত উপাধি নহে, তখন ঐ সকল উপাধি ধারণ না করিলে ব্রাহ্মণ বলিয়া গণ্য হইবে না, এ কথার

কোন মূল্য নাই। পক্ষান্তরে সেন, দাশ, ধর, কর, দত্ত নন্দী, চন্দ্র প্রভৃতি উপাধিগুলি ভারতের ব্রাহ্মণদিগের মধ্যে প্রায় সর্ব্ব স্থলেই বিদ্যমান আছে। উদাহরণ-স্বরূপে গয়াধামের বালগোবিন্দ সেনশর্ম্মা, অমৃতলাল সেনশর্ম্মা, শঙ্করলাল গুপ্তশর্ম্মা প্রভৃতি বর্ত্তমান তীর্থ-গুরুগণের নামোল্লেখ করা যাইতে পারে। জানি না বঙ্গদেশে এমন ব্রাহ্মণ কে আছেন যাঁহার ঐ সকল উপাধিযুক্ত ব্রাহ্মণগণের পাদপূজা না করিয়া থাকেন। সেনশর্ম্মা, গুপ্তশর্ম্মা, দত্তশর্ম্মা প্রভৃতি উপাধি উৎকলে ব্রাহ্মণদিগের মধ্যে বিদ্যমান আছে। মেদিনীপুরেও দাশোপাধিক * ব্রাহ্মণের সত্ত্বা পরিলক্ষিত হয়। এমন কি কলিকাতার নিকটবর্ত্তী মজিলপুর গ্রামেও এখনও কয়েক ঘর ধরোপাধিক বৈদিক ব্রাহ্মণ আছেন, তাঁহারা আবার সাধারণের নিকট বৈদ্য নামে পরিচিত। এইরূপ দাক্ষিণাত্য বৈদিক ব্রাহ্মণদের মধ্যেও ধর, কর, দত্ত, নন্দী প্রভৃতি উপাধি দেখা যায়। সংস্কৃত কলেজের ভূতপূর্ব্ব প্রিন্সিপাল মহামহোপাধ্যায় আশুতোষ শাস্ত্রী মহাশয়ের ও অন্যান্য বৈদিক ব্রাহ্মণের উপাধি 'ধর'। প্রসিদ্ধ 'কুলীনসর্ব্বস্ব' নামক নাটকপ্রণেতা ৺রামনারায়ণ তর্করত্নের পূর্ব্ব পুরুষ 'জহ্নু কর' ইত্যাদি (৺লালমোহন বিদ্যানিধি কৃত 'সম্বন্ধ নির্ণয়' দেখ)। বস্তুতঃ ইঁহাদের ভট্টাচার্য্য, চক্রবর্ত্তী প্রভৃতি উপাধির আবরণ উন্মোচন করিলে বৈদ্যসমাজে ব্যবহৃত প্রায় সমস্ত উপাধিই দেখিতে

---

* তালব্য শকারান্ত 'দাশ' পদবী ব্রাহ্মণত্ববাচক। ব্রাহ্মণের এই দাশ উপাধি অতি প্রাচীন। পাণিনি মুনি "দাশ—গোঘ্নৌ সম্প্রদানে" এই সূত্র করিয়া "দাশন্তি প্রযচ্ছন্তি অস্মৈ ইতি দাশঃ" এই বুৎপত্তিতে যে ব্রাহ্মণ দান করিবার উপযুক্ত পাত্র তিনিই দাশ এই অর্থ প্রকাশ করিয়াছেন। ক্রমদীশ্বরও তাঁহার সংক্ষিপ্তসার ব্যাকরণে "তালব্যান্তে দাশৃ দানে দাশন্তি অস্মৈ ইতি দাশঃ" এইরূপ ব্যুৎপত্তি করিয়া "দাশো বিপ্রঃ" বলিয়াছেন। দন্ত্য সকারান্ত 'দাস' অর্থে ভৃত্য—কৈবর্ত্ত্য।

পাওয়া যায়। আরও, বিকানীর একটি হিন্দুপ্রধান রাজ্য। তথাকার চন্দ্র উপাধিধারী একটি ব্রাহ্মণবংশের তালিকা এস্থলে উদ্ধৃত হইল। যথা—'ধর্ম্মদাসজী চন্দ্রশর্ম্মা, তৎপুত্র চৈলরামজী চন্দ্রশর্ম্মা, তৎপুত্র ধীরমলজী চন্দ্রশর্ম্মা, তৎপুত্র শ্রীলালজী চন্দ্রশর্ম্মা, তৎপুত্র শ্রীঘনশ্যাম চন্দ্রশর্ম্মা বিদ্যাসাগর—স্বর্গীয় মহামহোপাধ্যায় বিজয়রত্ন সেন কবিরাজ মহাশয়ের ছাত্র ছিলেন এবং ১৭৯নং হ্যারিসন রোডে ঔষধালয় স্থাপন করিয়া চিকিৎসা করিতেন।' অতএব তিনি যে চন্দ্রশর্ম্মা উপাধিধারী বৈদ্যশ্রেণীর ব্রাহ্মণ তাহাতে আর সংশয় নাই।

কুলগ্রন্থলিখিত বৈদ্যজাতির উৎপত্তি অনুসারে যদি সেন, দাশ, গুপ্ত প্রভৃতি উপাধিগুলি বৈদ্যদিগের নিজস্ব হয়, তাহা হইলে দাক্ষিণাত্য, উৎকল এবং পশ্চিমাঞ্চলের ব্রাহ্মণগণের মধ্যে যাঁহাদের ঐ সকল উপাধি দেখা যায় তাঁহাদের সকলকেই বৈদ্য বলিয়া সিদ্ধান্ত করিতে হয়। অথচ দেখা যাইতেছে যে, তাঁহারা কেহই আপনাদিগকে বৈদ্যব্রাহ্মণ বলিয়া পরিচয় দেন না। পক্ষান্তরে, বৈদ্যজাতির ইতিহাস পর্য্যালোচনা করিলে ঐ সকল ব্রাহ্মণ যে বৈদ্যব্রাহ্মণ নহেন তাহা নিশ্চয় বলা যায় না। সেই ইতিহাস নিম্নে সংক্ষেপে বিবৃত হইতেছে। ভারতের উত্তর-পশ্চিম সীমায় 'অম্বষ্ঠ' নামে একটি প্রদেশ ছিল (এ বিষয় পরে বিবৃত হইবে)। উহাই বৈদ্যব্রাহ্মণদিগের আদি বাসস্থান ছিল। বোধ হয় বৈদ্য বা চিকিৎসক ব্রাহ্মণদিগের প্রাধান্য হেতুই ঐ দেশের নাম অম্বষ্ঠ হইয়াছিল, কারণ অম্বষ্ঠ শব্দে চিকিৎসক বুঝাইয়া থাকে (অম্বষ্ঠ নামক প্রদেশ সম্বন্ধে এবং অম্বষ্ঠ শব্দের অর্থ পরে দ্রষ্টব্য)। অম্বষ্ঠদেশীয় বৈদ্যগণ দুই শ্রেণীতে বিভক্ত হইয়াছিলেন। বৈদ্যকুলপ্রদীপ মহাত্মা দুর্জ্জয় দাশ ৭।৮ শত বৎসর পূর্ব্বে তাঁহার রচিত কুলপঞ্জিকাতে লিখিয়াছেন—"অম্বষ্ঠগণ দ্বিবিধ বলিয়া উক্ত; যথা—সারস্বত এবং সৈন্ধব। যাঁহারা সিন্ধুতীর

সমাশ্রিত তাঁহারা সৈন্ধব বলিয়া কীর্ত্তিত হন' (৯৩)। বস্তুতঃ পঞ্জাব ও যুক্ত প্রদেশীয় সারস্বত ব্রাহ্মণগণের মধ্যে অদ্যাপিও বৈদ্যোপাধিক ব্রাহ্মণগণের অস্তিত্ব এবং তাঁহাদের প্রাধান্য দেখা যায়। তাঁহাদের মধ্যে দাশ, ধর প্রভৃতি উপাধিও আছে।

এই সারস্বত এবং সৈন্ধব নামক অম্বষ্ঠ ব্রাহ্মণগণ চিকিৎসাদি উপলক্ষে ভারতের সর্ব্বত্র পরিব্যাপ্ত হইয়া পড়েন। তাঁহারা দুই দলে বিভক্ত হইয়া এক দল আর্য্যাবর্ত্তের পথে এবং অপর দল দাক্ষিণাত্যের পথে অগ্রসর হইয়া নানা স্থানে উপনিবেশ স্থাপন করেন। তন্মধ্যে যাঁহারা আর্য্যাবর্ত্তের ভিতর দিয়া আসিতেছিলেন, তাঁহারা কান্যকুব্জ, কাশী, মগধ ও মিথিলা হইয়া রাঢ়ে পশ্চিমভাগে আসিয়া গৃহপ্রতিষ্ঠা করেন। এজন্য পঞ্চকোট সমাজ এবং রাঢ়দেশ বঙ্গে বৈদ্যদিগের আদি স্থান বলিয়া উক্ত। আর যাহারা দাক্ষিণাত্যের ভিতর দিয়া পূর্ব্ব দিকে আসিতেছিলেন, তাঁহাদের মধ্যে কেহ কর্ণাটে, কেহ রাজমাহেন্দ্রীতে ও কেহ উৎকলে থাকিয়া যান এবং কেহ বা বঙ্গদেশে প্রবেশ করিয়া বিক্রমপুর ও রামপাল নগর স্থাপন পূর্ব্বক বৈদ্যরাজত্বের ভিত্তি স্থাপন করেন। বৈদ্যকুলপঞ্জিকাতে লিখিত আছে—'মহাবল অম্বষ্ঠগণ আর্য্যাবর্ত্ত হইতে (দাক্ষিণাত্যের ভিতর দিয়া) বঙ্গদেশে আসিয়া স্বীয় আধিপত্য বিস্তার করিয়াছিলেন, (৯৪)। সুপ্রসিদ্ধ ঐতিহাসিক ভিন্‌সেণ্ট্‌ স্মিথও সেনরাজগণকে দাক্ষিণাত্য হইতে সমাগত ব্রাহ্মণ বলিয়া সিদ্ধান্ত করিয়াছেন, ইহা আমরা পূর্ব্বে উল্লেখ করিয়াছি। এইরূপে অম্বষ্ঠগণ যে যে স্থানে উপনিবেশ স্থাপন করিয়াছিলেন, সর্ব্বত্রই তাঁহারা তত্তৎস্থানীয় ব্রাহ্মণদিগের সহিত মিশিয়া গিয়াছেন। সেজন্য তাঁহারা আর বৈদ্যব্রাহ্মণ বলিয়া পরিচয় না দিলেও, তাঁহাদের উপাধি, বৃত্তি ও গোত্রপ্রবরাদি হইতে তাঁহাদিগকে বৈদ্যশ্রেণীর ব্রাহ্মণ বলিয়া জানিতে পারা যায়। কিন্তু যাঁহারা বঙ্গদেশে আসিয়াছিলেন তাঁহারা তাৎকালিক

বঙ্গের আদিম নিবাসী ব্রাহ্মণদিগকে বৌদ্ধপ্রভাববশতঃ আচারভ্রষ্ট দেখিয়া তাঁহাদের সহিত না মিশিয়া আপনাদের স্বাতন্ত্র্য রক্ষা করিয়াছিলেন এবং সেই হেতু তাঁহারা আপনাদিগকে বৈদ্য বলিয়া পরিচয় প্রদান করিতেন। 'বৈদ্য' বলিলে বিশিষ্ট ব্রাহ্মণ বুঝায় বলিয়াও তাঁহারা 'ব্রাহ্মণ' অপেক্ষা বৈদ্য নামে পরিচয় দেওয়া অধিকতর গৌরবজনক মনে করিতেন। কিন্তু কালের কুটিল গতিতে তাঁহাদেব এই গৌরবজনক 'বৈদ্য' উপাধিই অগৌরবের হেতু এবং সাধারণ ব্রাহ্মণসম্প্রদায় হইতে স্বাতন্ত্র্য বক্ষাই তাঁহাদের ব্রাহ্মণ হইতে পৃথক্—সুতরাং অব্রাহ্মণরূপে গণ্য হইবার কারণ হইয়া পড়িয়াছে।

এই ইতিহাস হইতে বুঝা যাইতেছে যে, অম্বষ্ঠদেশীয় বৈদ্যব্রাহ্মণদিগের একটি শাখা দাক্ষিণাত্যের ভিতর দিয়া আসিতে আসিতে ক্রমে পূর্ব্ব বঙ্গে আসিয়া উপস্থিত হন। আর যাঁহারা দাক্ষিণাত্যে রহিয়া গেলেন, তাঁহারা তথাকার ব্রাহ্মণদিগের সহিত মিশিয়া গেলেন। এই নিমিত্ত দাক্ষিণাত্য বৈদিক ব্রাহ্মণদিগের মধ্যে বৈদ্যব্রাহ্মণের অস্তিত্ব স্বীকার করিতে হয়। পরে যে সকল বৈদিক ব্রাহ্মণ দাক্ষিণাত্য হইতে এদেশে আগমন করেন তাঁহাদের মধ্যেও যখন বৈদ্যসাধারণ ধর, কর প্রভৃতি উপাধি পরিলক্ষিত হয়, তখন ঐ সকল বৈদিক ব্রাহ্মণকে বৈদ্যব্রাহ্মণদিগের সহিত এক জ্ঞান করা অসঙ্গত বলিয়া মনে হয় না। পরন্তু বৈদ্য ও বৈদিক ব্রাহ্মণ ব্রাহ্মণ-জাতির একই শাখা বলিয়া মনে হয়। কারণ আড়াই শত বৎসর পূর্ব্বে ভরত মল্লিক উড়িষ্যাবাসী বৈদিক ব্রাহ্মণদের সহিত বৈদ্যদিগের বৈবাহিক আদান প্রদান চলিত বলিয়া 'চন্দ্রপ্রভা'য় লিখিয়া গিয়াছেন। উভয়ে এক শ্রেণীর ব্রাহ্মণ না হইলে এরূপ হইত না। উপাধির সাদৃশ্য দেখিয়া এবং কুলপঞ্জীর সিদ্ধান্ত অনুসারে ইহাই বলিতে হয় যে, বৈদ্যব্রাহ্মণগণই আপন বিশেষত্ব ত্যাগ করিয়া বৈদিক ব্রাহ্মণ নামে অভিহিত।

এখনও ভারতের প্রায় সর্ব্বস্থানে ব্রাহ্মণ সম্প্রদায়ের মধ্যে ঐ সকল উপাধি দৃষ্ট হয় বলিয়া কেহ কেহ সিদ্ধান্ত করেন যে, সেন, দাশ, গুপ্ত, ধর, কর, দত্ত, দেব, নন্দী, সোম, কুণ্ড, রক্ষিত চন্দ্র প্রভৃতি উপাধিগুলিই ব্রাহ্মণ-সাধারণের মৌলিক উপাধি, উহা বৈদ্যব্রাহ্মণদিগের নিজস্ব নহে। প্রথমে যখন ব্রাহ্মণগণ ভারতের উত্তরপশ্চিম সীমায় বাস করিতেন, তখন তাঁহারা ঐ সকল উপাধিতেই ভূষিত ছিলেন। পরে তাঁহাদের মধ্যে যাঁহারা ভারতের নানা স্থানে আসিয়া বসবাস করেন তাঁহারা স্থানভেদে, অবস্থাভেদে এবং গুণকর্ম্মভেদে নূতন নূতন উপাধি গ্রহণ করায় তাঁহাদের মৌলিক উপাধিগুলি চাপা পড়িয়া গিয়াছে। ইঁহাদের এই সিদ্ধান্তও অযৌক্তিক বলিয়া বোধ হয় না। জিজ্ঞাস্য হইতে পারে যে, উপরোক্ত উপাধিসমূহ যদি ব্রাহ্মণজাতিরই মৌলিক উপাধি হয়, তবে ঐ সকলের কতকগুলি শূদ্রদিগের মধ্যেও দৃষ্ট হয়, ইহার কারণ কি? তদুত্তরে বক্তব্য এই যে, পুরাকালে ব্রাহ্মণজাতির মধ্যে যাহারা কর্ম্মদোষে পতিত হইয়া শূদ্রত্বে পরিণত হইয়াছিলেন, এক্ষণে যেমন লোকে খৃষ্টানাদি ধর্ম্মান্তর গ্রহণ করিলেও পৈতৃক উপাধি ত্যাগ করে না সেইরূপ, তাঁহারা প্রাচীন উপাধি ত্যাগ করেন নাই। যাহা হউক, নানা কারণে এক্ষণে এ সকল বিষয়ের কোন একটা স্থির সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া এক প্রকার অসম্ভব হইয়া পড়িয়াছে। কিন্তু তাহা হইলেও বৈদ্যগণ যে একতর ব্রাহ্মণ তদ্বিষয়ে কোন সংশয়ই থাকিতেছে না।

এক্ষণে বৈদ্যেরা জাতিতে ব্রাহ্মণ বলিয়া পরিচয় দিলে, বৈদ্যজাতি হইয়া আবার কিরূপে ব্রাহ্মণজাতি হইতে পারে, ইহা অনেকে বুঝিয়া উঠিতে পারেন না এবং "বৈদ্যব্রাহ্মণ" বলিলে তাঁহারা 'সোণার পাথর বাটী'র ন্যায় একটা অলীক বাক্য মনে করিয়া থাকেন। ইহা তাঁহাদের অজ্ঞতারই ফল। এজন্য বিষয়টি কিছু বিশদ করিবার চেষ্টা করা যাইতেছে। যেমন

ব্রাহ্মণজাতিকে আর্য্যজাতি বলা যায়, যেমন আর্য্যজাতিকে মনুষ্যজাতি বলা যায়, তেমনি বৈদ্যজাতিকে ব্রাহ্মণজাতি বলা যায়। ব্রাহ্মণজাতি হইয়া অবস্থাবিশেষে কেহ নিজেকে আয্যজাতি বলিয়া পরিচয় দিলে তাহা যেমন সোণাব পাথরবাটীর ন্যায় অসম্ভব বাক্য হয় না, তদ্রূপ বৈদ্যজাতি হইয়া ব্রাহ্মণজাতি বলিয়া পবিচয় দিলে তাহা কিছুমাত্র বিসদৃশ হয় না। পক্ষান্তরে যেমন মনুষ্যজাতি ভিন্ন আর্য্যজাতি হইতে পাবে না, এবং যেমন আর্য্যজাতি ভিন্ন ব্রাহ্মণজাতি হইতে পারে না সেইরূপ ব্রাহ্মণজাতি ভিন্নও বৈদ্যজাতি হইতে পাবে না ; যেহেতু বৈদ্যজাতি মূল ব্রাহ্মণজাতিবই অন্তর্গত এবং ব্রাহ্মণজাতি ব্যতিরিক্ত বৈদ্যজাতি নাই। এ দেশে যে ব্রাহ্মণবর্ণাতিরিক্ত বৈদ্যনামক জাতিব সত্বা দৃষ্ট হয়, তাঁহা ভ্রান্তি ও বিদ্বেষপ্রসূত মাত্র। এক বৃহৎ বৃত্তের মধ্যে যেমন ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অনেক বৃত্ত অবস্থান করে, তেমনি এক সুবৃহৎ ব্রাহ্মণজাতিব মধ্যে যাজক ব্রাহ্মণ, চিকিৎসক ব্রাহ্মণ প্রভৃতি বিবিধ শ্রেণী বা সম্প্রদায় অবস্থিত রহিয়াছে। বঙ্গদেশ ব্যতীত ভারতের সর্ব্বস্থানেই এইরূপ দেখা যায়। যাজক ব্রাহ্মণের মত চিকিৎসক ব্রাহ্মণও এক ব্রাহ্মণজাতির অংশ মাত্র। এই চিকিৎসক ব্রাহ্মণদিগের বংশধরগণই বর্ত্তমানে বৈদ্যজাতি নামে পরিচিত। বৈদ্যেতর যাজক ব্রাহ্মণ সম্প্রদায়ও আবার ব্রাহ্মণ, মূর্দ্ধাভিষিক্ত ও অম্বষ্ঠ এই তিন শ্রেণীতে বিভক্ত হইয়াছিল, ইহা পরে বিস্তৃতভাবে উল্লিখিত হইবে। যাহা হউক, যদিও শাস্ত্রানুসাবে শুধু 'বৈদ্য' বলিলে বৈদ্যশ্রেণীর ব্রাহ্মণকেই বুঝায়, তথাপি অধুনা অজ্ঞ লোকদিগের সহজে বুঝিবার জন্য কেবল বৈদ্য বলিয়া পরিচয় দেওয়ার পরিবর্ত্তে বৈদ্যব্রাহ্মণ বলিয়া পরিচয় দিবার আবশ্যক হইয়াছে।

২। বৈদ্য অম্বষ্ঠ-জাতীয় নহেন।

বঙ্গীয় বৈদ্যগণ যে অম্বষ্ঠ জাতি নহেন, তাহা বুঝিতে হইলে 'অম্বষ্ঠ' শব্দের অর্থ এবং অম্বষ্ঠজাতিই বা কাহাকে বলে অগ্রে তাহা জানা আবশ্যক। এ নিমিত্ত আমরা তদ্বিষয়ের আলোচনায় প্রবৃত্ত হইতেছি।

'অম্বষ্ঠ' শব্দের চারি প্রকার অর্থ।

(ক) **অম্বষ্ঠ = অম্বষ্ঠদেশ এবং তদ্দেশবাসী।** অম্বষ্ঠ নামক প্রদেশ এবং তদ্দেশবাসী অম্বষ্ঠদিগের উল্লেখ বিষ্ণুপুরাণ ও মহাভারতাদিতে দৃষ্ট হয়। বিষ্ণুপুরাণে উক্ত হইয়াছে—'সৌবীর, সৈন্ধব, শাল্ব, হুন, শাকলবাসী, মদ্র, আরাম, **অম্বষ্ঠদেশবাসী** ও পারসিক প্রভৃতিরা সদা এই সমুদায় নদীর সমীপে বাস করিতেন ও জলপান করিতেন (৯৫)। মহাভারত সভাপর্ব্বে এইরূপ লিখিত আছে—'পাণ্ডুনন্দন নকুল দশার্ণদিগকে এবং শিবি, ত্রৈগর্ত্ত **'অম্বষ্ঠ,** মালব ও পঞ্চ কর্পটদিগকে জয় করিয়া প্রস্থান করিলেন' এবং **'অম্বষ্ঠ,** কৌকুর, তার্ক্ষ্য, বস্ত্রপ ও পল্লব এই ক্ষত্রিয়গণ যুধিষ্ঠিরের জন্য শত শত ধন আহরণ করিয়াছিলেন' (৯৬) আরও, 'কাশ্মীর অম্বষ্ঠ ও সিন্ধুদেশ শতমাত্র ও চতুষ্কোণাবশিষ্ট' (৯৭) [বার্হস্পত্যার্থশাস্ত্রম্ Dr Thomas' Edition]। কেহ কেহ এই অম্বষ্ঠদেশকে বর্ত্তমান আফ্‌গানিস্থানের অন্তর্গত, আর কেহ বা পাঞ্জাবের অন্তঃপাতী বলিয়া নির্দ্দেশ করেন। ইতিহাসে বর্ণিত আছে যে, গ্রীকগণ প্রথম ভারতবর্ষ আক্রমণ করেন, তখন ভারতের উত্তরপশ্চিম প্রান্তে অম্বষ্ঠ নামে একটি দেশ প্রসিদ্ধ ছিল। সেই দেশের লোকদিগকে অম্বষ্ঠ বলিত। এই দেশে গণতন্ত্র শাসনপ্রণালী প্রচলিত ছিল। ইহাদের ৬০০০০ পদাতিক, ৬০০০ অশ্বারোহী এবং ৫০০ রথী ছিল

[Dr H. C Ray chaudhuri's Political History of ancient India] যাহাহউক, এক্ষণে ঐ স্থান যে অম্বষ্ঠ নামে প্রচলিত নহে, তাহা বলা বাহুল্য।

(খ) অম্বষ্ঠ=লোকসমাজের বা রোগিগণের পিতৃস্বরূপ। প্রকৃতিবাদ অভিধানে 'অম্বষ্ঠ' শব্দের উৎপত্তি ও অর্থ এইরূপ লিখিত আছে—"অম্ব (পিতা)+ষ্ঠ [স্থা+অ (ড) + ক সংজ্ঞার্থে] (যে থাকে) **অর্থাৎ যিনি রোগসময়ে পিতার ন্যায় থাকেন**"। এই অর্থে চিকিৎসক মাত্রকেই অম্বষ্ঠ কহা যায়। কিন্তু এই গৌরবজনক উপাধি ধন্বন্তরি সর্ব্বপ্রথম লাভ করেন। তিনি পিতার ন্যায় রোগীদিগকে স্নেহ ও যত্নের সহিত চিকিৎসা করেন এবং তাহা দ্বারা অম্ব অর্থাৎ মৃতকল্প জনের রক্ষা হয়—এই নিমিত্ত তিনি অম্বষ্ঠ নামে কীর্ত্তিত হন বলিয়া পুরাণে উক্ত হইয়াছে। এই ধন্বন্তরি স্বয়ং চিকিৎসক ছিলেন এবং আয়ুর্ব্বেদ প্রচার করিয়াছিলেন; তদ্ব্যতীত তিনি কাশীর রাজা ছিলেন বলিয়া প্রজাদিগকে পুত্রবৎ পালন করিতেন। এই দুই কারণে তিনি লোকসকলের পিতৃস্বরূপ এই অর্থে অম্বষ্ঠ কথিত হইতেন। ঋগ্বেদে তাঁহাকে সর্ব্বতাত (সকলের পিতৃস্বরূপ) বলা হইয়াছে ইহা আমরা পূর্ব্বে উল্লেখ করিয়াছি।

(গ) অম্বষ্ঠ=ব্রাহ্মণবর্ণান্তর্গত জাতিবিশেষ। পূর্ব্বে যখন ব্রাহ্মণের ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য এই তিন বর্ণে বিবাহ করিবার রীতি ছিল, তখন তাঁহাদের বৈশ্যাপত্নীসম্ভূত ঔরস পুত্রগণ অম্বষ্ঠ নামে কথিত হইতেন। যাজ্ঞবল্ক্য বলিয়াছেন,—'বিপ্র হইতে ক্ষত্রিয়া স্ত্রীতে মূর্দ্ধাভিষিক্ত ও বৈশ্যা স্ত্রীতে অম্বষ্ঠ জাত হয়; বিবাহিতা স্ত্রীতে এই সকল পুত্র হয় জানিবে' (৯৮)। এই মূর্দ্ধাভিষিক্ত ও অম্বষ্ঠগণ ব্রাহ্মণবর্ণেরই অন্তর্গত। মহাভারতে লিখিত আছে—'ব্রাহ্মণের পক্ষে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য এই

তিন বর্ণে বিবাহ করা ধর্ম্মবিহিত। বৈষম্যহেতু, লোভ হেতু অথবা কামবশতঃ ব্রাহ্মণের শূদ্রাভার্য্যা হইয়া থাকে, উহা ধর্ম্মার্থ বলিয়া কথিত হয় না' (৯৯)। মহর্ষি বিষ্ণুও বলিয়াছেন—"দ্বিজের শূদ্রাভার্য্যা কদাচ ধর্ম্মার্থ হয় না, উহা রত্যর্থ বলিয়া কীর্ত্তিত হয়' (১০০)। এই কথা বলাতে তাঁহার ইহা নির্দ্দেশ করা হইল যে, দ্বিজের দ্বিজাভার্য্যা রত্যর্থ নহে, পরন্তু উহা ধর্ম্মার্থই হইয়া থাকে। অতএব বৈধ বিবাহে কোন দোষ না থাকায় তজ্জাত পুত্রও নিন্দিত বা নিকৃষ্ট হয় না—সে পিতৃবর্ণই প্রাপ্ত হইয়া থাকে। ব্যাস-সংহিতায়ও ইহা স্পষ্টতঃ উক্ত হইয়াছে ; যথা—'সবর্ণা কন্যা বিবাহ করিয়া ইচ্ছা হইলে অসবর্ণা কন্যা বিবাহ করিবে ; তাহাতে উৎপাদিত পুত্র পিতৃসবর্ণ হইতে ভ্রষ্ট হয় না। বিপ্র ক্ষত্রিয়া ও বৈশ্যাকে বিবাহ করিবে এবং ক্ষত্রিয় বৈশ্যাকে বিবাহ করিবে। কিন্তু দ্বিজ কখন শূদ্রাকে বিবাহ করিবে না' (১০১) ইত্যাদি। ব্রাহ্মণী, ক্ষত্রিয়া ও বৈশ্যা এই ত্রিবিধ পত্নীজাত সকল পুত্রই যে ব্রাহ্মণবর্ণ, তাহা মহাভারতে সুস্পষ্টভাবেই লিখিত আছে ; যথা—'ব্রাহ্মণের তিন ভার্য্যা ও ক্ষত্রিয়ের দুই ভার্য্যা বিহিত, বৈশ্য স্বজাতিতে বিবাহ করিবে ; প্রত্যেকের সেই সকল স্ত্রীতে জাত সন্তান বর্ণে সকলে সমান হইবে'—'ব্রাহ্মণের শূদ্রাপুত্র অনৈপুণ্য-হেতু অব্রাহ্মণ বলিয়া বিবেচিত হয়, আর ব্রাহ্মণাদি তিন বর্ণীয় পত্নীতে জাত পুত্রসকল ব্রাহ্মণ হইবে' (১০২) ইত্যাদি।

মনু ক্ষেত্র অপেক্ষা বীজেরই প্রাধান্য বিশেষভাবে কীর্ত্তন করিয়াছেন এবং বলিয়াছেন যে, ক্ষেত্র যেরূপই হউক না কেন বীজানুরূপেই ফল হইয়া থাকে। যথা—'নারী ক্ষেত্রস্বরূপ এবং পুরুষ বীজস্বরূপ কথিত হয়। ক্ষেত্র ও বীজ উভয়ের যোগে সমস্ত দেহী উৎপন্ন হইয়া থাকে। বীজ এবং যোনি এই উভয়ের মধ্যে বীজই শ্রেষ্ঠ ; যেহেতু বীজের লক্ষণাক্রান্ত হইয়াই সর্ব্বপ্রাণী জন্মগ্রহণ করে। যথাকালে কর্ষণাদিসংস্কৃত ক্ষেত্রে যাদৃশ বীজ

বপন করা যায়, সেই বীজের গুণ প্রকাশ করিয়াই অঙ্কুরসকল তাহা হইতে উৎপন্ন হইয়া থাকে। এই পৃথিবীকে ভূতগণের নিত্যযোনি বলা যায় বটে, কিন্তু অঙ্কুর বা কাণ্ডাবস্থায় বীজকে ক্ষেত্রানুরূপ কোন গুণই ভজনা করিতে দেখা যায় না। ইহাও দেখা যায়—এক ক্ষেত্রে কর্ষকগণ কর্ত্তৃক যথাকালে উপ্ত নানাবিধ বীজ স্বভাবতঃ বীজানুরূপ ভিন্ন ভিন্ন আকারই ধারণ করিয়া থাকে। ব্রীহি, মুদ্গ, শালিধান্য, মাষ, লশুন, যব এবং ইক্ষু প্রভৃতি শস্যসকল নিজ নিজ বীজানুরূপেই সমুৎপন্ন হইয়া থাকে। এক বীজ রোপন করিলে তাহা হইতে অন্য বীজাঙ্কুর জন্মায়, এরূপ সিদ্ধান্ত কথনই হইতে পারে না। যখন যে বীজ রোপন করিবে, তাহা হইতে নিশ্চয় তদঙ্কুরই উৎপন্ন হইবে ইহা স্থির সিদ্ধান্ত ; (১০৩) এইরূপ বিষ্ণুও বলিয়াছেন—'মাতা চর্ম্মাধার মাত্র, পুত্র পিতারই ; যে যৎকর্ত্তৃক উৎপন্ন সে তাহারই স্বরূপ' (১০৪)। সুতরাং পুত্র পিতৃজাতি হইবেই ইহা নিশ্চয়। ইহাই মৌলিক নিয়ম। ব্যভিচারাদি দোষ না থাকিলে এ নিয়মের কদাচ ব্যতিক্রম ঘটিতে পারে না।

মনু ব্রাহ্মণাদি চারি বর্ণের সবর্ণে, অনুলোমে (নিম্নবর্ণে) ও প্রতিলোমে (উচ্চবর্ণে) স্বোঢ়া, অনূঢ়া ও পরোঢ়াতে বিধি ও অবিধি পূর্ব্বক উৎপন্ন সর্ব্বপ্রকার পুত্রের বর্ণধিকার এইরূপে নির্দ্দেশ করিয়াছেন,যথা—'সর্ব্ববর্ণে তুল্যা স্ত্রীসকলের মধ্যে পত্নীসকলে, অক্ষতযোনি কন্যাসকলে,এবং পত্নী (স্বোঢ়া) ও অক্ষতযোনি (অনূঢ়া) ব্যতীত পরোঢ়া তুল্যা স্ত্রীসকলে [অনুলোমক্রমে] ; আর [তুল্যা স্ত্রী ভিন্ন] আনুলোম্যে (নিম্নবর্ণে) বিধিপূর্ব্বক উৎপন্ন পুত্রগণ জাতিতে (জন্মগত বর্ণাধিকারে) তাহাদের স্ব স্ব পিতারই স্বরূপ (অর্থাৎ তাহারা পিতৃবর্ণের সম্যক্ অধিকারী হইয়া থাকে) [১০ম অঃ ৫ম শ্লোক]। আর স্ত্রীসকলে (অর্থাৎ পূর্ব্ব শ্লোকের অনুবৃত্তিক্রমে—তুল্যা এবং নিম্নবর্ণজাতা স্ত্রীসকলে) এবং অনন্তর-বর্ণজাতা স্ত্রীসকলে (অর্থাৎ তুল্যা

এবং অনুলোম ভিন্ন প্রতিলোমে উচ্চবর্ণজাতা স্ত্রীসকলে) দ্বিজ [ও শূদ্র] গণ কর্ত্তৃক উৎপন্ন **মাতৃদোষ-বিগর্হিত** (মাতার স্বাতন্ত্র্য ও ব্যভিচার দোষে নিন্দিত যে সকল পুত্র, তাহারা পিতৃবর্ণের সদৃশই অর্থাৎ (নিকৃষ্ট অধিকারীই) কথিত হয়—সম্যক অধিকারী হয় না [১০ম অঃ ৬ষ্ঠ শ্লোক (১০৫)]। * সুতরাং মনুর মতে ব্রাহ্মণের ক্ষত্রিয়া ও বৈশ্যাপত্নীজাত মূর্দ্ধাভিষিক্ত ও অম্বষ্ঠ নামক পুত্রগণ বিশুদ্ধ ব্রাহ্মণ এবং তাঁহারা ব্রাহ্মণ-বর্ণের সম্যক্ অধিকারী।

---

* এস্থলে ইহার উল্লেখ করা কর্ত্তব্য যে, কুল্লুকাদি টীকাকারগণ 'তুল্যা' ও 'অক্ষতযোনি' এই পদদ্বয়কে 'পত্নী' পদের এবং 'অনন্তরজাতা' পদকে 'স্ত্রী' এই পদের বিশেষণরূপে গ্রহণ করিয়া অর্থকে সঙ্কীর্ণ করিয়াছেন। তাহাতে ক্ষেত্রজ ও অক্ষতযোনি কুমারীজাত বৈধ পুত্রের এবং অবৈধরূপে জাত কুণ্ড, গোলক, পৌনর্ভব ও কানীন পুত্রদিগের বর্ণ নিরূপিত হয় নাই। কিন্তু প্রত্যেক পদের পৃথক্ পৃথক্ অর্থ করিলে এই সঙ্কীর্ণত্ব দোষ ঘটে না। পণ্ডিতা-গ্রগণ্য কবিরাজ গঙ্গাধরও তাঁহার "প্রমাদভঞ্জনী" নামক টীকায় কুল্লুকাদির ভ্রমপ্রমাদ দেখাইয়া দিয়া প্রত্যেক পদের পৃথক্ অর্থ করিয়াছেন। সেই ব্যাখ্যায় বৈধ এবং অবৈধ সর্ব্বপ্রকার পুত্রেরই পিতৃবর্ণত্ব বুঝাইয়াছে। পুরাণোক্ত ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয়-বংশাবলীর ইতিহাস দেখিলে এবং স্মৃতিতে ব্রাহ্মণের কুণ্ড, গোলক প্রভৃতি জারজ পুত্রদিগকেও শ্রাদ্ধে অপাংক্তেয় **ব্রাহ্মণ** বলাতে এই প্রণালীর ব্যাখ্যাই সঙ্গত ও সর্ব্বব্যাপিনী বলিয়া মনে হয়।

৫ম শ্লোক সম্বন্ধে বক্তব্য—(ক) দ্বিজের পক্ষে দ্বিজা ও শূদ্রের পক্ষে শূদ্রা—তুল্যা স্ত্রী বলিয়া কথিত হয়। ব্রাহ্মণের পক্ষে ক্ষত্রিয়া ও বৈশ্যা স্ত্রী দ্বিজাতি-সামান্যে তুল্যা। (খ) ব্রাহ্মণের মন্ত্রপরিণীতা ব্রাহ্মণী, ক্ষত্রিয়া ও বৈশ্যা এই ত্রিবিধা স্ত্রী পত্নী হইয়া থাকে কিন্তু দ্বিজের শূদ্রা স্ত্রী পত্নী হয় না। পত্নী শব্দ এখানে যোগরূঢ়ী অর্থে ব্যবহৃত। যে স্ত্রী পতির ধর্ম্মকার্য্যে যোগদান

করিবার অধিকারিণী সেই স্ত্রী পত্নীপদবাচ্য। ব্রাহ্মণের ক্ষত্রিয়া ও বৈশ্যাভার্য্যা ধর্ম্মার্থ এবং শূদ্রাভার্য্যা রত্যর্থ হইয়া থাকে ইহা পূর্ব্বেই উল্লিখিত হইয়াছে। এতদনুসারে ঐ ক্ষত্রিয়া ও বৈশ্যাভার্য্যা ব্রাহ্মণেব সহধর্ম্মিণী বা পত্নী পদবাচ্য হয় এবং শূদ্রাভার্য্যা পত্নী হয় না—সে ভাৰ্য্যা মাত্র। মনুও দ্বিজের পক্ষে শূদ্রাভার্য্যার সহিত ধর্ম্মকার্য্য করা অতীব নিষিদ্ধ বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। (গ) অক্ষতযোনি অর্থে অনূঢা অথচ দ্বিতীয় পুরুষ-সংসর্গরহিতা স্ত্রী। এখানে অক্ষতযোনিকে তুল্যা স্ত্রীদিগের মধ্যেই নির্দ্দেশ কবা হইয়াছে এবং 'আনুলোম্য' কথাটির প্রয়োগ হেতু প্রতিলোম নিবারিত হইয়াছে। (ঘ) আনুলোম্য অর্থে প্রধানতঃ দ্বিজাতি বর্ণত্রয়ের বিধিপূর্ব্বক পরিণীতা শূদ্রা স্ত্রীকে বুঝাইয়াছে এবং উক্ত শব্দ দ্বারা তুল্যা স্ত্রীদিগেব মধ্যেও অনুলোমক্রম (অর্থাৎ পুরুষ অপেক্ষা স্ত্রীর বর্ণ ও বিদ্যাবয়সাদিতে নিকৃষ্ট হওয়ার যে নিয়ম তাহাও) লক্ষিত হইয়াছে। (ঙ) এখানে তুল্যা স্ত্রীসকলের মধ্যে পরোঢার উল্লেখ না থাকিলেও 'পত্নী' ও 'অক্ষতযোনি' অর্থাৎ স্বোঢা ও অনূঢার উল্লেখ হেতু অবশিষ্ট পরোঢা তুল্যাও 'তুল্যা' শব্দের মধ্যেই উক্ত এবং 'পত্নী' ও অক্ষতযোনি এই দুই শব্দের বৈধত্বানুরোধে কেবল যথাশাস্ত্র-নিযুক্তা পরোঢাই গৃহীত, ইহা বুঝিয়া লইতে হইবে। আরও শূদ্রের শূদ্রা ভার্য্যা যজ্ঞসংযোগ অভাবে পত্নী পদবাচ্য হয় না বলিয়া উহাকেও 'তুল্যা' পদের মধ্যে নির্দ্দেশ করা হইয়াছে।

যাহা হউক মনু বলিলেন যে, পত্নীতে (অর্থাৎ মন্ত্রবিবাহিতা সবর্ণজা ও নিম্নবর্ণজা স্বকীয় স্ত্রীতে), অক্ষতযোনি তুল্যা স্ত্রীতে অনুলোম-বিধি অনুসারে, নিয়োগ-বিধি অনুসারে পরোঢা তুল্যাতে এবং শূদ্রবর্ণে বৈধ বিবাহ দ্বারা যে সকল পুত্র জন্মে, তাহারা পিতৃবর্ণের সম্যক্ অধিকারী হয়। পরশ্লোকে মাতৃদোষ-বিগর্হিত পুত্রদের বিষয় বিবৃত করায়, এই শ্লোকে কেবল মাতৃদোষ-বিবর্জ্জিত-পুত্রদিগের বিষয় উক্ত হইয়াছে বুঝিতে হইবে। শূদ্রাবিবাহ সম্বন্ধে মনু বিধি ও নিষেধ উভয়ই উল্লেখ করিয়াছেন দেখা যায়। সুতরাং উহা স্থলবিশেষে বৈধ ও স্থলবিশেষে নিষিদ্ধ। তিনি ৩য় অঃ ১৩ শ্লোকে শূদ্রা ব্রাহ্মণাদি দ্বিজ-

গণের ভার্য্যা হইবে বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন এবং ৪৪ শ্লোকে ঐ বিবাহের প্রণালী পর্য্যন্ত নির্দ্দেশ করিয়াছেন। অতএব দ্বিজের শূদ্রাবিবাহ যে মনুর মতে সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ, এ কথা কখনই বলা যায় না। কেবল প্রতিলোমে বিবাহ হইতে পারে না বলিয়া, তিনি প্রতিলোমা ভার্য্যার কোন উল্লেখ করেন নাই। অগ্রে ধর্ম্মার্থ সবর্ণজা বা অসবর্ণজা দ্বিজা বিবাহ করিয়া পরে শূদ্রা বিবাহ করিলে কোন দোষ হয় না; নতুবা অগ্রে শূদ্রা বিবাহ করিলে বিবাহকর্ত্তা ও ঐ বিবাহজাত পুত্র উভয়েই শূদ্রত্ব প্রাপ্ত হয়। কিন্তু পরবর্ত্তীকালে যাজ্ঞবল্ক্য প্রভৃতি ঋষিগণ শূদ্রাবিবাহ সম্পূর্ণরূপে নিষেধ করিয়া তজ্জাত পুত্রের শূদ্রত্ব বিধান করিয়াছেন।

ষষ্ঠ শ্লোক সম্বন্ধে বক্তব্য—৫ম শ্লোকে মনু বৈধপুত্রদিগকে জাতিতে পিতার স্বরূপ বা পিতৃবর্ণের সম্যক্ অধিকারী কহিয়া এই শ্লোকে অবৈধরূপে উৎপন্ন যে সকল পুত্র তাহাদের অধিকার নিরূপণ করিতেছেন। যথা—দ্বিজগণ কর্ত্তৃক উৎপাদিত যে সকল পুত্র মাতার ব্যভিচারাদি দোষে বিশেষ প্রকারে নিন্দিত তাহারা পিতৃবর্ণ-সদৃশই কথিত হয়। ইহাদের মধ্যে (ক) যাহারা সবর্ণে ও অনুলোমে জাত অর্থাৎ ব্রাহ্মণের ব্রাহ্মণাদি তিন বর্ণে, ক্ষত্রিয়ের ক্ষত্রিয় ও বৈশ্যবর্ণে এবং বৈশ্যের সবর্ণে জাত সেই ষড়্‌বিধ পুত্র অপসদ বলিয়া কথিত হয় (১০ম শ্লোক)। ইহারা সবর্ণজ ও অনুলোমজ অপসদ। (খ) যাহারা প্রতিলোমে (নিম্নবর্ণ কর্ত্তৃক উচ্চবর্ণাতে) জাত অর্থাৎ ক্ষত্রিয় হইতে ব্রাহ্মণীতে, বৈশ্য হইতে ক্ষত্রিয়া ও ব্রাহ্মণীতে এবং শূদ্র হইতে বৈশ্যা, ক্ষত্রিয়া ও ব্রাহ্মণীতে জাত, সেই ষড়্‌বিধ পুত্র বর্ণসঙ্কর নামে অভিহিত হয় (১১-১২ শ্লোক)। ইহারা প্রতিলোমজ অপসদ বলিয়াও কথিত হইয়াছে (১৬-১৭ শ্লোক)। আবার সঙ্করদিগের সবর্ণজ অনুলোমজ ও প্রতিলোমজ পুত্রেরা উহাদেরই সদৃশ (২৭ শ্লোক)। আর (গ) যাহারা দ্বিজগণ কর্ত্তৃক শূদ্রাতে অবৈধরূপে জাত তাহারা অপধ্বংসজ বলিয়া কথিত (৪১শ শ্লোক) যেহেতু তাহাদের দ্বিজত্ব ধ্বংস হয়।

মনুর মতে দ্বিজাতি তিন বর্ণের মধ্যে (ক) স্বজাতিতে ও (খ) ভিন্ন জাতিতে [অনুলোম ও প্রতিলোম উভয়তঃ] উৎপন্নভেদে ষড়্‌বিধ বিগর্হিত পুত্র দ্বিজ হইতে দ্বিজাতে উৎপন্ন বলিয়া দ্বিজধর্ম্মী এবং অপসদ বলিয়া উক্ত অর্থাৎ তাহারা স্ব স্ব পিতৃবর্ণের মধ্যে নিকৃষ্ট বলিয়া গণ্য; আর অবশিষ্ট যে সকল পুত্র দ্বিজগণ কর্ত্তৃক শূদ্রাতে **অবিধিপূর্ব্বক** জাত তাহারা দ্বিজধর্ম্মী হয় না এবং তৎকারণে তাহারা অপধ্বংসজ বলিয়া কথিত হয় (১০ম অঃ ৪১ শ্লোক)। দ্বিজ কর্ত্তৃক সবর্ণ, অনুলোম ও প্রতিলোমে দ্বিজাতে উৎপন্ন পুত্রেরা পিতৃ-বর্ণেরই নিকৃষ্ট অধিকার প্রাপ্ত হয় বলিয়া তাহাদিগকে অপসদ বলে। আর শূদ্রাজাতেরা পিতৃবর্ণাধিকার হইতে সম্যক্‌রূপে বঞ্চিত হইয়া শূদ্রত্ব প্রাপ্ত হয়, এ নিমিত্ত তাহাদিগকে অপধ্বংসজ বলে। প্রতিলোমজ বর্ণসঙ্কর দ্বিজপুত্রেরাও দ্বিজধর্ম্মী। 'সঙ্কর' শব্দের অর্থ সম্মার্জ্জনী-ক্ষিপ্ত আবর্জ্জনা। অতএব 'বর্ণসঙ্কর' কথাটির অর্থ যাহারা বর্ণের মধ্যে সঙ্কর বা আবর্জ্জনার ন্যায় অতীব নিকৃষ্ট। তথাপি তাহারা পিতৃবর্ণ হইতে সম্যক্‌রূপে চ্যুত হয় না। কিন্তু মনু কেবল প্রতিলোমজদিগকেই বর্ণসঙ্কর-রূপে নির্দ্দেশ করিলেও, পরবর্ত্তী কালে ব্যাস প্রভৃতি ঋষিগণ উহাদের ন্যায় অনুলোমজ বিগর্হিত পুত্রদিগকেও 'সঙ্কর' নামে অভিহিত করিয়া, প্রতিলোম এবং অনুলোম জাত ঐ সকল পুত্রকে শূদ্রধর্ম্মী বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। যাহা হউক, অনেকে এই ৪১শ শ্লোকোক্ত ষট্‌ পুত্রকে সবর্ণ- ও অনুলোমজাত ষড়্‌বিধ বৈধ পুত্রকে বুঝিয়া থাকেন। ইহা ভ্রমাত্মক। কারণ (ক) সবর্ণজ ও অনুলোমজ বৈধ পুত্র ছয়টি মাত্র নহে। পত্নী ভিন্ন অক্ষতযোনিজাত ও ক্ষেত্রজ পুত্রদিগকে ধরিলে উহা অষ্টাদশ প্রকার হইয়া থাকে। সে স্থলে মনু যে অক্ষতযোনি ও ক্ষেত্রজ বৈধ পুত্রদিগকে বাদ দিয়া কেবল পত্নী জাতদিগকেই দ্বিজধর্ম্মী বলিয়া উল্লেখ করিলেন, ইহা কি প্রকারে বুঝা যাইবে? (খ) তিনি যখন ৫ম শ্লোকে বৈধ পুত্রদিগকে পিতৃবর্ণের সম্যক্ অধিকারী বলিয়া স্পষ্টতঃ নির্দ্দেশ করিয়াছেন, তখন তাহাদিগকে পুনরায় দ্বিজ-

কেহ কেহ বলেন যে, ব্রাহ্মণের অসবর্ণ বিবাহজাত পুত্রেরা কখনই ব্রাহ্মণ হইতে পারে না। ইঁহাদের এই আপত্তি নিতান্ত অসঙ্গত। কারণ

ধর্ম্মী মাত্র বলিয়া উল্লেখ নিরর্থক, পরন্তু দোষাবহ। (গ) যখন এই বচনের পূর্ব্বে ও পরে (৬ষ্ঠ হইতে ৭৩ শ্লোক পর্য্যন্ত বৈধ পুত্রের প্রসঙ্গ নাই—কেবল মাতৃদোষবিগর্হিত পুত্রদিগের কথাই বিবৃত হইয়াছে, তখন মধ্যে (৪১শ শ্লোকে) আবার বৈধ পুত্রদিগকে টানিয়া আনিবার কোন হেতু নাই। (ঘ) ইঁহাদের মত সত্য হইলে দ্বিজ ও শূদ্রের প্রতিলোমজ পুত্রসকলকে অপধ্বংসজ বলিতে হয়, কিন্তু মনু যখন তাহাদিগকে (১৬।১৭ শ্লোকে) স্পষ্টতঃ অপসদ বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন, তখন তাহারা কখনই অপধ্বংসজ হইতে পারে না। অপসদ ও অপধ্বংসজ এক কথা নহে। আরও, মনু ১০ম অঃ ৬৮।৬৯ শ্লোকে স্পষ্ট করিয়া বুঝাইয়াছেন যে, যাহারা আর্য্য (দ্বিজ) হইতে অনার্য্যাতে (শূদ্রাতে) উৎপন্ন এবং অনার্য্য (শূদ্র) হইতে আর্য্যাতে (দ্বিজাতে) উৎপন্ন তাহারা উভয়েই অসংস্কার্য্য; কিন্তু আর্য্য (দ্বিজ) হইতে আর্য্যাতে (দ্বিজাতে) উৎপন্ন পুত্রেরা সর্ব্বসংস্কারযোগ্য। অতএব দ্বিজ হইতে দ্বিজাতে প্রতিলোমজাত পুত্রেরাও সর্ব্বসংস্কারযোগ্য বলিয়া কখনই অপধ্বংসজ হইতে পারে না।

৬ষ্ঠ শ্লোকে দ্বিজগণ কর্ত্তৃক উৎপাদিত বিগর্হিত পুত্রদিগের সম্বন্ধে স্পষ্ট উল্লেখ থাকিলেও তদ্দ্বারা শূদ্র কর্ত্তৃক উৎপাদিত ঐরূপ পুত্রসকলকেও লক্ষ্য করা হইয়াছে বুঝিতে হইবে এবং তাহাদের বিধান দ্বিজপুত্রদিগের বিধান অনুসারেই জানিতে হইবে। আমাদের এই সিদ্ধান্তের কারণ এই যে, মনু ৫ম শ্লোকারম্ভে 'সর্ব্ববর্ণ' কথাটির উল্লেখ করায় তিনি যে এই দুই শ্লোকে সর্ব্ব বর্ণের সর্ব্বপ্রকার পুত্রেরই বর্ণাধিকার নিরূপণ বিষয়ে প্রতিজ্ঞা করিতেছেন ইহাই অনুমিত হয়। অতএব শূদ্র কর্ত্তৃক উৎপাদিত পুত্রদিগকে বাদ দিলে প্রতিজ্ঞা অসম্পূর্ণ হয় বলিয়া, আমাদের বিবেচনায় ব্যাপক অর্থ গ্রহণ করাই সঙ্গত।

শাস্ত্রের সিদ্ধান্ত তাঁহাদের মতের সম্পূর্ণ বিপরীত, ইহা আমরা দেখাইলাম। শাস্ত্রে যখন এই সকল পুত্রকে স্পষ্টতঃ ব্রাহ্মণ বলিয়া নির্দ্দেশ করা হইয়াছে, তখন শাস্ত্রবিরুদ্ধে ঐরূপ আপত্তি করা ধৃষ্টতা ভিন্ন আর কিছুই নহে। গায়ের জোরে বৃথা আপত্তি উত্থাপন করিলে সত্যেরই অপলাপ করা হয় মাত্র। এতদ্ভিন্ন, পুরাণাদিতে অসংখ্য প্রমাণ আছে যে, অধিকাংশ ব্রাহ্মণই অসবর্ণ বিবাহজাত। অতএব মূর্দ্ধাভিষিক্ত ও অম্বষ্ঠেরা ব্রাহ্মণ না হইলে যাজক ব্রাহ্মণগণও ব্রাহ্মণ হইতে পারেন না (শ্রীযুক্ত হরিপদ শাস্ত্রী এম এ প্রণীত 'ব্রাহ্মণজাতির ইতিহাস' শীর্ষক প্রবন্ধ দ্রষ্টব্য)।

(ঘ) **অম্বষ্ঠ=অপসদ অম্বষ্ঠ** অর্থাৎ বৈশ্যাতে ব্রাহ্মণ কর্ত্তৃক **অবিধিপূর্ব্বক** উৎপন্ন। যেমন মনুসংহিতায় ১০ম অধ্যায় ৮ম শ্লোকে লিখিত হইয়াছে- 'ব্রাহ্মণ হইতে বৈশ্যকন্যাতে অম্বষ্ঠ নামক সন্তান জন্মে' (১০৬)। ইহার পূর্ব্বে ৬ষ্ঠ ও ৭ম শ্লোকে মনু মাতৃদোষ-বিগর্হিত পুত্রেরা পিতৃবর্ণের সদৃশ (অর্থাৎ নিকৃষ্ট অধিকারী) হয়, ইহা কহিয়া এই ৮ম শ্লোকে উদাহরণ-স্বরূপে এই অম্বষ্ঠকে গ্রহণ করায় তাঁহার অপসদ অর্থাৎ নিকৃষ্ট অম্বষ্ঠকেই লক্ষ্য করা হইয়াছে সন্দেহ নাই। এখানে 'কন্যা' শব্দ যোগরূঢ়ী অর্থে ব্যবহৃত। এই অর্থে 'কন্যা' শব্দে অনূঢ়া নবযৌবনসম্পন্না বালিকাকে বুঝায়। যেমন মনু অন্যত্র বলিয়াছেন—'পাণিগ্রহণবিষয়ক মন্ত্রসকল কন্যার প্রতি প্রযুক্ত হয়' (১০৭)। এ স্থলে 'কন্যা' শব্দে অনূঢ়া ব্যতীত ঊঢ়াকে বুঝাইতে পারে না। আরও, কিঞ্চিৎ মনোযোগ সহকারে দেখিলেই বুঝা যাইবে যে, মনুসংহিতায় 'কন্যা' শব্দ কুত্রাপি ঊঢ়ার প্রতি ব্যবহৃত হয় নাই। সে যাহা হউক, এইরূপ কন্যাবস্থায় জাত অম্বষ্ঠের কথাই এ স্থলে উক্ত হইয়াছে, পত্নীজাত অম্বষ্ঠের কথা নহে। ইহার পূর্ব্বে ৫ম শ্লোকে মনু যখন পত্নীজাত পুত্রদিগকে জাতিতে পিতৃবর্ণের সম্যক্ অধিকারী বলিয়া

নির্দ্দেশ করিয়াছেন, তখন বর্ণাধিকার নিরূপণের জন্য পুনরায় পত্নীজাত অম্বষ্ঠকে ব্রাহ্মণ হইতে পৃথক্‌রূপে নির্দ্দেশ করিবার প্রয়োজন হয় নাই বলিতে হইবে। যাজ্ঞবল্ক্য বলিয়াছেন—'অনুলোমজ পুত্রগণ সৎ এবং প্রতিলোমজ-গণ অসৎ বলিয়া জানিবে' (১০৮)। সুতরাং ব্রাহ্মণ হইতে বৈশ্যকন্যাজাত অপসদ অম্বষ্ঠেরা অনুলোমজ বলিয়া অসৎ নহে, তাহারা মাতার ব্যভিচার দোষ হেতু নিন্দিত বলিয়া অসৎ। মনু উক্ত ১০ম অধ্যায়ের ৪৬শ শ্লোকে 'দ্বিজগণের অপসদ ও অপধ্বংসজ পুত্রেরা দ্বিজগণেরই নিন্দিত বৃত্তিদ্বারা জীবিকা নির্ব্বাহ করিবে' ইহা কহিয়া পর শ্লোকেই উদাহরণ-স্বরূপে উল্লেখ করিয়াছেন—'সূতগণের অশ্বসারথ্য এবং অম্বষ্ঠগণের চিকিৎসা' (১০৯)। এতদনুসারে এই 'অম্বষ্ঠ' শব্দে যে অপসদ অম্বষ্ঠকে এবং 'চিকিৎসা' অর্থে নিন্দিত বা নিকৃষ্ট চিকিৎসা বুঝাইয়াছে, তদ্বিষয়ে কোন সংশয়ই থাকিতে পারে না। চিকিৎসা যে স্বরূপতঃ নিন্দিত বৃত্তি নহে, পরন্তু পুণ্যতম এবং শ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণদিগের বৃত্তি তাহা আমরা পূর্ব্বে বিশেষরূপে সপ্রমাণ করিয়াছি। আর আমরা ইহাও দেখাইয়াছি যে, লোকানুগ্রহার্থ চিকিৎসা করাই চিকিৎ-সার যথার্থ উদ্দেশ্য এবং তাহাই পুণ্যতম চিকিৎসা। উহা কদাচ জীবিকার্থ ব্যবহার্য্য নহে। অথচ এখানে মনু বলিলেন যে, অপসদ অম্বষ্ঠেরা চিকিৎসা দ্বারা জীবিকা নির্ব্বাহ করিবে। সুতরাং এই চিকিৎসা অর্থে ব্রাহ্মণোচিত প্রকৃত চিকিৎসা বলিয়া বুঝিতে হইবে না, চিকিৎসা সম্বন্ধীয় নিকৃষ্ট কার্য্য-গুলি মাত্র বুঝিতে হইবে। ইহার তাৎপর্য্য এই যে, ঐ অম্বষ্ঠেরা জীবিকা অর্জ্জনের জন্য ঔষধাদি বিক্রয়, সামান্য অস্ত্রচিকিৎসা এবং অশ্বগবাদির চিকিৎসা প্রভৃতির অবলম্বন করিবে। চিকিৎসাবিষয়ক নিকৃষ্ট কার্য্য অবলম্বন হেতু ইহাদের নামও অম্বষ্ঠ হইয়াছে। কিন্তু পুণ্যতম চিকিৎসার অধিকারী ভিষক্ ব্রাহ্মণদিগের জন্য গাছ গাছড়া প্রভৃতি সংগ্রহ এবং ঔষধাদি প্রস্তুত করণে সাহায্য করাই তাহাদের তপস্যা রূপে জ্ঞেয়। যাহা

হউক, মনুসংহিতার ব্যাখ্যাস্বরূপ মহাভারতেও দেখা যায় যে, তথায় ব্রাহ্মণের বৈশ্যাপত্নীজাত পুত্রদিগকে ব্রাহ্মণরূপেই নির্দ্দেশ করা হইয়াছে—স্বতন্ত্র অম্বষ্ঠ নামে অভিহিত করা হয় নাই। আর জনক-পরাশর সংবাদে —যেখানে চারি বর্ণের পরস্পর অবৈধ সংযোগে উৎপন্ন সঙ্করজ পুত্রসকলের নামোল্লেখ করা হইয়াছে, কেবল সেই স্থলেই অম্বষ্ঠ নামের উল্লেখ করায় ঐ অম্বষ্ঠকে অপসদরূপেই ব্যক্ত করা হইয়াছে (১১০)। অতএব সৎ এবং অপসদ অম্বষ্ঠ যে সম্পূর্ণ পৃথক্ জাতি তাহা প্রতিপাদিত হইল।

বৈদ্যকে অম্বষ্ঠজাতি বলিয়া মনে করা ভ্রম।

এক্ষণে যাঁহারা বৈদ্যকে ব্রাহ্মণবর্ণ বলিয়া স্বীকার করেন, তাঁহাদের মধ্যে অনেকেই উহাদিগকে ব্রাহ্মণের বৈশ্যাপত্নীসম্ভূত অম্বষ্ঠশ্রেণীর ব্রাহ্মণ বলিয়া জানেন। ইহা সম্পূর্ণ ভ্রান্তিমূলক। প্রকৃত-পক্ষে বৈদ্যেরা অম্বষ্ঠজাতীয় ব্রাহ্মণ নহেন—অম্বষ্ঠদেশীয় ব্রাহ্মণ। তাঁহারা অম্বষ্ঠদেশ হইতে সমাগত বলিয়া এবং চিকিৎসক অর্থে তাঁহাদিগকে অম্বষ্ঠ ব্রাহ্মণ কহা যায়। ভারতে এই অম্বষ্ঠগণ কোথাও অম্বষ্ঠজাতি বলিয়া পরিচিত নহেন। বঙ্গদেশে তাঁহারা জাতিতে বৈদ্য এবং অন্যত্র জাতিতে ব্রাহ্মণ বলিয়া উক্ত। সুতরাং প্রসিদ্ধি অনুসারে বৈদ্যকে অম্বষ্ঠজাতীয় ব্রাহ্মণ বলিয়া সিদ্ধান্ত করা যুক্তিযুক্ত নহে। বঙ্গের বৈদ্যসাধারণ আপনাদিকে অম্বষ্ঠ-জাতি বলিয়া অবগত নহেন এবং আর কোন জাতিও সাধারণতঃ বৈদ্যকে অম্বষ্ঠজাতি বলিয়া জানেন না। একটা সমগ্র জাতি তাহার জাতীয় নাম একেবারে বিস্মৃত হইয়া গেল অথবা সমস্ত দেশবাসীর চক্ষে ধূলা দিয়া সেই নাম পরিবর্ত্তিত করিয়া ফেলিল, ইহা কি কখন সম্ভবপর হইতে পারে? কখনই নহে। বৈদ্যেরা যখন সমগ্র দেশবাসীর নিকট চিরকাল জাতিতে বৈদ্য বলিয়াই স্বীকৃত হইয়া আসিতেছেন, তখন তাঁহাদিগকে গায়ের জোরে

অম্বষ্ঠজাতি বলিলে চলিবে কেন? বাস্তবিক যদি বৈদ্যেরা ব্রাহ্মণের বৈশ্যা-পত্নী সম্ভূতই হইতেন, তাহা হইলে তাঁহাদের ব্রাহ্মণ-গোত্রসমূহ হইতে অতিরিক্ত কোন গোত্র দৃষ্ট হইত না। কিন্তু ধন্বন্তরি বৈশ্বানব, শালঙ্কায়ন প্রভৃতি অষ্ট গোত্র কেবল বৈদ্যদিগের মধ্যেই বিদ্যমান—যাজক ব্রাহ্মণদের মধ্যে নাই। সুতরাং ঐ সকল গোত্রসম্ভূত বৈদ্যগণ যে যাজক ব্রাহ্মণ হইতে উৎপন্ন তাহা কথনই বলা যাইতে পারে না। অতএব বৈদ্যেরা যে অম্বষ্ঠশ্রেণীর ব্রাহ্মণ নহেন, তাহাতে আর কোন সন্দেহ নাই।

এক্ষণে মুখ্যব্রাহ্মণ হইতে পৃথক্‌শ্রেণীভূত অম্বষ্ঠব্রাহ্মণের সত্ত্বা কুত্রাপি পরিলক্ষিত হয় না। তাঁহারা যে এক্ষণে ব্রাহ্মণজাতির মধ্যেই অন্তর্নিবিষ্ট ইহা আমরা নিম্নে প্রদর্শন করিতেছি। প্রাচীনকালে যখন বৈদ্যব্রাহ্মণের সংখ্যা নিতান্ত অল্প ছিল, তখন সংহিতাকার মুনিগণ ব্রাহ্মণের ক্ষত্রিয়া ও বৈশ্যাপত্নীজাত মূর্দ্ধাভিষিক্ত ও অম্বষ্ঠ ব্রাহ্মণদিগকে বৈদ্যবৃত্তিতে সাময়িক অধিকার প্রদান করিয়াছিলেন, ইহা উক্ত শব্দদ্বয়ের অর্থের প্রতি লক্ষ্য করিলেই বুঝা যায়। 'মূর্দ্ধাভিষিক্ত' শব্দের অর্থ সমাজের মস্তকে অভিষিক্ত অর্থাৎ রাজা এবং 'অম্বষ্ঠ' শব্দের অর্থ চিকিৎসক। এতদ্ভিন্ন, শাস্ত্রেও এ সম্বন্ধে উল্লেখ আছে। যথা—'ব্রাহ্মণ হইতে বৈশ্যাতে জাত অম্বষ্ঠ সংহিতাকার মুনিগণ কর্ত্তৃক ব্রাহ্মণাদি দ্বিজাতিগণের চিকিৎসার্থ নির্দ্দিষ্ট হইয়াছেন' (১১১) [বৃদ্ধ পরাশর—শব্দকল্পদ্রুম ধৃত] কিন্তু বৈদ্যগণই সর্ব্বলোকের উপর আধিপত্য বা রাজকার্য্যাদি প্রধান প্রধান ক্ষত্রকার্য্য এবং চিকিৎসা করিবার প্রকৃত অধিকারী, ইহা পূর্ব্বে প্রতিপাদিত হইয়াছে। সুতরাং শাস্ত্রকারগণ প্রয়োজন বশতঃ বৈদ্যেতর ব্রাহ্মণ-সম্প্রদায়ের মধ্যে বৈদ্যবৃত্তিতে সাময়িক অধিকার দিয়াছিলেন এবং তজ্জন্যই বৃত্তিভেদে উক্ত সম্প্রদায়ের মধ্যে ত্রিবিধ জাতি (জন্মগত) বিভাগ ঘটিয়াছিল। পরে বৈদ্যব্রাহ্মণের সংখ্যা বিশেষরূপে বর্দ্ধিত হইলে

এই মূর্দ্ধাভিষিক্ত ও অম্বষ্ঠ ব্রাহ্মণদিগের বৈশ্যবৃত্তিতে অধিকার রহিত হইল। এ কারণ মুখ্য ব্রাহ্মণ হইতে তাঁহাদের বৃত্তিগত বিশেষত্ব লুপ্ত হওয়ায় ব্রাহ্মণসম্প্রদায় হইতে তাঁহাদের স্বাতন্ত্র্যও বিলুপ্ত হয়। এরূপ না হইলে অন্যান্য জাতির ন্যায় মূর্দ্ধভিষিক্ত ও অম্বষ্ঠ ব্রাহ্মণদিগেব সত্ত্বা বর্ত্তমানকালেও অবশ্য দৃষ্ট হইত। মহর্ষি উশনা অম্বষ্ঠ-প্রসঙ্গে বলিয়াছেন—'ব্রাহ্মণ হইতে বৈশ্যাতে **বিধিপূর্ব্বক** জাত সন্তান অম্বষ্ঠ কথিত হয়। তাহাব জীবিকা কৃষিকার্য্য, পাচকতা, ধ্বজাধারী সৈন্যের কার্য্য এবং চিকিৎসা (১১২)। অতএব কৃষি, পাচকতা ও চিকিৎসা ইহাদিগেরই শাস্ত্রনির্দ্দিষ্ট বৃত্তি—মুখ্য ব্রাহ্মণদের বৃত্তি নহে। কিন্তু এক্ষণে ভারতে মুখ্য ব্রাহ্মণদেব মধ্যে এই বৃত্তিগুলি বহু পরিমাণে দৃষ্ট হয়। যথা—পশ্চিমে ভূমিহার ব্রাহ্মণগণ কৃষিজীবী; বিহার, উড়িষ্যা এবং বাঁকুড়ার বহু ব্রাহ্মণ পাচকতায় নিযুক্ত এবং বিহারেব মিশ্র ব্রাহ্মণগণ চিকিৎসাব্যবসায়ী। ইহাতে কি স্পষ্টই বুঝা যাইতেছে না যে, অম্বষ্ঠব্রাহ্মণগণ অধুনা মুখ্য ব্রাহ্মণদিগেরই কুক্ষিগত হইয়া বহিয়াছেন? পাচকতা মুখ্য ব্রাহ্মণদিগেব শাস্ত্রনির্দ্দিষ্ট বৃত্তি না হইলেও কিরূপে উহা তাঁহাদের জীবিকা মধ্যে পরিগণিত হইল? অম্বষ্ঠসংসর্গেই যে উহা হইয়াছে তাহাতে আর সন্দেহ কি? পক্ষান্তবে ইহাও দ্রষ্টব্য যে, বৈদ্যব্রাহ্মণদিগের মধ্যে কৃষি বা পাচকতাবৃত্তি কখনও প্রচলিত ছিল না, এখনও কুত্রাপি নাই। এ কারণ একমাত্র চিকিৎসাবৃত্তি-সাদৃশ্যে বৈদ্য ও অম্বষ্ঠব্রাহ্মণকে কখনই এক বলা যাইতে পারে না। যাহা হউক, এই আলোচনা দ্বারা ইহা স্পষ্ট বুঝা যাইতেছে যে, বঙ্গদেশে বৈদ্য ও বৈদিক ব্রাহ্মণগণই অন্যান্য ব্রাহ্মণ অপেক্ষা বিশুদ্ধ; যেহেতু তাঁহাদের অম্বষ্ঠসংসর্গ ঘটে নাই।

'কেহ কেহ বলেন, বৈদ্যকুলগ্রন্থকার মহামহোপাধ্যায় ভরত মল্লিক বৈদ্যকে অম্বষ্ঠজাতি বলিয়া স্বীকার করিয়া গিয়াছেন। ইহার উত্তরে বক্তব্য এই যে, 'চন্দ্রপ্রভা' নামক পুস্তক মুদ্রিত করিবার সময়ে নিশ্চয়ই কোন

ব্রহ্মবন্ধু তাহাতে 'বৈদ্যোৎপত্তি কথন' নামক অধ্যায়ের প্রারম্ভে শব্দকল্পদ্রুম-লিখিত বিদ্বেষকল্পিত, প্রমাণরহিত অদ্ভুত, অসংলগ্ন ও অসম্ভব পাঠ যোজনা করিয়াছেন। বস্তুতঃ "অম্বষ্ঠেষমৃতাচার্য্যঃ" ইত্যাদি হইতেই ঐ অধ্যায় আরম্ভ হইয়াছে, তৎপূর্ব্ববর্ত্তী সমস্ত পাঠই আধুনিক ও জাল। চন্দ্রপ্রভায় যে যে স্থলে 'অম্বষ্ঠ' শব্দের প্রয়োগ আছে, সেই সেই স্থলে তাহার অর্থ অম্বষ্ঠদেশীয় ব্রাহ্মণ বলিয়া বুঝিতে হইবে। যদি তর্কের খাতিরে ইহা স্বীকার করা যায় যে, ভরত মল্লিক বৈদ্যকে অম্বষ্ঠজাতি বলিয়াই সিদ্ধান্ত করিয়াছেন, তাহা হইলেও ইহা অবশ্য স্বীকার করিতে হইবে যে, তিনি বৈদ্যকে ব্রাহ্মণবর্ণান্তর্গত অম্বষ্ঠজাতি বলিয়াই সিদ্ধান্ত করিয়াছেন, মনূক্ত অপসদ অম্বষ্ঠ বলিয়া নহে। যেহেতু তিনি উড়িষ্যাবাসী বৈদিক ব্রাহ্মণের সহিত বৈদ্যদিগের বৈবাহিক আদান প্রদান স্বয়ং লিখিয়া গিয়াছেন। বৈদ্য একতর ব্রাহ্মণ না হইলে উক্ত প্রকার বিবাহ যে হইতেই পারে না ইহা সকলেই জানেন; আর ভরত মল্লিক ইহা জানিতেন না, ইহা মনে করা একেবারেই অসম্ভব।

এতদ্ভিন্ন, বৈদ্যজাতির স্বরূপ সম্বন্ধে ভরত মল্লিকের সিদ্ধান্ত প্রামাণ্য বলিয়া গৃহীত হইতে পারে না। কারণ তাঁহার সময়ে এবং তাঁহার প্রায় তিন চারি শত বৎসর পূর্ব্ব হইতে বঙ্গদেশে মূল স্মৃতির প্রচলন রহিত হইয়াছিল। সুতরাং প্রকৃত শাস্ত্রপ্রমাণ অভাবে তাঁহার বৈদ্যজাতির স্বরূপ সম্বন্ধে অভিজ্ঞতা লাভের উপায় ছিল না। বিশেষতঃ নিম্নলিখিত কয়েকটি কারণে তাঁহার পক্ষে প্রকৃত তত্ত্ব অবগত হওয়া প্রায়সঃ অসম্ভব হইয়াছিল। প্রথমতঃ, বৈদ্যরাজত্বের অবসানে বৈদ্যবিদ্বেষী ব্রাহ্মণগণ বৈদ্যকে হীনজাতি-রূপে প্রতিপন্ন করিবার অভিপ্রায়ে পুরাণাদির অনেক স্থলে মূল বচনের পরিবর্ত্তন ও লোপসাধন এবং কৃত্রিম বচন সন্নিবেশ প্রভৃতি দ্বারা জাতীয় তত্ত্বকে তমসাবৃত করিয়া রাখিয়াছিলেন (এই বিদ্বেষের কারণ পরে নির্দ্দেশ

করা হইবে)। **দ্বিতীয়তঃ** তাঁহার জীবিত কালের ন্যূনাধিক আড়াই শত বৎসর পূর্ব্বে গণেশের রাজ্যাধিকার সময়ে বৈদ্যদিগকে বলপূর্ব্বক বৈশ্যাচারে নিয়োজিত এবং তাঁহাদের উপর অম্বষ্ঠজাতিত্ব আরোপিত হইয়াছিল (এ বিষয়ও পরে বিবৃত হইবে)। সুতরাং তখন হইতে এ দেশে বৈদ্যেরা ব্রাহ্মণবর্ণ হইতে পৃথক্ অর্থাৎ অব্রাহ্মণরূপে পরিগণিত হইয়াছিলেন। **তৃতীয়তঃ**, ইহার এক শত বৎসর পূর্ব্বে স্মার্ত্ত রঘুনন্দন মিথিলা হইতে স্মৃতি পড়িয়া আসিয়া এ দেশে যাহা প্রচার করিয়াছিলেন, মূল স্মৃতি অভাবে তাহাই সাধারণ্যে বেদবাক্যের ন্যায় নির্ব্বিচারে গৃহীত হইয়াছিল। অথচ রঘুনন্দন বৈদ্যের প্রতি অবাধে শূদ্রত্ব বিধান করিয়াছিলেন, ইহা তাঁহার 'শুদ্ধিতত্ত্ব' হইতে জানা যায়। তবে উপরোক্ত গণেশের ন্যায় কোন রাজশক্তির সাহায্য না পাওয়ায় তাঁহার ঐ বিধান কার্য্যে পরিণত করা ঘটিয়া উঠে নাই; যেহেতু তাঁহার বিধান অনুসারে বৈদ্যেরা অদ্যাপি উপনয়ন-সংস্কার বর্জ্জিত হন নাই। মুল স্মৃতিগুলি যে আবার এ দেশে প্রচারিত হইবে এবং তাঁহার প্রদর্শিত যুক্তি ও প্রমাণের অসত্যতা ও অসারতা প্রকাশিত হইয়া পড়িবে,ইহা রঘুনন্দন ভাবিয়া উঠিতে পারেন নাই। যাহা হউক, ভরত মল্লিক যদি রঘুনন্দনের নব্যস্মৃতি ভিন্ন মূলস্মৃতির সাক্ষাৎ পাইতেন, তাহা হইলে তিনি যে মহামহোপাধ্যায় উপাধি ধারণ এবং চতুষ্পাঠীতে অধ্যাপনা করিতেন তাহাতে একমাত্র বিশুদ্ধ ব্রাহ্মণেরই অধিকার—কদাপি ব্রাহ্মণেতর জাতির নহে এবং বৈশ্যাচারী অম্বষ্ঠজাতি কদাচ বৈদ্য হইতে পারে না, ইহা তিনি অনায়াসেই জানিতে পারিতেন। পরন্তু ব্রাহ্মণ দিগের মধ্যে যে বৈদ্যগণই শ্রেষ্ঠ তাহাও তিনি নিঃসংশয়ে জানিতে পারিতেন।

তৃতীয় অধ্যায়।

১। বৈদ্যদিগের আংশিকভাবে ব্রাহ্মণাচার-চ্যুত হইবার কারণ।

(ক) **বৌদ্ধপ্রভাব**—আমরা বৈদ্যকুলপঞ্জিকা হইতে দেখাইয়াছি যে, বৈদ্যগণই দাক্ষিণাত্য হইতে বঙ্গে আগমন করিয়া হিন্দুরাজত্বের ভিত্তি স্থাপন করেন। তখন হইতে ক্রমে বৌদ্ধরাজত্বের অবসান হয়। মহারাজ লক্ষ্মীনারায়ণ সেন প্রথমে বৌদ্ধদিগকে জয় করেন বলিয়া তিনি আদিশূর নামে খ্যাত হন। তিনি বঙ্গে আসিয়া গণনা করিয়া দেখিলেন যে, তৎকালে সমগ্র বঙ্গে সাত শত ব্রাহ্মণের বাস ছিল এবং তাঁহারা সকলেই সম্পূর্ণরূপে আচারভ্রষ্ট। তখন বঙ্গদেশে যাজ্ঞিক ব্রাহ্মণ না থাকায় তিনি ব্রাহ্মণ্যধর্ম্মের পুনঃ প্রচলন জন্য কান্যকুব্জ হইতে পঞ্চ যাজ্ঞিক ব্রাহ্মণ আনয়ন করেন এবং এই সাত শত ব্রাহ্মণকে ব্রাহ্মণ্যধর্ম্মে প্রবর্ত্তিত করিয়া 'সপ্তশতী' আখ্যা প্রদান করেন। এইরূপে দেখা যায় যে, বৈদ্যরাজগণই বঙ্গদেশে ব্রাহ্মণ্যধর্ম্ম প্রতিষ্ঠার একমাত্র হেতু। কান্যকুব্জ হইতে পঞ্চ বিপ্র আসিবার পূর্ব্বে বঙ্গে বৈদ্যব্রাহ্মণেরাই একমাত্র বিশুদ্ধ ব্রাহ্মণ ছিলেন। কিন্তু তাহা হইলেও পরবর্ত্তীকালে ময়মনসিংহ, চট্টগ্রাম, ত্রিপুরা, কুমিল্লা, নোয়াখালি প্রভৃতি স্থানের বৈদ্যেরা ঐ সকল স্থানে বৌদ্ধদিগের সঞ্চারাধিক্য হেতু এবং বিদ্যাবত্তা ও চিকিৎসার জন্য বৌদ্ধগণ কর্ত্তৃক বিশেষভাবে সম্মানিত ও সমাদৃত হওয়ায়, তাহাদের সংসর্গে বৌদ্ধভাবাপন্ন ও সংস্কারাদি-বর্জ্জিত হইয়া পড়িয়াছিলেন। এ নিমিত্ত পরে বৈদ্যরাজগণ কর্ত্তৃক বৌদ্ধদিগের তিরোভাব এবং হিন্দুধর্ম্মের বিস্তার হইলে ইহাঁরা

শূদ্রবৎ মাসাশৌচী হয়েন। এইরূপে ইঁহারা উপনয়ন সংস্কাররহিত ও মাসাশৌচী হইয়া পড়িলেও, অদ্যাবধি ইহাঁদের মধ্যে ব্রাহ্মণোচিত অধ্যয়ন অধ্যাপনা চলিয়া আসিতেছে। সুতরাং ইহাঁদিগকে সম্যক্-রূপে আচারভ্রষ্ট বলা যাইতে পারে না। ইঁহাদের দৃষ্টান্তে অনেকে বলিয়া থাকেন যে, বৈদ্যেরা সকলেই বৌদ্ধভাবাপন্ন হইয়াছিলেন, সেজন্য ব্রাহ্মণ্যধর্ম্মের পুনঃ প্রতিষ্ঠার সময়ে তাঁহারা আর ব্রাহ্মণজাতির মধ্যে স্থান প্রাপ্ত হন নাই এবং তদবধি তাঁহারা সমাজে নূতন জাতিরূপে পরিগণিত হইয়াছেন। যে বৈদ্য বঙ্গদেশকে বৌদ্ধপ্লাবন হইতে রক্ষা করিয়া ব্রাহ্মণ্য ধর্ম্মের সম্যক্ প্রতিষ্ঠা সাধন করেন, সেই বৈদ্যের প্রতি এরূপ অপবাদ আরোপ করা অতীব বিচিত্র নহে কি? তাঁহাদিগকে অহিন্দু বা জাতিহীন বলিয়া বিদ্রূপ করা ঘোরতর মিথ্যাচার নহে কি? বাঢে বৈদ্যেরা বহু স্থানেই চিরাচরিত ব্রাহ্মণাচার রক্ষা করিয়া আসিতেছিলেন—ইহা দেড় শত বৎসর পূর্ব্বেও মহারাজ রাজবল্লভ প্রত্যক্ষ করিয়া পূর্ব্ব বঙ্গে কিঞ্চিৎ আচারভ্রষ্ট স্বশ্রেণীর বৈদ্যদিগের মধ্যে সদাচার প্রবর্ত্তনের চেষ্টা করেন। এতদ্দ্বারা সদাচার বা ব্রাহ্মণ্যধর্ম্ম নিষ্ঠা যে বৈদ্যদিগের অস্থিমজ্জাগত তাহা মহারাজ আদিশূরের সময় হইতেই তাহার পরিচয় পাওয়া যাইতেছে। বৈদ্যেরা চিরকালই সদাচার প্রবর্ত্তনের জন্য প্রাণপণ যত্ন করিয়া আসিতেছেন। বিশেষতঃ, গুরুবৃত্তি, অধ্যাপনা প্রভৃতি ব্রাহ্মণোচিত বৃত্তি বৈদ্যদিগের মধ্যে অদ্যাপি প্রচলিত রহিয়াছে। অতএব বৈদ্যমাত্রেই বৌদ্ধসংস্রবে আচার ভ্রষ্ট হইয়াছিলেন, এ কথা নিতান্ত অশ্রদ্ধেয়।

(খ) **মুসলমানদিগের অত্যাচার।** মুসলমানেরা পূর্ব্ববঙ্গ জয় করিয়া তত্রস্থ রাজপরিবার এবং অমাত্যদিগের অধিকাংশ বিনাশ সাধন করে এবং রাজার আত্মীয় ও স্বজাতির উপর অত্যাচার করিতে থাকে। বৈদ্যবিদ্বেষিগণ এ বিষয়ে মুসলমানদিগের সাহায্য করিতেও ক্রটি

করেন নাই। এ কারণ পূর্ব্ব বঙ্গের—বিশেষতঃ বিক্রমপুর অঞ্চলের বৈদ্যগণ পৈতা ফেলিয়া স্বীয় জাতি ও নাম গোপন রাখিয়া শূদ্রবৎ অবস্থান করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। পরে বৈদ্যরাজা রাজবল্লভ পশ্চিম বঙ্গের দৃষ্টান্তে এই ব্রাত্য বৈদ্যদিগকে কতকাংশে প্রায়শ্চিত্ত করাইয়া উপবীত ও পঞ্চদশাহ অশৌচ গ্রহণ করাইয়াছিলেন। ইঁহাদের মধ্যেও অধ্যয়ন, অধ্যাপনা অপরাপর ব্রাহ্মণের ন্যায় সমভাবেই প্রচলিত রহিয়াছে। অতএব ব্রাহ্মণের প্রধান আচার পালন করায় প্রকৃতপ্রস্তাবে তাঁহারা ব্রাহ্মণত্ব হইতে স্খলিত হন নাই। এক্ষণে তাঁহারা দশাশৌচাদি ব্রাহ্মণাচার নিরত হইলে, তাঁহাদের ব্রাহ্মণত্ববিষয়ে আর কোন প্রশ্নই উত্থাপিত হইতে পারিবে না।

(গ) **রাজা গণেশের আজ্ঞাপত্র।** এ ত গেল পূর্ব্ববঙ্গের কথা। পশ্চিম বঙ্গ বা রাঢদেশীয় বৈদ্যদিগের পঞ্চদশাহ অশৌচ গ্রহণের প্রধাণ কারণ রাজা গণেশের আজ্ঞাপত্র। পাঁচ শত বৎসরের কিঞ্চিৎ অধিক-কাল পূর্ব্বে দিনাজপুরের এক ব্রাহ্মণ জমিদার গণেশ অসৎ উপায়ে গৌড়ের সিংহাসন অধিকার করিয়া সাত বৎসরকাল মাত্র রাজত্ব করেন। এই সুযোগে বৈদ্যবিদ্বেষী যাজক ব্রাহ্মণগণ সমবেত হইয়া বৈদ্যদিগের বিরুদ্ধে এক আবেদন পত্র দাখিল করেন এবং রাজা গণেশের দ্বারা বৈদ্যদিগকে বৈশ্যাচার পালনে বাধ্য করেন। এইরূপে এতদ্দেশীয় বৈদ্যদিগের বৈশ্যোচিত পঞ্চদশাহ অশৌচগ্রহণের সূত্রপাত ঘটিয়াছিল। যাহাহউক, ব্রাহ্মণদিগের আবেদন পত্র ও রাজা গণেশের আজ্ঞাপত্র Colbrook's History of the Rituals of Bengal নামক পুস্তকে এইরূপ বিবৃত আছে; যথা—

<u>আবেদন পত্র</u>—ব্রহ্মচর্য্যাশ্রমে বেদবেদাঙ্গাদি শাস্ত্রসমূহ অধ্যয়ন না করায় যাজনাদি ষট্ কর্ম্মে ইহাদের অধিকার নাই। চতুর্ব্বেদোক্ত ক্রিয়া-সমূহের মধ্যে হীনতমা চিকিৎসা ইহাদের বৃত্তি—ষট্ কর্ম্ম নহে।

যেহেতু শাস্ত্রে উক্ত হইয়াছে—'অম্বষ্ঠদিগের বৃত্তি চিকিৎসা।' শাস্ত্রে ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্রজাতিদিগের কন্যাসকলে জাত পুত্রেরা আপনাপন পিতৃসংসর্গে অবস্থান করিলে তাহাদের পৈতৃক জন্মমরণাশৌচ হইবে, কিন্তু বিভক্ত হইলে মাতৃকুলের অশৌচভাগী হইবে ইহা বিহিত হইয়াছে। সুতরাং ইহারা যখন পিতৃসংসর্গত্যাগী এবং আচারভ্রষ্ট তখন ইহারা মাতৃকুলাশৌচ-ভাগী হইবে এবং ষট্ কর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া চিকিৎসা-বৃত্তি দ্বারাই জীবিকা নির্ব্বাহ করিবে, আর পরিবার পোষণের জন্য বৈশ্যবৃত্তি অবলম্বন করিবে।'

<u>আজ্ঞাপত্র</u>—"সত্য, ত্রেতা ও দ্বাপর যুগে বৈদ্যগণ তপোজ্ঞানবিশিষ্ট ও বিদ্বান্ ছিলেন, সম্প্রতি ইঁহারা শক্তিহীন ও আচারভ্রষ্ট হইয়াছেন। এজন্য **ব্রাহ্মণগণের অনুরোধে** শ্রীমন্মহারাজাধিরাজ গণেশ চন্দ্র নৃপতির আজ্ঞায় অম্বষ্ঠগণ **অদ্য হইতে** বৈশ্যাচারী হইবেন এবং মুখ্য ব্রাহ্মণেরা অম্বষ্ঠ (ব্রাহ্মণ) দিগের সহিত ভোজনাদি করিবেন না। যে সকল ব্রাহ্মণ ইহাদের সহিত ভোজনাদি করিবেন তাঁহারা পতিত হইবেন" (১১৩)।

ইহার পূর্ব্বে বৈদ্যেরা যে ব্রাহ্মণাচারী ছিলেন এবং তৎকালে তাঁহারা ব্রাহ্মণ-সম্প্রদায়ের মধ্যে শ্রেষ্ঠ বিদ্বান্ জাতি বলিয়া পরিচিত হইতেন তাহা এই আবেদন এবং অনুজ্ঞাপত্র হইতেও স্পষ্ট জানা যাইতেছে।

(ঘ) **বৈদ্যের প্রতি ব্রাহ্মণ-সম্প্রদায়ের বিদ্বেষ**—আমরা পূর্ব্বে মনুসংহিতা ও মহাভারত হইতে ইহা উদ্ধৃত করিয়াছি যে, 'নরগণের মধ্যে ব্রাহ্মণগণ শ্রেষ্ঠ, ব্রাহ্মণদিগের মধ্যে বৈদ্যগণ শ্রেষ্ঠ, বৈদ্যগণের মধ্যে কৃতবুদ্ধি, কৃতবুদ্ধিদিগের মধ্যে কর্ত্তা ও কর্ত্তাগণের মধ্যে ব্রহ্মজ্ঞগণ শ্রেষ্ঠ'। 'নরগণের মধ্যে ব্রাহ্মণগণ শ্রেষ্ঠ বলিলে যেমন নরাতিরিক্ত ব্রাহ্মণ বুঝাইতে পারে না, তদ্রূপ 'ব্রাহ্মণগণের মধ্যে বৈদ্যগণ শ্রেষ্ঠ' বলাতে এই বৈদ্য যে ব্রাহ্মণাতিরিক্ত হইতে পারে না, ইহাই বুঝিতে

হইবে। এইরূপ 'বৈদ্যগণের মধ্যে যথাক্রমে কৃতবুদ্ধি, কর্ত্তা ও ব্রহ্মজ্ঞগণ শ্রেষ্ঠ' এই উক্তিতে বৈদ্য না হইয়া কেহ ব্রহ্মজ্ঞ হইতে পারে না— ইহা বুঝাইয়াছে। মনু ও ব্যাসের ঈদৃশ অভিপ্রায় না থাকিলে তাঁহারা 'বৈদ্যদিগের **মধ্যে**' [বৈদ্যেষু] না বলিয়া 'বৈদ্যদিগের অপেক্ষা' [বৈদ্যেভ্যঃ] এইরূপ বলিতেন। অতএব এই বাক্যানুসারে ব্রহ্মজ্ঞ ঋষি মাত্রকেই বৈদ্য বলিতে হয়। আবার চরক-সংহিতায় লিখিত আছে যে, পৃথিবীতে রোগসকল প্রাদুর্ভূত হইলে মানবগণের তপস্যা, ব্রত, অধ্যয়নাদির বিঘ্ন হইতে লাগিল দেখিয়া অঙ্গিরা, জমদগ্নি, বশিষ্ঠ, কশ্যপ, ভৃগু, আত্রেয়, গৌতম, মার্কণ্ডেয়, ভরদ্বাজ, বিশ্বামিত্র, অগস্ত, শাণ্ডিল্য প্রভৃতি মহর্ষিগণ সমবেত হইয়া ভরদ্বাজকে ইন্দ্রের নিকট আয়ুর্ব্বেদ শিক্ষার্থ প্রেরণ করিলেন এবং ভরদ্বাজ উহা শিক্ষা করিয়া আসিয়া লোকসকলের উপকারার্থ ঐ সকল ঋষিদিগকেও শিখাইলেন। আত্রেয় আবার, অগ্নিবেশ, পরাশর, হারীত প্রভৃতিকে শিখাইলেন। ইহাতে বুঝা যায় যে, তৎকালে লোকানুগ্রহার্থ আয়ুর্ব্বেদ শিক্ষা করা ঋষিদিগের অবশ্য কর্ত্তব্য হইয়াছিল, নতুবা তাঁহারা উহা শিক্ষা করিতে যাইবেন কেন? এতদ্দ্বারা সপ্রমাণ হইল যে, তৎকালে সকল ঋষিই চিকিৎসক বৈদ্য হইয়াছিলেন এবং পরে যাঁহারা ঋষি নামে অভিহিত হইতেন তাঁহাদিগকে অগ্রে আয়ুর্ব্বেদ বিদ্যা লাভ করিয়া বৈদ্য হইতে হইত ও লোকহিতার্থ চিকিৎসা করিতে হইত। বৈদ্য না হইয়া কেহ ঋষি পদবাচ্য হইতে পারিতেন না বলিয়াই মহাভারতকার 'বৈদ্যদিগের মধ্যে ব্রহ্মজ্ঞগণ শ্রেষ্ঠ' ইহা কহিয়াছিলেন। এজন্য যে সকল ঋষি গোত্রকার মুনি নামে প্রসিদ্ধ, তাঁহারা যে এই বৈদ্য ঋষিদিগেরই অন্যতম ইহা বুঝা যায়। অতএব বৈদ্য ও ব্রাহ্মণ উভয়েই বৈদ্যঋষিদিগের সন্তান হওয়ায় প্রথমে বৈদ্যবৃত্তিতে সমান অধিকারী ছিলেন। কিন্তু তাঁহাদের মধ্যে যাঁহারা ব্রহ্মচর্য্যাশ্রমে আয়ুর্ব্বেদ পর্য্যন্ত সর্ব্ববেদ সমাপন

পূর্ব্বক সর্ব্বোচ্চ বৈদ্যবৃত্তি অবলম্বন করিতেন তাঁহারাই বৈদ্য (বিশিষ্ট ব্রাহ্মণ) নামে এবং যাঁহারা তাহাতে অসমর্থ হইয়া তদপেক্ষা নিকৃষ্ট যাজনাদি বৃত্তি অবলম্বন করিতেন তাঁহারা (সাধারণ) ব্রাহ্মণ নামে অভিহিত হইতেন। পরে ঋষিগণ মহর্ষি চরকাদির ব্যবস্থানুসারে চিকিৎসাবৃত্তিকে এই বৈদ্যব্রাহ্মণ দিগেরই বংশ মধ্যে নিবদ্ধ করিয়া দিলেন ; যেহেতু চরকাদি ভিষগাচার্য্যকে যথাবিধি আয়ুর্ব্বেদ অধ্যয়নে আয়ুর্ব্বেদবিদ্য-কুলজ অর্থাৎ বৈদ্যকুলে জাত এবং আয়ুর্ব্বেদবিদ্যাবৃত্তকেই শিষ্য করিবার বিধান দিয়াছেন। তদবধি যাজক ব্রাহ্মণ-বংশীয়গণ উক্ত শ্রেষ্ঠ অধিকার হইতে সম্পূর্ণরূপে বঞ্চিত হইয়া চিরকালের নিমিত্ত বৈদ্য অপেক্ষা নিকৃষ্ট হইয়া পড়িলেন। ইহাই যাজক ব্রাহ্মণদিগের বৈদ্যবিদ্বেষের মূল কারণ।

সেই সময় হইতে বহুকাল ধরিয়া বৈদ্যব্রাহ্মণগণ বিদ্যাবত্তা, জ্ঞানবত্তা সদাচারনিষ্ঠা ও প্রভাব বলাদির আধিক্য বশতঃ সমাজে যাজক ব্রাহ্মণদিগের অপেক্ষা প্রভূত সম্মান লাভ করিয়া, রাজকার্য্যাদির পরিচালন ও সমাজশাসন জন্য এই ব্রাহ্মণদিগের উপর যথেষ্ট প্রভুত্বও করিতে লাগিলেন। এ কারণ যাজক ব্রাহ্মণেরা বৈদ্যব্রাহ্মণদের প্রতি অন্তরে অন্তরে একটা ঈর্ষাভাব পোষণ করিতেছিলেন। পরে মহারাজ বল্লাল সেন কর্তৃক কদাচারী ব্রাহ্মণ-দিগের নির্ব্বাসন-দণ্ড প্রভৃতি ব্যাপারে যাঁহাদের মর্য্যাদাহানি ঘটিয়াছিল, তাঁহাদের ঈর্ষাভাব শত্রুত্বে পরিণত হইল। সুতরাং বৈদ্যরাজত্বের অবসানে তাঁহারা অবসর বুঝিয়া বৈদ্যদিগের শত্রুতাসাধনে বদ্ধপরিকর হন। ইহাই রাজা গণেশের নিকট আবেদন-পত্র দাখিল করিবার কারণ। কিন্তু সাধারণ যাজক ব্রাহ্মণদিগের অনুরোধে গণেশ কর্তৃক বৈদ্যদিগের মধ্যে বৈশ্যাচার প্রবর্ত্তিত হইলেও, উহা জ্ঞানবান্ সদ্‌ব্রাহ্মণদিগের অনুমোদিত ছিল না এবং ইঁহারা বৈদ্যদিগকে চিরকালই শ্রদ্ধার চক্ষে দেখিতেন। ইঁহাদেরই সহায়তায় গণেশের স্বল্পকাল রাজত্বের পর বৈদ্যেরা আবার ষট্‌কর্ম্ম

অবলম্বন করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। ইহাঁদের সত্যনিষ্ঠা এবং উদারতা প্রভাবেই বৈদ্যদিগের মধ্যে গুরুবৃত্তি, অধ্যাপনা প্রভৃতি উৎকৃষ্ট ব্রাহ্মণবৃত্তি অদ্যাপি দেখিতে পাওয়া যাইতেছে। সুতরাং গায়ের জোর ভিন্ন ন্যায়-বিচারে এই সকল প্রত্যক্ষ প্রমাণের বিরুদ্ধে কখনই বৈদ্যদিগের উপর বৈশ্যত্ব আরোপ করা চলে না। যাহা হউক, বৈদ্যবিদ্বেষী অসৎ ব্রাহ্মণগণ বৈদ্যরাজত্বাবসানের সঙ্গে সঙ্গেই ধর্ম্মশাস্ত্রসমূহের অপব্যাখ্যা, পুরাণাদিতে বৈদ্যকুৎসার উদ্দেশ্যে মূর্খতাপূর্ণ শ্লোকসন্নিবেশ, শাস্ত্রবচনের পরিবর্ত্তন ও লোপসাধন প্রভৃতি বহু ঘৃণিত কার্য্য করিয়া রাখিয়াছেন। বৈদ্যরাজা আদিশূর যে পঞ্চ যাজ্ঞিক ব্রাহ্মণকে এ দেশে আনাইয়া সম্মানিত ও গুরু পুরোহিতদিগের আসন প্রদান করিয়াছিলেন বৈদ্যগণ তদ্বংশীয়দিগের উপর স্মৃতিশাস্ত্র অভাবে কতকটা বাধ্য হইয়া এবং অনেকটা কর্ত্তব্যজ্ঞানে স্বতঃ প্রণোদিত হইয়া সম্যক্‌রূপে বিশ্বাস স্থাপন করিয়াছিলেন। এই সূত্র অবলম্বন করিয়াই বৈদ্যবিদ্বেষী ব্রাহ্মণগণ বৈদ্যদিগের উপর অম্বষ্ঠত্ব ও বৈশ্যত্ব আরোপ করিতে এবং বৈদ্যদিগকে ব্রাহ্মণাচার হইতে ভ্রষ্ট করিয়া তাঁহাদের মধ্যে বৈশ্যাচার প্রবেশ করাইতে সহজে সক্ষম হইয়াছিলেন। এখনকার স্মার্ত্ত পণ্ডিতগণ বৈদ্যদিগের ব্রাহ্মণত্বের ভূরি ভূরি নিদর্শন থাকা সত্ত্বেও প্রাচীন কুপণ্ডিতদিগের কুব্যাখ্যাদি প্রভাবে অন্ধীভূত হইয়া বৈদ্যকে বৈশ্য বা বর্ণসঙ্কর জ্ঞান করিয়া থাকেন এবং মূর্খ পুরোহিতগণ এই সকল ভ্রান্ত স্মার্ত্তপণ্ডিতদিগের অনুবর্ত্তী হইয়া বৈদ্যদিগের মধ্যে বৈশ্যাচার ও শূদ্রাচার প্রবর্ত্তিত করিতেছেন। অতএব বুঝা যাইতেছে যে, ব্রাহ্মণসাধারণের বৈদ্যবিদ্বেষই বৈদ্যদিগের এইরূপ মর্য্যাদাহানি ঘটিবার প্রধান কারণ—এক্ষণে উহা একমাত্র কারণ বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। তবে নিম্নলিখিত তিনটী বিষয় তাঁহাদের বিদ্বেষবহ্নি চরিতার্থ করিবার পক্ষে বিশেষ সহায় হইয়াছিল।

যথা—

(ক) বৈদ্যরাজত্বের অবসান

(খ) বৈদ্যের মুষ্টিমেয় সংখ্যা এবং

(গ) বৈদ্যের মর্য্যাদাহানি ঘটায় তাঁহাদের ধর্ম্মকর্ম্মে ও শাস্ত্রচর্চ্চায় বীতরাগ।

বৈদ্যরাজত্ব শেষ হইলে পর বৈদ্যগণ—রাজশক্তি-সহায়ে ব্রাহ্মণগণ কর্তৃক অবনমিত হইলে ব্রাহ্মণ্যধর্ম্মের প্রতি অতিশয় বীতশ্রদ্ধ হন। তৎকারণে ব্রাহ্মণগণ তাঁহাদিগকে অবৈধরূপে বৈশ্যাচার অথবা শূদ্রাচারে ক্রিয়াকর্ম্ম করাইলেও তাঁহারা কোনরূপ আপত্তিই করিতেন না। এইরূপে বৈদ্যদিগের মধ্যে বৈশ্যাচার এবং শূদ্রাচারও বহু পরিমাণে প্রবেশ লাভ করিয়াছে। যদিও এক্ষণে অল্পসংখ্যক বৈদ্য লুপ্ত মর্য্যাদার পুনরুদ্ধারের চেষ্টা করিতেছেন, তথাপি অধিকাংশ বৈদ্য উপরোক্ত কারণে অদ্যাবধি উদাসীন থাকায় এবং বৈদ্যের সংখ্যাও নিতান্ত পরিমিত হওয়ায়, তাঁহারা সহজে কৃতকার্য্য হইতে পারিতেছেন না।

এক্ষণে ব্রাহ্মণ সম্প্রদায়ের মধ্যে বৈদ্যবিদ্বেষ এতই প্রবল দেখা যায় যে, অনেকে বৈদ্যদিগের প্রদর্শিত প্রমাণ ও যুক্তির বিরুদ্ধে কোন কথা বলিতে না পারিয়া এবং ব্রাহ্মণদিগের মধ্যে বৈদ্যদিগের শ্রেষ্ঠত্ব এবং সর্ব্বলোক-পূজ্যত্ব স্বীকার করিয়াও ইহা বলিয়া থাকেন যে, এই বৈদ্যেরা সেই বৈদ্য নহে। ইহার উত্তরে জিজ্ঞাস্য এই যে, ঋগ্বেদে যে চিকিৎসক ব্রাহ্মণের কথা উক্ত হইয়াছে এবং চরকাদি যে, বংশানুক্রমিক চিকিৎসক হইবার ব্যবস্থা করিয়াছেন—পুরাকালের সেই চিকিৎসাধিকারী জাতিবৈদ্য এখন কোথায়? সেই বৈদ্যবংশ যে এক্ষণে বিলুপ্ত হইয়া গিয়াছে তাহার প্রমাণ কেহ দিতে পারেন কি? আর এই বৈদ্য যদি সেই বৈদ্য না হন, তবে ইহারা কোন্ বৈদ্য? ইহারা কি ভূঁইফোড় জাতি হঠাৎ উৎপন্ন হইলেন? এই বৈদ্যদিগকেই যখন পুরুষানুক্রমে চিকিৎসাধিকারী দেখা যাইতেছে

এবং ইঁহারা যখন জাতিবৈদ্য নামেই প্রসিদ্ধ, তখন এই বৈদ্যকেই সেই বৈদ্য বলা ভিন্ন গত্যন্তর নাই। আমরা পূর্ব্বে সপ্রমাণ করিয়াছি যে ব্রাহ্মণবর্ণান্তর্গত বৈদ্যজাতি ভিন্ন অন্য জাতিসকল সামান্যতঃ চিকিৎসা করিতে পারিলেও কেহ প্রকৃত চিকিৎসক বা জাতিবৈদ্য নামে অভিহিত হইতে পারিতেন না। আরও আধুনিক বৈদ্যদিগের ব্রাহ্মণোচিত উপনয়ন, অধ্যাপনা, গুরুবৃত্তি, প্রতিগ্রহ, ব্রাহ্মণোচিত উপাধি ধারণ প্রভৃতি ব্যবহারে এবং লোকপ্রসিদ্ধি অনুসারেও এই বৈদ্যদিগকে ব্রাহ্মণবর্ণান্তর্গত বিশুদ্ধ জাতি বলিয়া নিঃসংশয়ে প্রতিপন্ন হয়। ইঁহারা বিশুদ্ধ বৈদ্যজাতি বলিয়াই অদ্যাপি বৃদ্ধ-বৃদ্ধাদের নিকট অন্তিমকালে ইঁহাদের ঔষধসেবন স্বর্গফলপ্রদ বলিয়া বিবেচিত হয়। পক্ষান্তরে ইঁহারা যে অম্বষ্ঠজাতীয় হইতেই পারেন না তাহাও আমরা অখণ্ডনীয় যুক্তি দ্বারা সপ্রমাণ করিয়াছি। অতএব যাঁহারা বলেন এই বৈদ্যেরা পুরাকালের সেই বৈদ্য নহেন, তাঁহাদের উক্তিকে গায়ের জোর ভিন্ন আর কিছুই বলা যায় না। বৈদ্যবিদ্বেষী ব্রাহ্মণগণ যদি গায়ের জোরে ইদানীন্তন বৈদ্যদিগকে পুরাকালের বৈদ্য হইতে পৃথক্ এবং বর্ণসঙ্কর প্রভৃতি বলেন, তবে বৈদ্যেরাও তাঁহাদিগকে সেই প্রাচীন কালের বিশুদ্ধ ব্রাহ্মণ হইতে স্বতন্ত্র কুণ্ড গোলকাদি জারজ ব্রাহ্মণ বলিয়া নির্দ্দেশ করিতে পারেন, ইহা তাঁহাদের স্মরণ রাখা কর্ত্তব্য।

২। ভারতে বৈদ্যজাতির সংখ্যা এত অল্প কেন?

(ক) আমরা পূর্ব্বে উল্লেখ করিয়াছি যে, বৈদ্যগণ অম্বষ্ঠদেশ হইতে বাহির হইয়া ভারতের সর্ব্বস্থানেই উপনিবেশ স্থাপন করেন। কিন্তু বঙ্গদেশ ভিন্ন সর্ব্বত্রই তাঁহারা তত্তৎ স্থানীয় ব্রাহ্মণদিগের সহিত মিশিয়া গিয়াছেন। সে সকল স্থলে তাঁহারা জাতিতে বৈদ্য বলিয়া পরিচয় না দিয়া ব্রাহ্মণ বলিয়া পরিচয় দিয়া থাকেন।

(খ) পূর্ব্ব বঙ্গে ময়মনসিংহ, ত্রিপুরা চট্টলাদি স্থানের অনেক বৈশ্য বৌদ্ধসংস্রবে আচারভ্রষ্ট হইয়া এবং পুনঃ পুনঃ কায়স্থদিগের সহিত আদান প্রদান করিয়া এক্ষণে কায়স্থ মধ্যে পরিগণিত হইয়াছেন; সুতরাং বৈদ্যের সংখ্যাগণনায় তাঁহারা বাদ পড়িয়া গিয়াছেন।

(গ) মহারাজ বল্লাল সেনের কৌলীন্য প্রথার উদ্দেশ্য মহৎ হইলেও অপাত্রে পড়িয়া উহা অনেক স্থলে বিষময় ফল প্রসব করিয়াছে। ঐ প্রথা প্রবর্ত্তনের ফলে যে সকল ব্রাহ্মণ অবমানিত হইয়া বৈদ্যদিগের উপর ঘোরতর বিদ্বেষভাবাপন্ন হইয়াছিলেন, তাঁহারা বৈদ্যদিগের আদি বাসস্থানজ্ঞাপক এবং চিকিৎসামূলক 'অম্বষ্ঠ' নাম অবলম্বন পূর্ব্বক তাহাদিগকে মনূক্ত অম্বষ্ঠজাতিরূপে পরিগণিত করিয়া, বর্ণসঙ্কর বলিয়া খ্যাপন করিতে লাগিলেন এবং সঙ্গে সঙ্গে কায়স্থদিগকে সৎজাতি বলিয়া ঘোষণা করিতে লাগিলেন সেই হেতু অনেক বৈদ্য মূর্খতাবশতঃ আপনাদের সঙ্কর.নাম স্খালন করিবার এবং সৎজাতি বলিয়া পরিচিত হইবার অভিপ্রায়ে বৈদ্যনাম পরিত্যাগ পূর্ব্বক কায়স্থনামে পরিচয় দেওয়াই শ্রেয়ঃ বিবেচনা করিয়াছিলেন। এ নিমিত্ত পূর্ব্ব বঙ্গের অনেক বৈদ্যকে কায়স্থনামধারী দেখিতে পাওয়া যায়।

(ঘ) আবার ঐ কৌলীন্য প্রথারই ফলে ব্রাহ্মণগণের ন্যায় অনেক বৈদ্যও হীনমর্য্যাদ ও অবমানিত হইয়াছিলেন। তাহার উপর কুলীন বৈদ্যগণ ইঁহাদিগকে হীন এবং বৈদ্যনামের অযোগ্য বলিয়া কটাক্ষ করিতেন। যেমন এ দেশে বৈদ্যদিগের মধ্যে প্রবাদ আছে—"দে, দত্ত, কর, ধর, ঝাঁটা মেরে দূর কর" ইত্যাদি। এজন্য এই সকল বংশীয় বৈদ্যগণ কুলীন বৈদ্যদিগের নিকট অযথা অবমানিত ও লাঞ্ছিত হওয়ায় তাঁহাদের মধ্যে অনেকে কায়স্থ প্রভৃতি শূদ্রজাতির অন্তর্ভূত হইয়াছেন।

(ঙ) বৈদ্যগণ রাজা গণেশের শাসনে বৈশ্যাচার গ্রহণে বাধ্য হইলে,

যাজক ব্রাহ্মণদিগের অত্যাচারে বহু বৈদ্য হিন্দুধর্ম্মের প্রতি বীতশ্রদ্ধ হইয়া খৃষ্টান, ব্রাহ্ম প্রভৃতি ধর্ম্মান্তর গ্রহণ করিয়াছেন।

এই সকল কারণে বৈদ্যদিগের সংখ্যা নিতান্ত মুষ্টিমেয় হইয়া পড়িয়াছে। কিন্তু সমগ্র ভারতে বৈদ্যবংশজাত অথচ ব্রাহ্মণ কায়স্থাদি নামে পরিচিত ব্যক্তিদিগকে বৈদ্যদিগের সহিত একত্র গণনা করিলে তাহাদের সংখ্যাই অন্যান্য জাতি অপেক্ষা অধিক হইয়া পড়ে।

অধুনা বৈদ্যগণ এই সংখ্যার অল্পতা নিবন্ধন বর্ত্তমান সামাজিক সঙ্ঘর্ষে আত্মরক্ষা করিতে অসমর্থ হইতেছেন। সুতরাং আমাদের মনে হয় যে, এ সময়ে বৈদ্যনামে পরিচিত ব্যক্তিমাত্রেরই একবিধ আচার-সম্পন্ন হইয়া সম্যক্‌প্রকারে মিলিত হইবার চেষ্টা করা উচিত—নতুবা গত্যন্তর নাই। এই হেতু আমরা এক্ষণে তদ্বিষয়ক কর্ত্তব্যের আলোচনায় প্রবৃত্ত হইতেছি।

চতুর্থ অধ্যায়।

বৈদ্যের কর্ত্তব্য।

বৈদ্য যখন স্বরূপতঃ ব্রাহ্মণবর্ণ বলিয়া বুঝা গেল, তখন সর্ব্বপ্রকারে ব্রাহ্মণাচার সম্পন্ন হওয়াই তাঁহাদের কর্ত্তব্য। ইহা করিতে হইলে তাঁহাদের মধ্যে যে কতকগুলি কদাচার প্রবেশ করিয়াছে প্রথমে সেগুলি দূর করিতে হইবে।

১। কদাচার বর্জ্জন।

১ম কদাচার গুপ্তান্ত উপাধি ধারণ। যথা—সেনগুপ্ত, দাশগুপ্ত, দত্তগুপ্ত, গুপ্তগুপ্ত প্রভৃতি। সুকুল কুলগ্রন্থেই সেন, দাশ, গুপ্ত, ধর, কর প্রভৃতি বীজী পুরুষদিগের নাম আছে এবং সেন কুল, দাশ কুল, গুপ্ত কুল প্রভৃতি সম্পূর্ণ পৃথক্‌রূপে বর্ণিত হইয়াছে। সেন বা দাশ কখন গুপ্ত হইতে পারে না এবং বৈশ্যত্ব-পরিচায়ক গুপ্ত উপাধিও ব্রাহ্মণের ব্যবহার্য্য নহে। কারণ বিষ্ণুপুরাণে লিখিত আছে—'ব্রাহ্মণের শর্ম্মা, ক্ষত্রিয়ের বর্ম্মা, বৈশ্যেব গুপ্ত এবং শূদ্রের দাস উপাধি নামান্তে ব্যবহার প্রশস্ত' (১১৪)। তবে সেনগুপ্ত, দাশগুপ্ত প্রভৃতি কেমন কবিয়া হইতে পারে? ইঁহাদের পূর্ব্ব পুরুষেরা সেন, দাশ প্রভৃতি নামেই প্রসিদ্ধ—সেনগুপ্ত,দাশগুপ্ত প্রভৃতি নামে নহে। গুপ্তান্ত নাম নিতান্ত আধুনিক এবং ভ্রান্তিবশে ঘটিয়াছে। অতএব ইহা অবশ্য বর্জ্জনীয়।

বঙ্গদেশে গুপ্ত উপাধি বৈদ্য ভিন্ন অপর কোন জাতির মধ্যে দেখা যায় না; কিন্তু সেন, দাস, ধর, কর প্রভৃতি উপাধি শূদ্রাদিব মধ্যে দৃষ্ট হয়। এ কারণ বৈদ্যগণ আপনাদিগকে ঐ সকল উপাধিধারী শূদ্রাদি হইতে বিভিন্ন এবং বৈদ্য বলিয়া বুঝাইবার অভিপ্রায়ে মাত্র ৫০।৬০ বৎসর পূর্ব্বে সেন, দাশ, দত্ত প্রভৃতি উপাধির সহিত গুপ্ত কথাটি যোগ করিয়া লইয়াছেন। যেমন কলিকাতা কলুটোলার প্রসিদ্ধ কবিরাজ ৺চন্দ্রকিশোর **সেনের পুত্রেরা** দেবেন্দ্রনাথ এবং উপেন্দ্রনাথ **সেনগুপ্ত** লিখিতে আরম্ভ করিয়াছিলেন। আবার তাঁহাদের দেখাদেখি অপরেও না জানিয়া তাঁহাদের অনুকরণ করিতে লাগিলেন। এইরূপে বৈদ্যদিগের মধ্যে গুপ্তান্ত নাম প্রচলিত হইয়াছে।

যাহা হউক, বৈদ্যেরা যখন ব্রাহ্মণ ভিন্ন নহেন, তখন তাঁহাদের নামান্তে শর্ম্মা ব্যবহার করাই শাস্ত্রসঙ্গত বিধি; যেমন সেন শর্ম্মা, গুপ্ত শর্ম্মা, দাশ

শর্ম্মা, দত্ত শর্ম্মা, ধর শর্ম্মা, কর শর্ম্মা প্রভৃতি। এই সকল উপাধি যে দেশান্তরস্থ ব্রাহ্মণদিগের মধ্যে আছে তাহা আমরা পূর্ব্বে দেখাইয়াছি। কুলগ্রন্থেও 'রাঘব সেন শর্ম্মা' (১১৫) এইরূপ উল্লেখ আছে। এতদ্ভিন্ন, বর্ত্তমান যুগের সদ্‌ব্রাহ্মণদিগকেও বৈদ্যদিগের শর্ম্মান্ত নামের পক্ষপাতী দেখা যায় [১ম পরিশিষ্ট দ্রষ্টব্য]। বৈদ্যব্রাহ্মণ সমিতি প্রতিষ্ঠিত হইবার বহু পূর্ব্বে (ক) বাঁকুড়া জেলার অন্তর্গত বিষ্ণুপুর বাস্তব্য শ্রীযুক্ত ভোলানাথ দাশ শর্ম্মা প্রণীত "সন্ধিবোধম্" নামক পুস্তক সম্বন্ধে স্বনাম প্রসিদ্ধ রাখালচন্দ্র ন্যায়রত্ন ও রঘুনাথ শিরোমণি মহাশয় যে অভিমত দিয়াছেন, তাহাতে 'দাশ শর্ম্মা' বলিয়া উল্লেখ করা হইয়াছে। (খ) দ্বারভাঙ্গা-মহারাজের ভ্রাতুষ্পুত্রের উপনয়ন উপলক্ষে কবিরাজ শ্রীযুক্ত গণনাথ সেন সরস্বতী মহাশয়কে যে নিমন্ত্রণ পত্র দেওয়া হইয়াছিল তাহাতেও 'সেন শর্ম্মা' লিখিত আছে। আবও (গ) ব্রাহ্মণ পণ্ডিতগণ শ্রীযুক্ত জ্যোতিঃপ্রকাশ সেনকে 'দেবশর্ম্মা' নামোল্লেখে 'তত্ত্বসাধন' ও ভাগবতভূষণ' উপাধি দ্বারা ভূষিত করিয়াছেন [১ম পরিশিষ্ট ১৮ হইতে ২০ সংখ্যক পত্র দ্রষ্টব্য]। বাস্তবিক বৈদ্যেরা নামান্তে সেন শর্ম্মা, দাশ শর্ম্মা প্রভৃতি ব্যবহার কবিলে শাস্ত্রসঙ্গত কার্য্য করা হয় এবং তাঁহাদের উদ্দেশ্যও সিদ্ধ হয় অর্থাৎ তাঁহারা যে বৈদ্য, তাহা নিঃসন্দেহে বুঝিতে পারা যায়—কোন মতেই শূদ্র বুঝাইতে পারে না। আরও, পিতৃকার্য্যাদিতে ব্রাহ্মণের নামান্তে 'শর্ম্মন্' শব্দের প্রয়োগ না করিলে শাস্ত্রানুসারে কার্য্য পণ্ড হয়। সুতরাং বৈদ্যব্রাহ্মণদিগেরও ঐ সকল কার্য্যে শর্ম্মান্ত নামের পরিবর্ত্তে গুপ্তান্ত নাম ব্যবহার করায় কার্য্য পণ্ড হইতেছে বলিতে হয়। এরূপ হইলে তাঁহাদের পক্ষে গুপ্তান্ত নাম বর্জ্জন পূর্ব্বক শর্ম্মান্ত নাম ব্যবহার যে কতদূর প্রয়োজনীয় তাহা আর কাহাকেও বলিয়া বুঝাইবার আবশ্যক নাই।

২য় কদাচার—পঞ্চদশাহ অশৌচ গ্রহণ। ব্রাহ্মণের পঞ্চদশাহ অশৌচ গ্রহণ কোন শাস্ত্রে উল্লেখ নাই। তাঁহাদের পক্ষে দশ দিন পর্য্যন্ত অশৌচ গ্রহণের বিধি আছে, তাহার অতীত হইলে প্রত্যবায় হইয়া থাকে। সুতরাং তাহা নিষিদ্ধ। বৈদ্য যখন একতর ব্রাহ্মণ তখন তাঁহাদের সম্বন্ধেও এইরূপ বিধান জানিতে হইবে। মনু স্পষ্টই বলিয়াছেন—'অশৌচের দিন বাড়াইবে না' (১১৬)। বৈদ্যদিগের মধ্যে কেহ কেহ পঞ্চদশ দিবস অশৌচ গ্রহণকে তাঁহাদের কুলাচার—সুতরাং অবশ্য পালনীয় এবং পিতৃ পিতামহের অবলম্বিত আচার পরিত্যাগ করা কদাচ বিধেয় নহে এরূপ বলিয়া থাকেন। এ কথা নিতান্ত ভ্রমাত্মক। তাঁহারা ইহা বিবেচনা করেন না যে, অনাচার বা কদাচার কখন কুলাচার হইতে পারে না। তাঁহারা আপন মত সমর্থনের জন্য নিম্নলিখিত মনু বচনকে প্রমাণস্বরূপে গ্রহণ করেন ও তাহার এইরূপ অর্থ করেন; যথা—'পিতৃ-পিতামহগণ যে পথে গমন করিয়াছেন তাহাই সৎপথ, সে পথে গমন করিলে কোন দোষ হয় না' (১১৭)। কিন্তু ইঁহাদের এই অর্থ সঙ্গত নহে। যেহেতু পিতৃ-পিতামহগণ যে সৎপথ হইতে বিচলিত হইতেই পারেন না অথবা হইলেও তাঁহাদের অবলম্বিত অসৎ পথকেই সৎপথ বলিয়া বিবেচনা করিতে হইবে, ইহা কথনই শাস্ত্রাভিপ্রেত হইতে পারে না। অতএব এই বচনের প্রকৃত অর্থ এই যে, 'পিতৃপিতামহগণ যে পথে গমন করিয়াছেন, তাহা যদি সৎপথ অর্থাৎ শাস্ত্রসঙ্গত বলিয়া বিবেচিত হয়, তবে সে পথে গমন করিলে কোন দোষ হয় না।' শাস্ত্রে যাহার উল্লেখ নাই, তাহা সাধারণতঃ দোষের বিষয় হইয়া থাকে, কিন্তু সকল স্থলেই দোষের হয় না। স্থলবিশেষে তাহা শাস্ত্র-সম্মত হইতে পারে এবং হইয়া থাকে। তজ্জন্যই উক্ত হইয়াছে যে, পিতৃ-পিতামহের অবলম্বিত পথ যদি শাস্ত্রসম্মত বলিয়া বিবেচিত হয়, তবে শাস্ত্রে তাহার উল্লেখ না থাকিলেও সে পথে গমন করা যাইতে পারে—তাহাতে

কোন দোষ হয় না। শাস্ত্রানুসারে লোকাচারও একটি প্রমাণ বলিয়া গণ্য। মহাভারতে ব্যাস বলিয়াছেন—'ধর্ম্মজিজ্ঞাসু ব্যক্তির পক্ষে শ্রুতিই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ প্রমাণ, স্মৃতি বা ধর্ম্মশাস্ত্র দ্বিতীয় এবং লোকাচার তৃতীয় প্রমাণ' (১১৮)। সুতরাং লোকাচারকে ধর্ম্মশাস্ত্রের উপর স্থান দেওয়া অকর্ত্তব্য এবং ধর্ম্মশাস্ত্রোক্ত আচার পরিত্যাগ করিয়া লোকাচারের অনুবর্ত্তী হওয়া অধর্ম্মজনকই বলিতে হইবে। পরন্তু যে আচার ধর্ম্মশাস্ত্রবিরুদ্ধ তাহা পিতৃপিতামহের অবলম্বিত হইলেও কদাপি অনুসরণীয় নহে। কারণ গীতায় উক্ত হইয়াছে—'যে ব্যক্তি শাস্ত্রবিধি পরিত্যাগ পূর্ব্বক ইচ্ছা মত কার্য্যে প্রবৃত্ত হয়, সে সিদ্ধি সুখ ও পরাগতি প্রাপ্ত হয় না' (১১৯)। যাহা হউক, যখন বৈদ্যদিগের পঞ্চদশাহ অশৌচ-পালনরূপ কদাচার মাত্র পাঁচ শত বৎসর পূর্ব্বে বলপূর্ব্বক প্রবর্ত্তিত বলিয়া জানা যাইতেছে, তখন উহাকে পিতৃপিতামহাদির অবলম্বিত সৎপথ বলিয়া সিদ্ধান্ত করা নিতান্ত মূঢ়তার কার্য্য সন্দেহ নাই।

অশৌচকে বর্ণলক্ষণ বা বর্ণপরিচায়ক বলিয়া কোন শাস্ত্রকার বলেন নাই। অশৌচব্যবস্থা গুণ, কর্ম্ম ও জন্মমৃত্যুর বিবিধ অবস্থা ভেদে বিভিন্নরূপ হইয়া একই বর্ণমধ্যে ভিন্ন ভিন্নরূপ হইয়া থাকে। ব্রাহ্মণের এক দিন হইতে দশ দিন পর্য্যন্ত, ক্ষত্রিয়ের এক দিন হইতে পঞ্চদশ দিন, বৈশ্যের এক দিন হইতে বিংশ দিবস এবং শূদ্রের এক দিন হইতে ত্রিংশদ্দিবস পর্য্যন্ত অশৌচ দৃষ্ট হয়। আর ভিন্ন ভিন্ন বর্ণে ও জাতিতেও একরূপ অশৌচের ব্যবস্থা দেখা যায়। চণ্ডাল, মুচি কেওরা প্রভৃতি অন্ত্যজ জাতিরা ব্রাহ্মণের সমান অশৌচ গ্রহণ করিয়া থাকে। তজ্জন্য তাহাদিগকে ক্ষত্রিয় বৈশ্যাদি হইতে উৎকৃষ্ট এবং বর্ণশ্রেষ্ঠ বলা যায় না।

ব্রাহ্মণ দশ দিনে, ক্ষত্রিয় দ্বাদশ দিনে, বৈশ্য পঞ্চদশ দিবসে ও শূদ্র এক মাসে শুদ্ধ হয় (মনু, যাজ্ঞবল্ক্য, অত্রি, পরাশর প্রভৃতি)। আবার

ব্রাহ্মণের দশ দিন, ক্ষত্রিয়ের পঞ্চদশ দিন, বৈশ্যের বিংশতি দিবস এবং শূদ্রের এক মাস অশৌচের ব্যবস্থাও আছে (বশিষ্ঠ)। পাকযজ্ঞ দ্বিজশুশ্রূষাদি-নিরত শূদ্রের মাসার্দ্ধ অর্থাৎ পঞ্চদশ দিবস অশৌচ (যাজ্ঞবল্ক্য)। যে সকল ক্ষত্রিয় বৈশ্য ও শূদ্রজাতীয় ব্যক্তি ব্রাহ্মণের একমাত্র সেবক তাহাদের ব্রাহ্মণ-সদৃশ দশাহে শুদ্ধি। আর যে সকল শূদ্র ক্ষত্রিয় ও বৈশ্যের সেবক তাহাদের যথাক্রমে ক্ষত্রিয় ও বৈশ্যের অনুরূপ অশৌচ হইবে (উশনা)।

যে ব্রাহ্মণ সাগ্নিক ও বেদাধ্যয়নশীল তাঁহার অশৌচ এক দিন; যে ব্রাহ্মণ সাগ্নিক নহেন অথচ বেদাধ্যয়নশীল, তাঁহার অশৌচ তিন দিন এবং যাহার অগ্নি ও বেদ কিছুই নাই সেই নির্গুণ অর্থাৎ ব্রাহ্মণত্বহীন নামধারী শূদ্রতুল্য জাতিব্রাহ্মণের অশৌচ দশ দিন হয় (অত্রি ও পরাশর)। যিনি ব্রত করিতে আরম্ভ করিয়াছেন কিন্তু সমাপ্ত করিতে পারেন নাই, যিনি বেদাধ্যয়ন আরম্ভ করিয়াছেন কিন্তু সমাপ্তবিদ্য হন নাই, যিনি আহিত অগ্নিতে প্রত্যহ হোম করিয়া থাকেন সেই আহিতাগ্নিক, যিনি প্রত্যহ রাজকার্য্য করেন এরূপ রাজা এবং রাজকার্য্যের নিমিত্ত রাজা যে রাজকর্ম্মচারীর অশৌচ না হওয়া ইচ্ছা করেন সেই সকল লোকের অশৌচ হয় না (অত্রি)। যজ্ঞকালে, বিবাহে, দেশবিপ্লবে এবং হোমারম্ভ করিলে জনন ও মরণাশৌচ হয় না (দক্ষ)। চিররোগী, অসচ্চরিত্র, সর্ব্বদা ঋণগ্রস্ত, ধর্ম্ম-কার্য্যবর্জ্জিত মূর্খ, অতিশয় স্ত্রৈণ ব্যসনে আসক্তচিত্ত, নিত্য পরাধীন এবং স্বাধ্যায়-ব্রহ্মচর্য্যবিহীন—এই সকল ব্যক্তি সর্ব্বদা অর্থাৎ যাবজ্জীবন অশুচি, সুতরাং ইহাদের আর স্বতন্ত্র অশৌচ নাই (অত্রি)। সূপকার (রন্ধন-ব্যবসায়ী), শিল্পী, বৈদ্য (চিকিৎসক), দাস, দাসী, ব্রহ্মজ্ঞ, ব্রহ্মচারী, ছত্রে অন্নদানকারী ব্রতীদের সদ্যঃশৌচ কথিত হইয়াছে অর্থাৎ স্নান করিলেই ইহাদের শুদ্ধি (রঘুনন্দনের 'শুদ্ধিতত্ত্ব' ধৃত কূর্ম্মপুরাণ বচন)। শিল্পকার,

কারুকর, বৈদ্য, দাস, দাসী, নাপিত, রাজা ও শ্রোত্রীয়—ইহাদের সদ্যঃশৌচ কীর্ত্তিত হইয়াছে (পরাশর) (১২০)।

আবার ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বৈশ্য ও শূদ্র—ইহাদের ভিন্ন ভিন্ন রূপ অশৌচ-ব্যবস্থা সত্ত্বেও সাধারণতঃ সর্ব্ববর্ণেরই দশাহ অশৌচ শাস্ত্রে নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে, ইহা দেখা যায়। যেমন যাজ্ঞবল্ক্য বলিয়াছেন—'মৃতাশৌচ [বেদাধ্যয়নশীল ব্যক্তির পক্ষে] ত্রিরাত্র এবং [বেদবিহীনের পক্ষে] দশরাত্র কথিত হয়' (১২১)। ইহা যে কেবল ব্রাহ্মণের সম্বন্ধে উক্ত হইয়াছে এমন নয়, সর্ব্ববর্ণের প্রতিই লক্ষিত হইয়াছে। এই বচনের 'মিতাক্ষরা' নামক টীকায় বিজ্ঞানেশ্বর নিম্নলিখিত অঙ্গিরার বচন উদ্ধৃত করিয়াছেন। যথা—'সকল বর্ণেরই জননাশৌচ ও মরণাশৌচ স্থলে দশ দিনে শুদ্ধি হয়, ইহা শাতাতপ ঋষি কহিয়াছেন' (১২২)। কিন্তু যাজ্ঞবল্ক্য আবার ক্ষত্রিয়ের পূর্ণাশৌচ দ্বাদশ দিন, বৈশ্যের পঞ্চদশ দিন এবং শূদ্রের একমাস ইহাও কহিয়াছেন। সুতরাং উভয় প্রকার মতই তাঁহার অনুমোদিত বলিয়া বুঝা যাইতেছে। এইরূপ মনুও উভয় মতই সমর্থন করিয়াছেন দেখা যায়। তিনি 'সপিণ্ডের মৃত্যুতে দশাহ অশৌচ বিহিত' (১২৩) ইহা সাধারণ ভাবেই কহিয়াছেন। সেস্থলে এই বাক্য যে কেবল ব্রাহ্মণের প্রতিই প্রযুক্ত হইয়াছে এরূপ সিদ্ধান্ত করিবার কোন কারণ দৃষ্ট হয় না। অঙ্গিরা, শাতাতপ প্রভৃতি ঋষিগণ যে সর্ব্ববর্ণের দশাহ অশৌচ ব্যবস্থা করিয়াছেন, তাহা মনু ও যাজ্ঞবল্ক্যের মতের বিরুদ্ধে নহে। অধুনা ব্যবহারেও দেখা যাইতেছে যে, বঙ্গদেশ ভিন্ন ভারতে সর্ব্বত্রই সর্ব্ববর্ণীয় লোকে শাস্ত্রমতে দশাহ অশৌচ পালন করিতেছেন। বোধ হয়, ব্রাহ্মণাদি বর্ণের মধ্যে গুণকর্ম্মের ভেদ উঠিয়া গিয়া সাম্যভাব প্রাপ্ত হওয়াতেই সর্ব্ব বর্ণের দশাহ অশৌচ পালনরূপ শাস্ত্রোক্ত সাধারণ ব্যবস্থা সর্ব্বত্র গৃহীত হইয়াছে। কিন্তু ব্যবস্থাদি কেবল বাঙ্গালা দেশেই প্রচলিত। শূদ্র যদি এক মাসের

পরিবর্ত্তে বিংশতি দিবস অথবা বৈদ্য যদি পঞ্চদশাহের অশৌচ গ্রহণ করেন, তাহা হইলে এ দেশের ব্রাহ্মণেরা হয় অহিন্দু বলিয়াই সিদ্ধান্ত করিবেন!

দেখা যায়, মনু অশৌচকাল বৃদ্ধি করিতে নিষেধ করিয়াছেন কিন্তু কোন শাস্ত্রকারই উহা সঙ্কোচ করিতে নিষেধ করেন নাই। সুতরাং পক্ষাশৌচীরা দশ দিন অশৌচ অবলম্বন করিলে তাঁহাদের পক্ষে ইষ্ট ব্যতীত অনিষ্টের আশঙ্কা নাই। অশৌচ সংস্কারবিশেষ নহে। উহা পালন না করিলে এমন কোন দোষ ঘটে না যাহাতে কাহাকেও জাতিভ্রষ্ট হইতে হয়। আবার শাস্ত্রের নিষেধ হেতু অশৌচকাল বৃদ্ধি করা পাপজনক, তবে উহা দ্বারা পাতিত্য ঘটে না এবং শাস্ত্রানুসারে উহা প্রায়শ্চিত্তার্হ বলিয়াও গণ্য হয় না। অতএব অশৌচের হ্রাসবৃদ্ধিতে যখন বর্ণের ব্যতিক্রম ঘটে না, এবং এক বর্ণের মধ্যে যখন বিবিধ প্রকার অশৌচ ও ভিন্ন ভিন্ন বর্ণের এক প্রকার অশৌচ ব্যবস্থা দৃষ্ট হয়, তখন বর্ণভেদে অশৌচ ভেদের বিধান থাকা সত্ত্বেও অশৌচ দেখিয়া কখনই বর্ণ নিরূপিত হইতে পারে না। তবে জাতীয় অন্যান্য লক্ষণের সহিত জাতীয় অশৌচের নিয়ম মিলিয়া গেলে অনুমানের কতকটা দৃঢ়তা হইতে পারে এইমাত্র। এতদ্ভিন্ন, অশৌচ দ্বারা কাহারও শ্রেষ্ঠত্ব অশ্রেষ্ঠত্বও সূচিত হয় না। যদি হইত, তাহা হইলে কেওরা, মুচি, চণ্ডাল প্রভৃতি দশ দিন অশৌচ পালন হেতু ক্ষত্রিয়াদি অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ এবং ব্রাহ্মণের সমান বলিয়া পরিগণিত হইত। আর দাস, দাসী, নাপিত প্রভৃতি যে সকল হীনজাতীয় ব্যক্তির সদ্যঃশৌচ কীর্ত্তিত হইয়াছে, তাহারা জাতিব্রাহ্মণ অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ হইত। এই সকল আলোচনা দ্বারা স্পষ্টই বুঝা যাইতেছে যে, বর্ণলক্ষণ সম্বন্ধে অশৌচ নিতান্ত অকিঞ্চিৎকর। যখন ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বৈশ্য ও শূদ্র এক দিন হইতে যথাক্রমে দশ, পঞ্চদশ, বিংশতি ও ত্রিংশদ্দিবস পর্য্যন্ত অশৌচ গ্রহণ করিতে পারে অর্থাৎ

বর্ণমধ্যে অশৌচের কোনরূপ নির্দ্দিষ্ট অপরিবর্ত্তনীয় নিয়ম নাই, এবং যখন অশৌচকাল বৃদ্ধি করিতে নিষেধ থাকিলেও সঙ্কোচ করিতে নিষেধ নাই তখন বর্ণনিরূপণ বিষয়ে উহার মূল্য কিছুই নহে বলিতে হয়। কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, বঙ্গদেশে উহাই একমাত্র বর্ণলক্ষণরূপে গণ্য হইয়া থাকে। এখনকার স্মার্ত্ত পণ্ডিত ও তাঁহাদের অনুবর্ত্তিগণ অশৌচকাল কমাইতে গেলে হুলুস্থূল বাধাইয়া থাকেন। হায়! বাঙ্গালা দেশের কি সবই বিপরীত।

যাহা হউক আমরা দেখিলাম যে, বৈদ্যের পক্ষে সদ্যঃশৌচ অর্থাৎ স্নান মাত্রে শুদ্ধি বিহিত হইয়াছে; কিন্তু জাতিবৈদ্যের পক্ষে সাধারণ ব্রাহ্মণের ন্যায় দশ দিন পর্য্যন্ত অশৌচ গ্রহণ করাই বিধি। তাহার অধিককাল অশৌচ গ্রহণ নিত্যকর্ম্মাদির ব্যাঘাতক বলিয়া দোষাবহ সুতরাং অকর্ত্তব্য। বিশেষতঃ, যখন এই পক্ষাশৌচ পালনরূপ পাপের ফলে বৈদ্যেরা সমাজে দিন দিন হেয় হইয়া পড়িতেছেন, তখন জাতীয় মর্য্যাদা রক্ষার অনুরোধেও এই কদাচার বর্জ্জন করা অবশ্য কর্ত্তব্য, এ বিষয়ে অনুমাত্র সন্দেহ নাই।

৩য় কদাচার—যথাকালে উপনয়ন-গ্রহণে ঔদাসীন্য— ইহা পূর্ব্ববঙ্গেই অধিক, এখন পশ্চিম বঙ্গেও ক্বচিৎ দেখা যায়। সাবিত্রী বা গায়ত্রীমন্ত্র জপ, তাহার অর্থচিন্তন, এবং গায়ত্রীর রূপ বা প্রতিপাদ্য বিষয়ের ধারণা ও ধ্যান দ্বারা ব্রাহ্মণত্ব বা ব্রহ্মজ্ঞানের বিকাশ হইয়া থাকে। একমাত্র গায়ত্রীকে সম্যক্‌রূপে আশ্রয় করিয়া প্রকৃত মনুষ্যত্ব—এমন কি মুক্তি পর্য্যন্ত লাভ করা সহজসাধ্য হয়। সর্ব্ববেদের সার এই গায়ত্রী উপাসনা অপেক্ষা ব্রহ্মজ্ঞান লাভের প্রশস্ত পথ আর দ্বিতীয় নাই। অতএব উপনয়ন-সংস্কারে কালবিলম্ব এবং ঔদাসিন্য বাস্তবিকই ব্রাহ্মণজাতির পক্ষে অতিশয় দোষাবহ। যে ভাবেই হউক, এই গায়ত্রীর উপাসনা ব্যতীত প্রকৃত ব্রাহ্মণত্ব লাভের প্রয়াস বৃথা।

৪র্থ কদাচার—বিবাহে পণগ্রহণ। পণগ্রহণ পূর্ব্বক যে বিবাহ তাহা আসুর বিবাহ নামে অভিহিত। পূর্ব্বে বৈশ্যদিগের মধ্যে কন্যার পিতাকে শুল্ক দিয়া ঐ কন্যা বিবাহ করিবার রীতি ছিল। এক্ষণে তাহার পরিবর্ত্তে পাত্রের পিতাকে শুল্ক দিয়া কন্যাদানের প্রথা দাঁড়াইয়াছে। ফলতঃ উভয়ই এক। উহা বৈশ্যোচিত কার্য্য। আসুর বিবাহ কেবল বৈশ্য ও শূদ্রের পক্ষে প্রশস্ত এবং ব্রাহ্মণের পক্ষে নিষিদ্ধ। ব্রাহ্মাদি অষ্ট প্রকার বিবাহের মধ্যে ব্রাহ্ম, দৈব ও আর্ষ এই তিন প্রকার বিবাহই ব্রাহ্মণের পক্ষে প্রশস্ত বা প্রথম কল্প। তৎপরে যথাক্রমে প্রাজাপত্য, গান্ধর্ব্ব এবং রাক্ষস বিবাহ পর্য্যন্ত চলিতে পারে অর্থাৎ তাহা ধর্ম্মসঙ্গত বলিয়া বিবেচ্য। অবশিষ্ট আসুর ও পৈশাচ বিবাহ অধর্ম্মজনক—কদাপি কর্ত্তব্য নহে, ইহা মনুর অনুশাসন (মনু ৩য় অঃ ২১—২৫ শ্লোক দ্রষ্টব্য)। এতদনুসারে ব্রাহ্মণের পক্ষে পণগ্রহণ পূর্ব্বক যে বিবাহ তাহা অসিদ্ধই হইয়া থাকে এবং তাহা সাঙ্কর্য্যের হেতু হয় অর্থাৎ তজ্জাত সন্তানদিগের সঙ্করত্ব বা অপসদত্ব ঘটে, ইহা অবশ্য স্বীকার্য্য। অতএব যাঁহারা ব্রাহ্মণত্বের দাবী করেন তাঁহাদের পক্ষে যে বিবাহ এরূপ দোষাবহ তাহা একান্ত বর্জ্জনীয়, ইহাতে সংশয় নাই।

৫ম কদাচার—মৎস্য মাংস আহার। প্রকৃত ব্রাহ্মণের পক্ষে উহা কদাচারবিশেষ; তবে নামমাত্র জাতিব্রাহ্মণের পক্ষে না হইতে পারে। এক্ষণে গুণানুসারে ব্রাহ্মণজাতিকে তিন ভাগে বিভক্ত করা যায়। যথা—(১) রজস্তমপ্রধান, (২) সত্ত্বরজঃপ্রধান এবং (৩) সত্ত্বপ্রধান। যাঁহারা রজস্তমপ্রধান—সুতরাং ভোগবিলাস ও যথেচ্ছাচারপরায়ণ, ব্রাহ্মণ্যধর্ম্মে শ্রদ্ধা-শূন্য ও উদাসীন এবং যাঁহারা নামে মাত্র ব্রাহ্মণ থাকিতে চাহেন, তাঁহাদের পক্ষে মৎস্যমাংস আহার অবশ্য পরিহর্ত্তব্য নহে। কিন্তু যাঁহারা রজঃপ্রধান হইলেও সত্ত্বগুণ অর্জ্জনে যত্নশীল বা তাহাতে প্রতিষ্ঠিত হইবার জন্য সচেষ্ট,

তাঁহাদের প্রথমে মৎস্য মাংস আহার বর্জ্জনীয় না হইলেও সত্ত্বগুণের বৃদ্ধি অনুসারে ক্রমশঃ ত্যাগ করা বিধেয়। আর যাহারা সত্ত্বগুণে আরোহণ করিবার জন্য দৃঢ়সঙ্কল্প অথবা তাহাতে আরূঢ় হইয়াছেন, তাঁহাদের পক্ষে উহা সর্ব্বতোভাবে পরিত্যজ্য। এতদ্ভিন্ন, যাঁহারা ব্রহ্মজ্ঞ,—যাঁহারা ত্রিগুণকে অতিক্রম করিয়াছেন তাঁহাদের কথা স্বতন্ত্র; যেহেতু শাস্ত্রোক্ত বিধিনিষেধ তাঁহাদের সম্বন্ধে খাটে না। তাঁহারা মৎস্যমাংস ভক্ষণ করুন বা না করুন, তাহাতে তাঁহাদের পাপ বা পুণ্য হয় না। সে যাহা হউক, আমরা যে ব্রাহ্মণের পক্ষে মৎস্যমাংস আহারকে কদাচার বলিয়া নির্দ্দেশ করিলাম, সেস্থলে যাঁহারা যথার্থ ব্রাহ্মণত্ব লাভের প্রয়াসী, কেবল তাঁহাদিগকে লক্ষ্য করা হইয়াছে। বাস্তবিক যাঁহারা সত্ত্বগুণে প্রতিষ্ঠিত হইবার জন্য যত্ন করিবেন, রাজসিক ও তামসিক আহার যে তাঁহাদের উদ্দেশ্য সাধনের প্রতিবন্ধক-স্বরূপ—সুতরাং অকর্ত্তব্য তাহা কি আর বলিয়া দিতে হইবে?

শাস্ত্রে মৎস্যমাংসাহার সাধারণতঃ নিষিদ্ধ এবং তন্মধ্যে মৎস্য ভক্ষণে সর্ব্বমাংস ভক্ষণ করা হয় বলিয়া মৎস্য বিশেষরূপে বর্জ্জনীয় ইহা বলা হইয়াছে (২৪)। তবে বিশেষ কারণে বা অবস্থাবিশেষে মৎস্যমাংস আহার প্রয়োজন হইতে পারে সে স্বতন্ত্র কথা। মনু বলেন—'মাংসভক্ষণ-রূপ কার্য্যে দোষ নাই, কিন্তু উহাতে ভূতগণের প্রবৃত্তিই দোষ, আর নিবৃত্তি মহা ফলদায়ক' (২৫)। ইহাতেও প্রকারান্তরে মৎস্যমাংসভক্ষণের দোষই কথিত হইল, কেননা লোকে প্রবৃত্তিবশতঃই মৎস্যমাংস ভক্ষণ করিয়া থাকে। আর নিবৃত্তিকে পরম মঙ্গলজনক বলাতেও তাহার বিপরীত কার্য্যকে দোষাবহ বলাই হইল। অতএব মঙ্গলকামী ব্যক্তির পক্ষে মৎস্য-মাংসাহার সর্ব্বথা পরিত্যজ্য। তন্ত্রশাস্ত্রে মৎস্যমাংস ভক্ষণের বিধান দৃষ্ট হয় বটে, কিন্তু তাহারও উদ্দেশ্য ঐ সকলের প্রবৃত্তিকে সংযত করা। কারণ

প্রথমে উহা দ্বারা মাতৃ-পূজা করিয়া পরে সেই প্রসাদ সকলকে বিতরণ পূর্ব্বক তাহার সামান্য অংশ মাত্র ভক্তি-সহকারে গ্রহণ করিতে হইবে, নতুবা মাংস-বুদ্ধিতে আহার করিলে পাপজনক হইবে সন্দেহ নাই। আর বৈধ-মাংসভক্ষণও যে একেবারে নির্দ্দোষ নহে—পরন্তু দোষাবহ. তন্ত্রশাস্ত্রে ইহা নির্দ্দেশ করিতেও বিস্মৃত হন নাই। তদ্ভিন্ন, এ মতে অপরিমিতরূপে এবং অবৈধ বা অনিবেদিত মাংস ভক্ষণ করা সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ। যাহা হউক, এই-রূপে বিধিপূর্ব্বক মাতৃপূজা, ভক্তিভাবে মাতৃনিবেদিত প্রসাদ গ্রহণ এবং বৃথা মাংসাহার বর্জ্জনরূপ অভ্যাসের ফলে ক্রমশঃ মাংসাহারের প্রবৃত্তি ক্ষয় প্রাপ্ত হইয়া সত্ত্বগুণের উদয় হইয়া থাকে এবং তখন তান্ত্রিক সাধকের প্রাণে সাধকপ্রবর রামপ্রসাদের ন্যায় "মেষমহিষ ছাগলাদি কাজ কিরে তোর বলিদানে, (তুমি) জয় কালী জয় কালী বলে বলি দাও ষড়্‌রিপুগণে" এই সুর বাজিয়া উঠে। অতএব স্পষ্টই বুঝা যাইতেছে যে, মৎস্যমাংস পরিত্যাগ করাই তন্ত্রশাস্ত্রের উদ্দেশ্য তবে উহাতে মৎস্যমাংস সহসা ত্যাগ করার পরিবর্ত্তে কৌশলক্রমে ত্যাগ করিবার উপায় বিধান করা হইয়াছে।

কেহ কেহ মনে করেন যে, শরীরের রক্ষা ও বলাধান নিমিত্ত মৎস্যমাংস আহার নিতান্ত প্রয়োজন, সুতরাং উহা ঈশ্বরাভিপ্রেত। এ ধারণা নিতান্ত ভ্রমাত্মক। যেহেতু তমপ্রধান পশুদিগের মধ্যে যখন গো, অশ্ব, মহিষ, গণ্ডার, হস্তী প্রভৃতিকে এবং পশ্চিমাঞ্চলের নিরামিষাশী ব্যক্তিদিগকেও মৎস্যমাংস আহার ব্যতীত অপরিমিত বলশালী দেখা যায়, তখন ঐরূপ আহার না করিলে যে শরীরের পুষ্টি বা সম্যক্ বলাধান হয় না, এ কথা কখনই বলা যায় না। আর দেহের পুষ্টিসাধন মনুষ্যজীবনের চরম উদ্দেশ্যও নহে যে, তাহার জন্য জীবহিংসা একান্ত কর্ত্তব্য হইবে। পক্ষান্তরে উহা আত্মজ্ঞানের অতিশয় বিরোধী বলিয়া অবশ্য বর্জ্জনীয়। যে ব্রাহ্মণকে

সর্ব্বজীবে আত্মদৃষ্টি অর্থাৎ তাহাদের সুখদুঃখকে আপন সুখদুঃখের সমান জ্ঞান করিতে হইবে এবং দেহের প্রতি সম্যক্‌রূপে আসক্তিবর্জ্জিত হইতে হইবে, সেই ব্রাহ্মণের পক্ষে তুচ্ছ দেহের সুখবিধান নিমিত্ত জীবহিংসা করা বা তাহার প্রশ্রয় দেওয়া অতিশয় বিসদৃশ নহে কি? বস্তুতঃ তাঁহার পক্ষে জীবহিংসা অপেক্ষা গর্হিত বা পাপজনক কার্য্য জগতে আর কি আছে জানি না। অধিক বলা বাহুল্য, যে কেহ একবার স্থির চিত্তে ভাবিয়া দেখিলেই বুঝিতে পারিবেন যে, নিজ দেহের সুখের জন্য অপর জীবের প্রাণহানি করা কখনই মনুষ্যোচিত কার্য্য হইতে পারে না। যাহারা দৈহিক ভোগসর্ব্বস্ব প্রধানতঃ তাহারাই মৎস্যমাংসাহারের পক্ষপাতী হইয়া থাকে এবং ভগবৎপ্রাপ্তি যখন তাহাদের জীবনের উদ্দেশ্য নয় তখন মৎস্যমাংসাহার যে তাহাদের পক্ষে অকর্ত্তব্য বা পাপজনক হইবেই, এমন কথা বলা যায় না। পশুদিগের যেমন জীবহিংসায় পাপ নাই, তদ্রূপ মনুষ্যদিগের মধ্যে যাহারা তমপ্রধান (পশুভাবাপন্ন) তাহাদের পক্ষে উহা দোষের বিষয় না হইতে পারে। কিন্তু যাঁহাদিগকে প্রকৃত মনুষ্যত্ব অর্জ্জন করিতে হইবে, তাঁহাদের পক্ষে মৎস্যমাংসাহার যে পাপজনক, তাহাতে কিছুমাত্র সংশয় নাই। তবে তাঁহারা উহা সহসা ত্যাগ না করিয়া ক্রমে ক্রমে ত্যাগ করিতে পারেন এই মাত্র।

২। ব্রাহ্মণাচার পালন ও জাতীয় বিশেষত্ব সংরক্ষণ।

বৈদ্যব্রাহ্মণমাত্রেরই যথাকালে ব্রাহ্মণোচিত সংস্কার ও ধর্ম্মনিষ্ঠা একান্ত আবশ্যক। একেবারে সম্পূর্ণ নিষ্ঠাবান্ হইতে না পারিলেও কদাচার বর্জ্জন— বিশেষতঃ প্রথমোক্ত তিনটি কদাচার পরিত্যাগ করা নিতান্ত প্রয়োজনীয়। সকলে যাহাতে শর্ম্মান্ত উপাধি, দশাহ অশৌচ, পকান্ন দ্বারা শ্রাদ্ধ ও যথা-কালে উপনয়ন প্রভৃতি সদাচারগুলি রক্ষা করিয়া আপনাদের অব্রাহ্মণত্বের

কলঙ্কমোচন করিতে যত্নবান হন সর্ব্বাগ্রে তাহা করা কর্ত্তব্য। বৈদ্যগণের চিরন্তন উচ্চ মর্য্যাদা রক্ষা করিতে হইলে ইহা করিতেই হইবে। কিন্তু ইহাতে কেহ যেন মনে না করেন যে, এই কয়টি আচার রক্ষা করিলেই ব্রাহ্মণাচার পালন শেষ হইয়া গেল। আমরা ইহাই মাত্র বলিতেছি যে, এই গুলি ব্রাহ্মণাচার পালনের একটি বা প্রথম সোপান মাত্র। এতদ্ভিন্ন আরও অনেক কর্ত্তব্য আছে। বস্তুতঃ ব্রাহ্মণোচিত গুণের অর্জ্জন বা চরিত্র গঠন করিতে হইলে যে সমস্ত বিধিনিষেধ শাস্ত্রে উক্ত হইয়াছে, তৎসমস্ত মানিয়া চলাই ব্রাহ্মণাচার পরিপালন।

এক্ষণে বৈদ্যদিগের মধ্যে কেহ কেহ বলেন যে, এখন যেরূপ দিনকাল পড়িয়াছে তাহাতে ব্রাহ্মণাচার পালন দ্বারা কোন উপকার হইবে না। তৎপরিবর্ত্তে বরপণ প্রথার উচ্ছেদসাধন, চাকুরীর পরিবর্ত্তে স্বাধীনভাবে জীবিকা নির্ব্বাহের উপায় বিধান, বালক-বালিকাদিগের সুশিক্ষা ও চরিত্র-গঠনের ব্যবস্থা, দারিদ্র্যদুঃখমোচন ও ম্যালেরিয়া রোগ দূরীকরণ প্রভৃতির চেষ্টা করিলে দেশের প্রভূত কল্যাণ সাধিত হইতে পারে। পাশ্চাত্য শিক্ষার প্রভাব যাঁহাদের হৃদয়ে আধিপত্য বিস্তার করিয়াছে তাঁহারাই ঐ প্রকার বাক্য বলিয়া থাকেন। উহা একদেশ-দর্শিতারই ফল। ব্রাহ্মণাচার পালনে মনোনিবেশ করিলে যে, ঐ সকল বিষয়ে চেষ্টা করা যায় না অথবা ঐ সকল বিষয়ে যত্ন করিতে হইলে যে ব্রাহ্মণাচার পালন করা চলে না এমন নয়। এরূপ অযথা বিরোধ কল্পনার কোন হেতু নাই। কারণ ব্রাহ্মণাচার পালনকে ঐ সকল কর্ত্তব্যের অন্যতমরূপে গ্রহণ করা যাইতে পারে। বিশেষতঃ, উহা তাঁহাদের উদ্দেশ্যসাধনের সম্পূর্ণ অনুকূল ভিন্ন প্রতিকূল নহে।[১] যেহেতু ব্রাহ্মণাচার পালন দ্বারা ব্রাহ্মণ্যবুদ্ধির (অর্থাৎ সর্ব্বত্র আত্ম-বোধের) উদ্রেক হইলে ঐ সকল হিতকর কার্য্য করিবার প্রবৃত্তি স্বতঃই জাগিয়া উঠে এবং তখনই ঐ সকল কার্য্য সহজে সম্পন্ন করা সম্ভব হয়;

নতুবা মনের সাময়িক উত্তেজনাবশে ঐ সকল কার্য্যে রত হইলে, উহা মিথ্যাচারে পরিণত হয়। ব্রাহ্মণাচারনিষ্ঠা ব্যতীত সম্যক্‌রূপে সফলতা লাভ দুরাশা বলিয়াই আমাদের মনে হয়। এই যে সভাসমিতি করিয়া বরপণ প্রথা নিবারণের চেষ্টা এতাবৎকাল চলিয়া আসিতেছে অথচ কোন ফল হইতেছে না, ইহার একমাত্র কারণ ব্রাহ্মণ্যবুদ্ধির অভাব। ব্রাহ্মণ্যবুদ্ধির উদয় হইলে ঐ প্রথা আপনিই তিরোহিত হইয়া যাইবে। নতুবা গোড়া কাটিয়া আগায় জল ঢালার ন্যায় সমস্ত চেষ্টাই ব্যর্থ হইবে।

সত্ত্বশুদ্ধিমূলক আচরণের নাম আচার। সত্ত্বশুদ্ধি না হইলে জীবে দয়ারূপ সত্ত্বগুণের প্রকাশ থাকে না। সে অবস্থায় যে লোক-হিতকর কর্ম্মে প্রবৃত্তি তাহা রজোগুণসম্ভূত, স্বার্থসাধনমূলক এবং ক্ষণস্থায়ী, তদ্দ্বারা কোনরূপ স্থায়ী মঙ্গল সাধিত হইতে পারে না। পরন্তু তাহা অনেক সময়ে বিপরীত ফল প্রসব করে। এজন্য প্রধান প্রধান লোকহিতকর কর্ম্মে প্রবৃত্ত হইবার পূর্ব্বে সত্ত্বশুদ্ধিবিষয়ে মনোযোগ করা নিতান্ত আবশ্যক। প্রতিবাদকারীরা হঠকারিতাবশে এ বিষয়ে আদৌ বিবেচনা করিতে চাহেন না বলিয়াই তাঁহাদের আপত্তি।

শাস্ত্রে বলেন, আচারই প্রথম ধর্ম্ম এবং ধর্ম্মের প্রভব বা উৎপত্তিস্থল। আচার পালন দ্বারা ধর্ম্মলাভ হয়। অতএব ধর্ম্মলাভ করিতে হইলে প্রথমে আচারসম্পন্ন হইতে হয়, অন্যথা প্রত্যবায় হইয়া থাকে। যথাবিহিত আচার পালন না করিয়া সদ্‌গুণের অর্জ্জন কতকটা সম্ভব হইলেও, ভিত্তিহীন অট্টালিকা যেরূপ অচিরাৎ ভূমিসাৎ হয়, তদ্রূপ উহা শীঘ্রই বিনাশ প্রাপ্ত হয়। আচারানুষ্ঠানের অভাবরূপ ছিদ্রের ভিতর দিয়া কালে সমস্ত ধর্ম্মই নষ্ট হইয়া যায়। আচারপালন দ্বারা যখন ধর্ম্মলাভরূপ মহৎ উপকার সাধিত হয় এবং উহা ধর্ম্মের প্রথম সোপান ও ভিত্তিস্বরূপ বলিয়া শাস্ত্রে উক্ত হইয়াছে, তখন উহা দ্বারা আত্মাভিমান চরিতার্থ করার সম্ভাবনা থাকিলেও

উহা কদাপি ত্যাজ্য নহে। বড় হইবার ইচ্ছা প্রসিদ্ধ রিপু অহঙ্কারের মূর্ত্তি-বিশেষ বলিয়া দোষযুক্ত হইলেও, উহাই আবার হৃদয়ে প্রবলভাবে জাগরূক না থাকিলে কাহাকেও বড় হইতে দেখা যায় না ; সুতরাং উহাকে একটি মহৎ গুণও বলিতে হয়। এ স্থলে মীমাংসা এই যে. সৎ উপায়ে বড় হইবার ইচ্ছা গুণবিশেষ বলিয়া গণ্য, আর অসৎ উপায়ে বড় হইবার ইচ্ছা দোষাবহ। ধর্ম্ম বা কর্ত্তব্যবুদ্ধিতে কার্য্য করার লোক অতি বিরল। সাধারণে কোন একটা লাভ বা আত্মতৃপ্তির সম্ভাবনা না দেখিলে কখনই সৎকার্য্যে প্রবৃত্ত হয় না। কিন্তু প্রথমে এইরূপে সৎকার্য্যে প্রবৃত্ত হইলে, পরে তাহা হইতে কর্ত্তব্যবুদ্ধির উদয় হয়। সুতবাং নিকৃষ্ট বৃত্তিও অনেক সময়ে সৎকার্য্যে বিশেষ সহায়তা করে। অতএব বড় কাজ করাইতে হইলে প্রথমে বড় হইবার আকাঙ্ক্ষাকে জাগাইয়া দেওয়া বিশেষ আবশ্যক, নতুবা কেবল কর্ত্তব্য কর্ম্ম কর, পরোপকার কর, মনুষ্যত্ব অর্জ্জন কর ইত্যাদি বলিয়া বক্তৃতা করিলে তাহাতে কর্ণপাত করিবার লোক অতি অল্প। যাহা হউক, সকল বিষয়েরই ভাল মন্দ দুই দিক আছে। যাঁহারা কেবল মন্দ দিকটা দেখিয়া বিষয়টি ত্যজ্য বলেন বা তাহা উপেক্ষা করেন তাঁহাদিগকে অসম্যগ্‌দর্শী বলিতে হয়।

উন্নতিই মানবজীবনের লক্ষ্য ইহা সকলেই স্বীকার করিবেন। কিন্তু যেখানে একের উন্নতিতে অপরের অবনতি হয়, সে স্থলে সেই উন্নতিকে যথার্থ উন্নতি বলা সঙ্গত নহে। যাহাতে সর্ব্বসাধারণের যথাসম্ভব উন্নতি সাধিত হয়, শাস্ত্রকারগণ তাহাকেই উন্নতি বলিয়াছেন এবং সেই হেতু গুণের তারতম্যানুসারে কর্ম্মবিভাগ করিয়া সেই কর্ম্মবিভাগকে আবার বংশগত করিয়া দিয়াছেন। তদনুসারে যে বংশের জন্য যে কর্ম্ম নির্দ্দিষ্ট তাহাই তাহার স্বকর্ম্ম ও কর্ত্তব্য এবং অপর বংশের নির্দ্দিষ্ট কর্ম্ম তাহার পক্ষে পরধর্ম্ম ও অকর্ত্তব্যরূপে বিবেচ্য। ইহারই নাম বর্ণধর্ম্ম। এই বিধান

অমান্য করিয়া ইচ্ছামত কর্ম্মে প্রবৃত্ত হইয়া তাহাতে উন্নতি লাভ করিলেও সে উন্নতি পরিণামে অবনতির হেতু এবং সমাজের পক্ষে অমঙ্গলকর হয়। এই নিমিত্ত শাস্ত্রে পরধর্ম্ম সুন্দররূপে অনুষ্ঠিত হইলেও ভয়াবহ এইরূপ উক্ত হইয়াছে। বস্তুতঃ স্বার্থমূলক উন্নতি দ্বারা অপরের উন্নতির ব্যাঘাত হয় ও তদ্দ্বারা সমাজের অনিষ্ট হয় বলিয়া ব্যক্তিবিশেষের ঐরূপ উন্নতি বাঞ্ছনীয় নহে। অতএব সমাজের প্রকৃত মঙ্গল বা উন্নতি প্রার্থণীয় হইলে বর্ণধর্ম্মের প্রতি লক্ষ্য রাখা নিতান্ত আবশ্যক। যদিও এক্ষণে বর্ণধর্ম্ম সম্যক্‌রূপে পালন করা অসম্ভব হইয়া পড়িয়াছে, তথাপি ইচ্ছা করিলে তাহার সামান্য অংশ বা বাহ্যিক আচারগুলি সকলেই পালন করিতে পারেন। ইহাতেও উপেক্ষা করিলে শাস্ত্রের প্রতি নিতান্ত অশ্রদ্ধা প্রকাশ করা হয়। যে শাস্ত্র আমাদের পরম শ্রেয়োলাভের একমাত্র পথপ্রদর্শক তাহার প্রতি এরূপ অশ্রদ্ধা যে মানবকে মানবত্ব হইতে ভ্রষ্ট করিয়া পশুত্বে পরিণত করে, তাহাতে আর সন্দেহ কি? যাহা হউক, প্রকৃত কল্যাণলাভের জন্য শাস্ত্রমার্গ অনুসরণ করিতে হইলে পিতৃ-পরিচয় এবং জাতীয় আচার পালন মানবের সর্ব্বাগ্রে প্রয়োজন। এই দুইটি ভিন্ন শাস্ত্রসম্মত উন্নতি হইতেই পারে না। পরন্তু আভিজাত্য গৌরববুদ্ধি থাকিলে সদাচার পালনে প্রবৃত্তি জন্মে, জাতীয় চরিত্র গঠিত হয় এবং যাবতীয় দোষ নষ্ট হয়। আভিজাত্য গৌরববুদ্ধি ও জাতীয় মর্য্যাদাজ্ঞান কর্ত্তব্য কার্য্যে প্রবৃত্তি জন্মায় এবং অসৎ কার্য্য হইতে নিবৃত্ত করে। এ বিষয় সংক্ষেপে গ্রন্থভূমিকায় আলোচিত হইয়াছে। বালক-হৃদয়ে এই আভিজাত্য গৌরববুদ্ধি জন্মাইয়া দিতে পারিলে সে সহজে বিপথগামী হইতে পারে না, সুতরাং বালকের চরিত্রগঠনের পক্ষে উহা বিশেষরূপে সহায়তা করে। প্রকৃত ব্রাহ্মণ্যবুদ্ধি যাঁহার হৃদয়ে বিদ্যমান্ থাকে, তিনি বিবাহে পণগ্রহণরূপ ঘৃণিত কার্য্যে কখনই অগ্রসর হইতে পারেন না। এই ব্রাহ্মণ্যবুদ্ধি সর্ব্বদা জাগ্রত রাখিতে পারিলে যাবতীয় দোষ

দূরীভূত হইয়া ব্রাহ্মণোচিত গুণসমুহ অনায়াসে লাভ হইয়া থাকে এবং সঙ্গে সঙ্গে বিরুদ্ধবাদীদিগের অভিপ্রেত লোকহিতকর কার্য্যগুলিও সুসিদ্ধ হয়।

কালের এমনি আশ্চর্য্য প্রভাব যে, যাঁহারা ইংরাজী আদর্শ অপেক্ষা আর্য্যঋষিদিগের প্রতি অধিকতর শ্রদ্ধাবান্, যাঁহারা সনাতন ধর্ম্মের পক্ষপাতী, এমন কি যাঁহারা ত্রিসন্ধ্যার নিয়মিত অনুষ্ঠান দ্বারা ব্রাহ্মণ্যবুদ্ধির পরিচয় দিয়া থাকেন, তাঁহাদের মধ্যেও অনেকে মোহবশতঃ বৈদ্যের শর্ম্মান্ত নাম ব্যবহার প্রভৃতি সদাচারগুলির প্রতি কটাক্ষ করিয়া থাকেন। তাঁহাদের মতে অগ্রে খাঁটি ব্রাহ্মণ হইয়া শর্ম্মান্ত নাম ব্যবহার করা উচিত। কিন্তু তাঁহারা ইহা অবগত নহেন যে, হিন্দুশাস্ত্রমতে পিতৃপরিচয় ভিন্ন দৈবপিত্র্যাদি কোন কার্য্যেই অধিকার জন্মে না এবং অনধিকারে কর্ম্মসকল অনুষ্ঠান করিলে তৎসমস্ত পণ্ড হইয়া থাকে। বাস্তবিক যদি ব্রাহ্মণের পক্ষে নামান্তে 'শর্ম্মন্' শব্দ প্রয়োগের প্রয়োজনই না থাকিবে, তবে শাস্ত্রে তাহার ব্যবস্থা দেওয়া হইয়াছে কেন? আর উহা যখন ব্রাহ্মণাচারের অঙ্গবিশেষ তখন উহা পালন না করিলে যে অঙ্গহানি হইয়া থাকে তাহা বলা বাহুল্য। সুতরাং এ বিষয়ে উপেক্ষা করা নিতান্ত অবিবেচনার কার্য্য। যদি তাঁহারা বৈদ্যকে জাতিতে বৈশ্য বলিয়া মনে করেন ও সেই হেতু গুপ্তান্ত নামে দৈবপিত্র্যাদি কার্য্য সম্পাদন করাই কর্ত্তব্য বলিয়া জ্ঞান করেন, তবে "অগ্রে খাঁটি ব্রাহ্মণ হইয়া পরে শর্ম্মান্ত নাম ব্যবহার করা উচিত" তাঁহাদের এই বাক্য বিসদৃশ হইতেছে না কি? যদি তাঁহারা যথার্থ বৈশ্যই হন তবে আবার খাঁটি ব্রাহ্মণ হইবেন কিরূপে? আর যদি ব্রাহ্মণই হন, তবে খাঁটি হউন বা নাই হউন, শর্ম্মান্ত নামোল্লেখে পরিচয় দেওয়া ও ক্রিয়াকলাপ অনুষ্ঠান করা তাঁহাদের অবশ্য কর্ত্তব্য হইবে। ইহার অন্যথা হইলে সঙ্করত্বের পরিচয় দেওয়া হইবে ও ক্রিয়াকলাপও বিপরীত ফলপ্রসূ হইবে। যেরূপেই হউক, তাঁহাদের বাক্য

প্রলাপ বাক্যের ন্যায় অশ্রদ্ধেয়। ইঁহাদের মধ্যে আবার এরূপ ঘোর মোহাচ্ছন্ন ব্যক্তি দেখিতে পাওয়া যায় – যাঁহারা ব্রাহ্মণের প্রতি বিনয় বা ভক্তি প্রদর্শনই হিন্দুত্বের সর্ব্বপ্রধান লক্ষণ বলিয়া বিবেচনা করেন এবং এই ধারণায় দ্বিজশ্রেষ্ঠ বা ত্রিজ বৈদ্যকুলে জন্মিয়াও মূর্খতাবশতঃ দ্বিজাতি ব্রাহ্মণের নিকট আপনাকে দাসানুদাস বলিয়া পরিচয় দিয়া ধার্ম্মিকতা-প্রদর্শন ও গোঁড়া হিন্দু বলিয়া বড়াই করিয়া থাকেন। এই সকল বৈদ্য-কুল-কলঙ্কস্বরূপ ব্যক্তিদিগের সহিত এ বিষয়ে বাক্যালাপ করা আমরা একেবারেই নিস্প্রয়োজন বলিয়া মনে করি। তথাপি আমরা তাহাদিগকে এইটুকু মাত্র বলিতে চাই যে, মূর্খতার একটা সীমা থাকা আবশ্যক ইহা যেন তাহাদের স্মরণ থাকে। আর যদি তাহারা বৈদ্যনামে পরিচয় দিয়া বৈদ্যকুলে কালি না দেয় অর্থাৎ বৈদ্য নামটা পরিত্যাগ করে, তবে তাহারা যত ইচ্ছা ব্রাহ্মণভক্তপ্রবর, ধার্ম্মিক বা গোঁড়া হিন্দু সাজুক, তাহাতে আমাদের কিছুমাত্র আপত্তি নাই।

যাঁহারা বলেন, 'অগ্রে বরপণ নিবারণ প্রভৃতি লোকহিতকর কার্য্য না করিয়া অথবা কাহারও মতে ব্রাহ্মণোচিত চরিত্রগঠন না করিয়া বা খাঁটি ব্রাহ্মণ না হইয়া 'শর্ম্মা' শর্ম্মা' করা নিতান্ত অনুচিত, তাঁহাদের সহিত আমরা একমত হইতে পারি না। জিজ্ঞাসা করি, আমরা বরপণ নিবারণ বা দেশের দস্যুতস্কর নিবারণ করিতে পারিতেছি না বলিয়া, অথবা ম্যালেরিয়া রোগ দূরীকরণ করিয়া লোকের শান্তিবিধান করিতে পারিতেছি না—কিম্বা খাঁটি বা ব্রহ্মজ্ঞ ব্রাহ্মণ হইতে পারিতেছি না বলিয়া, আমরা ব্রাহ্মণপুত্র হইয়াও কি আমাদিগকে পিতৃপরিচয়স্থলে বৈশ্যপুত্র বলিয়া পরিচয় দিতে হইবে? ইহা কি যুক্তি ও ধর্ম্মসঙ্গত কথা? কোন দরিদ্র ব্রাহ্মণসন্তানকে যদি কেহ অন্ত্যজ জাতির পুত্র বা বেশ্যাপুত্র বলিয়া পরিচয় করিয়া দেয়, তবে ঐ ব্রাহ্মণ দারিদ্র্য দুঃখে উৎপীড়িত বলিয়া কি উহা

স্বীকার করিয়া লওয়াই তাহার কর্ত্তব্য হইবে? না, তাহার প্রতিবিধান করিবার কোন আবশ্যকতা নাই বলিতে হইবে? এ সকল কথা কি নিতান্ত অজ্ঞানতা ও বিকৃতিবুদ্ধির পবিচায়ক নহে? পক্ষান্তরে, লোকে কথায় বলে "যাক্ প্রাণ থাক্ মান"। দৃষ্টান্তেও দেখা যায়, লোকের নিকট অপমানিত বা ঘৃণিত হইবার ভয়ে অনেকেই আত্মহত্যা করিয়াছেন—এমন কি সামান্য পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইতে না পারিয়াও অনেক ছাত্র আত্মহত্যা করিয়া থাকে। সুতরাং মান প্রাণাপেক্ষাও বড় জিনিষ। যাহার মান গেল, তাহাব সবই গেল—তাহার জীবন বৃথা, তাহার ধর্ম্ম কর্ম্ম সবই বৃথা। মর্য্যাদাজ্ঞানহীন মনুষ্য মনুষ্যপদবাচ্য নহে। এ নিমিত্ত শ্রীভগবান্ স্বয়ং কহিয়াছেন—'মানী ব্যক্তিব অপমান মরণ অপেক্ষাও অধিক।' সুতরাং অপমানজনিত দুঃখের তুলনায় অন্য সকল দুঃখই হেয়। অতএব বরপণ দশ-গুণ বৃদ্ধি হউক, ম্যালেরিয়ায় দেশ ভরিয়া যাউক—এ সকল দুঃখ ব্রাহ্মণশ্রেষ্ঠ বৈদ্যকুলে জন্মিয়া বর্ণসঙ্কর প্রভৃতি গালি সহ্য করার তুলনায় অতীব অকিঞ্চিৎকর।

আধুনিক শিক্ষার দোষে যাঁহারা আধ্যাত্মিক উন্নতির প্রয়োজনীয়তা সম্যক্ উপলব্ধি করিতে পারেন না, তাঁহারা হয়তো সন্ধ্যা পূজা করিতে হইবে এই আশঙ্কায় ব্রাহ্মণাচার গ্রহণে আপত্তি করিবেন। তাঁহাদের প্রতি আমাদের বক্তব্য এই যে, 'এ কালের শত শত ব্রাহ্মণসন্তানও সন্ধ্যা পূজা ত্যাগ করিয়া অভক্ষ্যভক্ষণাদিরূপ যথেচ্ছ আচরণ করিতেছেন, তথাপি তাঁহাদের জাতীয়তা এবং সামাজিক মর্য্যাদা সম্পূর্ণরূপে নষ্ট হইতেছে না। সুতরাং যথেচ্ছাচারী বৈদ্যসন্তানদিগেরও সে বিষয়ে বিশেষ আশঙ্কার কারণ নাই।' তবে এইটুকু তাঁহাদের বিবেচনা করা কর্ত্তব্য যে, সামাজিক মর্য্যাদা যাহার উপর প্রতিষ্ঠিত সেই সদাচারগুলি অর্থাৎ শর্ম্মান্ত নাম ও দশাহ অশৌচ প্রভৃতি গ্রহণ না করিলে সামাজিক মর্য্যাদার যথেষ্ট ক্ষতি হইয়া থাকে।

অতএব স্বেচ্ছাচারীদিগেরও এই আচারগুলি পালনে উদাসীন থাকা কখনই কর্ত্তব্য নহে। আমরা এক্ষণে ঘোর স্বেচ্ছাচারী হইয়া পড়িলেও যদি আমরা সত্য-সত্যই প্রকৃত ব্রাহ্মণত্ব লাভ করিতে চাই, তবে প্রথমে কেবল আত্ম-পরিচয় প্রদানকালে এবং শাস্ত্রোক্ত ক্রিয়াকলাপ অনুষ্ঠানকালে ব্রাহ্মণত্বের পরিচয় দিতে অভ্যাস করিলেই আমাদের যথেষ্ট হইবে। কারণ এইরূপ অভ্যাসের ফলে আমাদের ব্রাহ্মণ্য-চরিত্রগঠনের চেষ্টা জাগিয়া উঠিবার আশা করা যায়। সুতরাং আমরা যাহাই করি না কেন, এইটুকু আমাদের কোনক্রমেই ত্যাগ করা উচিত নহে। সামান্য দুই একটি বাহ্যিক আচার রক্ষায় উপেক্ষা করাতেই আমাদের সমূহ মর্য্যাদাহানি হইয়াছে ও হইতেছে। আর মর্য্যাদাহানির বাকিই বা কি আছে? বৈদ্যের পাতের প্রসাদ পাইলে যাহারা কৃতার্থ হইত তাহারা এখন বৈদ্যবাড়ীতে ভাত খাইতে চাহে না। যাহারা প্রণাম করিয়া পদধূলি লইয়া নিজেকে ধন্য মনে করিত এবং আশীর্ব্বাদ প্রার্থনা করিত, এখন তাহারা 'নমস্কার' বলিয়া সমান মর্য্যাদা জানাইতে চায়! কেহ বা মহাভারতের জাল শ্লোক শুনাইয়া দ্বিজশ্রেষ্ঠ বৈদ্যগণকে আয়োগব বা বেদিয়াজাতীয় বর্ণসঙ্কর বলিয়া আর কেহ বা স্পষ্টতঃ জারজ বলিয়া গালি দেয়! * হে বৈদ্যভ্রাতৃগণ! ইহাতেও যদি আপনাদের চৈতন্যোদয় না হয়, তবে জানিনা ইহা অপেক্ষা দুঃখের বিষয় আর কি হইতে পারে?

---

* সম্প্রতি এক ব্রাহ্মণপণ্ডিত বিদ্বেষবশে অন্ধীভূত হইয়া বৈদ্যজাতিকে বর্ণসঙ্কররূপে সপ্রমাণ করিবার অভিপ্রায়ে সংবাদ-পত্রাদিতে তাঁহার মন্তব্য প্রকাশ করিতেছেন। তিনি "বিদ্যাবারিধি" উপাধি দ্বারা বিভূষিত। তিনি প্রথমে স্বরচিত এক পুস্তকের পূর্ব্বতন সংস্করণে বৈদ্যকে বৈশ্য বলিয়া প্রতিপন্ন করিয়াছিলেন, এখন দেখিতেছি তিনি বর্ণসঙ্কররূপে প্রতিপাদন করিতে অগ্রসর।

সুতরাং তাঁহার মস্তিষ্কের যে উন্নতি হইয়াছে ইহা অস্বীকার করিবার উপায় নাই। কিন্তু কোন্ মহৌষধ সেবনে তাঁহার এরূপ উন্নতি হইল তাহা জানিতে পারিলে আমরা সুখী হইতাম। যাহা হউক এখন তাঁহার মত এই যে, বৈদ্যেরা জাতিতে অম্বষ্ঠ এবং বর্ণসঙ্করবিশেষ। কিন্তু বৈদ্যগণ যে এই মতের ভ্রম দেখাইয়া আপনাদিগকে জাতিতে বৈদ্য বলিয়া প্রতিপন্ন করিয়াছেন, তাহাতে এই মহাপ্রভু বৈদ্যদিগকে বিশেষভাবে আক্রমণ করিয়াছেন। যে কোন প্রকারেই হউক বৈদ্যজাতি যে বর্ণসঙ্কর – ইহা তিনি প্রমাণ করিবেন বলিয়া দৃঢ়প্রতিজ্ঞ। উত্তম অধ্যবসায় বটে ! এই উদ্দেশ্যে তিনি অনন্ত শাস্ত্ররূপ গহন অরণ্য মধ্য হইতে একটি মহান্ অস্ত্র সংগ্রহ করিয়াছেন। মহাভারতের নিম্নলিখিত বচনটিই সেই অস্ত্র। যথা—'শূদ্র হইতে যথাক্রমে ব্রাহ্মণী, ক্ষত্রিয়া ও বৈশ্যাতে চণ্ডাল, ব্রাত্য ও বৈদ্য এই তিন অপসদ পুত্র লক্ষিত হয়'। এই বৈদ্য শূদ্রকর্ত্তৃক বৈশ্যাতে উৎপন্ন প্রতিলোমজ অপসদ বা বর্ণসঙ্করবিশেষ। মনু উহাকে অয়োগব নামে আখ্যাত করিয়াছেন। কিন্তু এই বচনটি মহাভারতের ভিন্ন ভিন্ন সংস্করণে ভিন্ন ভিন্ন আকারে দৃষ্ট হয়। কোন সংস্করণে "বৈদ্য", কোন সংস্করণে 'বৈদ্য' শব্দের স্থলে "বর্ণ", আর কোন সংস্করণে বা "চেল" শব্দ ব্যবহৃত হইয়াছে ('বর্ণ' ও 'চেল' এই দুই শব্দে যাহারা বস্ত্রাদি ধৌত ও রঞ্জিত করে অর্থাৎ রজক বা রজকের ন্যায় কোন জাতিবিশেষ বুঝায়)। অতএব এখানে 'বৈদ্য' শব্দের অস্তিত্ব বিষয়ে নিশ্চয়তা না থাকায় উহাকে জাল বলিয়া স্থির করিতে হয়। জিজ্ঞাসা করি, বারিধিমহাশয় শাস্ত্রে মনূক্ত আয়োগব জাতির বৈদ্যত্বপ্রতিপাদক এরূপ আর একটি বচন কোথাও দেখাইতে পারেন কি ? যদি না পারেন তবে তাঁহার এই প্রমাণের মূল্য কি রহিল ? অতএব বারিধিমহাশয় যে বড় আশায় বুক বাঁধিয়া একমাত্র অস্ত্রের উপর-নির্ভর করিয়া রণক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইলেন, হায় ! সে অস্ত্র যে ভগ্ন হইয়া গেল ! এখন "বল মা তারা দাঁড়াই কোথা" ! এখন তাঁহার দাঁড়াইবার স্থান কোথায় ইহা ভাবিবার কথা বটে ! আর যদি তাঁহার খাতিরে উক্ত বচনে 'বৈদ্য' কথাটির অস্তিত্ব স্বীকার করিয়া লওয়া যায়, তাহা হইলে

জিজ্ঞাস্য এই যে, তিনি কোন্ লক্ষণ দেখিয়া বঙ্গীয় প্রসিদ্ধ বিদ্বান্ বৈদ্যজাতিকে এই 'বৈদ্য' অর্থাৎ নিকৃষ্ট বেদিয়াজাতি বলিয়া স্থির করিলেন? বৈদ্যদিগের ব্রাহ্মণোচিত উপনয়ন, অধ্যাপনা, গুরুবৃত্তি এবং বৈদ্যেরা তাঁহাদের ন্যায় বিদ্যাসাগর, সার্ব্বভৌম, শিরোমণি, মহামহোপাধ্যায় প্রভৃতি উপাধিসকল অদ্যাপি ধারণ করিতেছেন—ইহা তিনি স্বচক্ষে প্রত্যক্ষ করিয়াই কি বৈদ্যকে চণ্ডালতুল্য শূদ্রাপসদ জাতি বলিয়া সিদ্ধান্ত করিলেন? ধন্য পাণ্ডিত্য! এরূপ সিদ্ধান্ত বিদ্যাবারিধির উপযুক্তই বটে! বেদিয়াজাতিকে সামান্য চিকিৎসা হেতু বৈদ্য বলা হয় বলিয়া, কি দ্বিজাতিগণের নিত্য পূজ্য বৈদ্য ধন্বন্তরিকে বেদিয়াজাতি জ্ঞান করিতে হইবে? না, ব্রহ্মজ্ঞ ব্রাহ্মণ ও মুড়ইপোড়া ব্রাহ্মণ প্রভৃতিকে —সকলের ব্রাহ্মণনাম ধারণ হেতু সমান বলিয়া মনে করিতে হইবে? তাহা হইলে সিংহ ও শৃগালাদির লাঙ্গুল সাদৃশ্যে উহাদিগকে এক জাতি বলিয়া বিবেচনা করার ন্যায় মূঢ়তা প্রকাশ করা হইবে না কি? বারিধিমহাশয় কি যথার্থই আত্মবিস্মৃত হইয়াছেন। কেন যে তাঁহার এই বৃদ্ধ বয়সে বুদ্ধিভ্রংশ জন্মিল এবং কেনই বা তিনি আপনার পাণ্ডিত্য ও চরিত্রের উপর চিরকলঙ্ক আনয়ন করিলেন তাহা তিনিই জানেন। ব্রাহ্মণশোণিত কিরূপে এতদূর বিকৃত হইতে পারে তাহা আমরা বুঝিয়া উঠিতে পারি না। সে যাহা হউক, বয়সের দোষেই তিনি যে এরূপ বালচাপল্য প্রকাশ করিয়াছেন, ইহা মনে করিয়া আমরা তাঁহার সিদ্ধান্তকে উপেক্ষার যোগ্য বলিয়াই মনে করি। কিন্তু তিনি যে জনসমাজকে কলুষিত করিয়াছেন তাহা কখনই উপেক্ষার যোগ্য নহে কারণ অনভিজ্ঞ জনসাধারণ তাঁহার প্রলাপ বাক্যকেই সত্য বলিয়া মনে করিতে পারে।

এই নিমিত্ত সর্ব্বসাধারণের নিকট আমাদের বক্তব্য এই যে, ব্রাহ্মণবংশে জন্মিলেই ব্রাহ্মণ হয় না এবং সংস্কৃত ভাষায় ভাসিয়া বেড়াইলেই পণ্ডিত হয় না—ইহা তাঁহাদের জানা অবশ্য কর্ত্তব্য। মহাভারতে যুধিষ্ঠির-নহুষ সংবাদে লিখিত আছে যে, যুধিষ্ঠির কহিতেছেন,—'সকল জাতির মধ্যেই সঙ্করকে বলবান্ দেখা যায়, এজন্য মনুষ্য মধ্যে জাতি নির্ণয় করা সুকঠিন এবং চরিত্রই ব্রাহ্মণত্বের-

কারণ' (১২৬)। আর মনু বলিয়াছেন যে, প্রচ্ছন্ন সঙ্করদিগকে তাহাদের কর্ম্ম বা আচরণ দ্বারাই জানিতে হইবে (১২৭)। অতএব বৈদ্যেরা বর্ণসঙ্কর অথবা যাঁহারা বৈদ্যকে বর্ণসঙ্কর বলেন তাঁহারা স্বয়ংই বর্ণসঙ্কর এস্থলে তাহাই বিচার্য্য। পাঠক! আপনারা পূর্ব্বেই ঋষিমাত্রেরই এবং গোত্রকার মুনিদিগের বৈদ্যত্বের পরিচয় পাইয়াছেন [৮১ পৃষ্ঠায় "বৈদ্যের প্রতি ব্রাহ্মণ সম্প্রদায়ের বিদ্বেষ" নামক শীর্ষে দ্রষ্টব্য]। অতএব যে সকল ব্রাহ্মণ গোত্রপরিচয়ে বৈদ্য-ঋষিদিগের নামোল্লেখ করেন, অথচ মূলে বৈদ্য হইতে সম্পূর্ণ পৃথক্ বংশে জাত বলিয়া আত্মপরিচয় দেন, তাঁহারা যে শূদ্র ও বর্ণসঙ্করাদির ন্যায় অতিদিষ্ট গোত্র ভজনা করেন ইহা তাঁহাদের কথাতেই প্রকাশ পাইয়া থাকে। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তাঁহারা বৈদ্যঋষিদিগের গোত্রভূত হইয়াই বৈদ্য হইতে আপনাদের সম্পূর্ণ স্বাতন্ত্র্য বিজ্ঞাপন এবং তাহাদের প্রতি বিদ্বেষ প্রকাশ করিয়া থাকেন। পাঠক! যাঁহাদের পিতৃপুরুষ বৈদ্য, তাঁহাদের বৈদ্যের প্রতি এরূপ ব্যবহার সাঙ্কর্য্যের পরিচায়ক কিনা, তাহা আপনারাই বিচার করুন। আরও, শাস্ত্রে উক্ত হইয়াছে যে পুরাকালে যাহারা রাক্ষস ছিল, কলিতে তাহারা ব্রাহ্মণ হইয়াছে এবং বিভীষণ শ্রীরামচন্দ্রের শরণগ্রহণ কালে বলিয়াছিলেন যে, আমি যদি প্রতারণা করিতে আসিয়া থাকি তাহা হইলে আমি যেন কলির ব্রাহ্মণ হইয়া জন্মগ্রহণ করি। তিনি চণ্ডাল হওয়ার পরিবর্ত্তে কলির ব্রাহ্মণ হওয়ার অভিশাপ বরণ করিয়া লওয়ায় ইহাই বুঝাইয়াছে যে, তিনি কলির ব্রাহ্মণকে চণ্ডাল অপেক্ষাও অধম বলিয়া জ্ঞান করিয়াছিলেন; নতুবা আমি যেন চণ্ডাল হইয়া জন্মগ্রহণ করি এইরূপই বলিতেন। অতএব ইহা স্থির সিদ্ধান্ত যে, কলিতে ব্রাহ্মণ জাতির মধ্যে সদ্‌ব্রাহ্মণ ও ব্রহ্মরাক্ষস—যাহারা চণ্ডাল অপেক্ষাও অধম, উভয়ই বিদ্যমান। যে সকল ব্রাহ্মণ স্বভাবতঃ সরলপ্রকৃতি, সত্যনিষ্ঠ, সদাচার ও ধর্ম্মপরায়ণ, সর্ব্বজীবে দয়াবান এবং অমানিমানদ, তাঁহারাই সদ্‌ব্রাহ্মণ বা যথার্থ ব্রাহ্মণ পদবাচ্য এবং তাঁহারাই সর্ব্বলোকের পূজ্য। আর যাহারা ব্রাহ্মণবংশে জন্মিয়া ব্রাহ্মণোচিত গুণ অর্জ্জন ও কর্ত্তব্য পালনে সম্পূর্ণ অমনযোগী হইয়া যথেচ্ছাচারী ও কুকর্ম্ম-

আমরা বৈদ্যদিগের ব্রাহ্মণাচার পালনের প্রয়োজনীতা দেখাইলাম। কিন্তু শুধু ব্রাহ্মণাচার পালন করিলেও বৈদ্যের কার্য্য শেষ হইল না। কারণ বৈদ্য—সাধারণ ব্রাহ্মণ নহেন, বিশিষ্ট ব্রাহ্মণ। যাহাতে সাধারণ ব্রাহ্মণ হইতে তাঁহাদের বৈশিষ্ট রক্ষিত হয়, তৎপ্রতি মনোযোগ করাও তাঁহাদের কর্ত্তব্য। বিদ্যাতেই বৈদ্যের বিশেষত্ব ইহা বৈদ্যসন্তানমাত্রেরই স্মরণ রাখা উচিত। অতি প্রাচীনকালে বিপ্রগণের মধ্যে যাঁহারা সর্ব্ববেদে এবং সর্ব্বশাস্ত্রে অভিজ্ঞ হইয়া চিকিৎসা-নিরত হইতেন, তাঁহারাই বৈদ্যনামে অভিহিত হইতেন। 'বৈদ্য' শব্দের অর্থই হইতেছে বেদজ্ঞ, বিদ্বান্, পণ্ডিত। ইহাঁদের বৈদ্য নাম চিকিৎসার জন্য নহে. বিদ্যারই জন্য। এই বৈদ্য-বংশীয়দিগের মধ্যে এইরূপ বিদ্যাবত্তা ও চিকিৎসাপারদর্শিতা বংশপারম্পর্য্যে দৃষ্ট হওয়ায়, মুনিগণ তাঁহাদিগকে ব্রাহ্মণোচিত ষড়্‌বৃত্তির উপর চিকিৎসা-বৃত্তির অধিকার দিয়া একটি বিশিষ্ট জাতির সৃষ্টি করিয়াছিলেন। তদবধি

নিরত হয়, অথচ ব্রাহ্মণত্বের দোহাই দিয়া অহঙ্কার বশে লোকসকলকে অবজ্ঞা ও প্রতারণা করিয়া থাকে—ব্রাহ্মণজাতির কলঙ্কস্বরূপ সেই সকল মূর্খ, সর্ব্বধর্ম্ম-বর্জ্জিত, বৃথা ব্রাহ্মণ্যগর্ব্বিত, নরাধম পশুগণই ব্রহ্মরাক্ষস বা 'কলির ব্রাহ্মণ' পদবাচ্য। ইহারাই বৈদ্যকে অবজ্ঞা করে ও সগর্ব্বে বর্ণসঙ্কর প্রভৃতি বলিয়া অযথা গালি দিয়া বেড়ায়। জানি না আর কত কাল নিরীহ বৈদ্যগণকে ব্রহ্মরাক্ষস-দিগের অত্যাচার সহ্য করিতে হইবে! কতদিনে বৈদ্যেরা ইহাদিগের কবল হইতে সম্পূর্ণরূপে মুক্তি লাভ করিবেন! হে বৈদ্যভ্রাতৃগণ! আপনারা সাবধান হউন, যেন ব্রাহ্মণের পূজা করিতে যাইয়া ব্রহ্মরাক্ষসের পূজায় প্রবৃত্ত হইবেন না। যাহারা মূর্খতা বা বিদ্বেষ বশতঃ বৈদ্যকে ব্রাহ্মণ বলিয়া স্বীকার করিতে চাহে না, হউক না কেন গুরু, হউক না কেন পুরোহিত, তাহাদিগকে কাল সর্প বিবেচনা করিয়া দূরে পরিত্যাগ করিবেন। কাঠ পাথর পূজা করিয়া জীবন অতিবাহন করিবেন সেও ভাল, তথাপি কখনই ব্রহ্মরাক্ষসদিগের শরণাপন্ন হইবেন না।

অপর ব্রাহ্মণের চিকিৎসাধিকার রহিত হওয়ায় ইঁহাদের 'জাতিবৈদ্য' নাম হইয়াছিল এবং এই জাতিবৈদ্যের প্রদত্ত ঔষধ বা জলবিন্দু মৃত্যুকালে স্বর্গপ্রদ বলিয়া প্রসিদ্ধ হইয়াছিল। বিশিষ্ট বিদ্যাবত্তা ও চিকিৎসাকুশলতা বৈদ্যত্বের কারণ বলিয়া, এই দুইটি বিষয়ে ঔদাসীন্যই প্রকৃতপক্ষে বৈদ্যদিগকে মলিন করিয়া ফেলিয়াছে। অতএব বৈদ্যগণ যাহাতে ব্রাহ্মণাচার পালনের সঙ্গে পুণ্যতম আয়ুর্ব্বেদ এবং অন্যান্য বেদ, স্মৃতি, দর্শন প্রভৃতি সংস্কৃত শাস্ত্র ও সাহিত্য অধ্যয়ন করিতে পারেন, তাহারও একটা ব্যবস্থা করা প্রয়োজন। পেটের দায়ে ইংরাজী শিক্ষা করিতে বাধ্য হইলেও আত্মোন্নতি ও জ্ঞানোন্নতির জন্য তাঁহাদের যথাসম্ভব সংস্কৃত শিক্ষা আবশ্যক।

বৈদ্যদিগের সর্ব্ববিধ জাতীয় সংস্কারের জন্য সঙ্ঘবদ্ধ হওয়া উচিত এবং তজ্জন্য তাঁহাদের মধ্যে আচারসাম্যের প্রয়োজন। কিন্তু ব্রাহ্মণাচার ব্যতীত অন্যবিধ আচার বৈদ্যের পক্ষে শাস্ত্রবিহিত না হওয়ায়, তদ্বারা আচারসাম্য অসম্ভব। কারণ শাস্ত্রানুগমন ব্যতীত লোকসকলের যথেচ্ছারিতা নিবারিত হয় না, সুতরাং পরস্পরের মধ্যে একতা অভাবে সঙ্ঘবদ্ধ হওয়া ঘটে না। এক্ষণে ব্রাহ্মণ শূদ্রাদি সকলেই পদে পদে বৈদ্যকে অবমানিত ও লাঞ্ছিত করিতেছেন, ইহার কারণ এ দেশে বৈদ্যের সংখ্যা মুষ্টিমেয় এবং তাহার উপর সকলে এক মত নহেন। বৈদ্যবিদ্বেষ বহুকাল হইতে এ দেশে সংক্রামক হইয়া পড়িয়াছে। তাহার ফলে এবং ব্রাহ্মণাচার পালনে ঔদাসীন্য হেতু বৈদ্যগণ সমাজে দিন দিন অধঃপতিত হইতেছেন। এই ভাবে আর কিছুকাল চলিলে তাঁহাদিগকে সম্যক্‌রূপে জাতি হারাইয়া ব্রাহ্ম প্রভৃতির ন্যায় হিন্দুসমাজ-বহির্ভূত একটা বাহ্যজাতিরূপে পরিণত হইতে হইবে, বৈদ্য-ভ্রাতৃগণ ইহা ভাবিয়া দেখিয়াছেন কি? অতএব যাহাতে ভারতের অন্য সকল প্রদেশের বৈদ্যগণের মত ব্রাহ্মণাচার অবলম্বন পূর্ব্বক সকলে একতাসূত্রে আবদ্ধ হইতে পারেন, অবিলম্বেই তাহার উপায় বিধান করা কর্ত্তব্য।

এই উদ্দেশ্যসাধনের জন্য প্রায় দুই বৎসর কাল হইল কলিকাতা মহানগরীতে একটি 'বৈদ্যব্রাহ্মণ' সমিতি গঠিত হইয়াছে। ইহাতে কৃতবিদ্য বৈদ্যগণ যোগদান করিয়াছেন ও করিতেছেন। এই সমিতি এত অল্পকালে যেরূপ বৈদ্যসমাজে সদাচার প্রবর্ত্তিত করিয়াছেন ও করিতেছেন তাহা বিশেষ প্রশংসনীয়। কিন্তু বৈদ্যসাধারণের সহানুভূতি ও অর্থাদি সাহায্য ব্যতীত এই সংস্কারকার্য্যে সম্যক্ সিদ্ধিলাভ করা দুরূহ। অতএব হে বৈদ্যভ্রাতৃগণ! আপনারা আপনাদের বর্ত্তমান ও ভবিষ্যৎ অবস্থার বিষয় পর্য্যালোচনা করিয়া, বৈদ্যব্রাহ্মণ-সমিতির বল বৃদ্ধি করিবার জন্য সকলে যোগদান পূর্ব্বক যথাসাধ্য সাহায্য করুন এবং স্থানে স্থানে শাখা সমিতি গঠন করিয়া বৈদ্যসাধারণের মধ্যে ব্রাহ্মণাচার প্রবর্ত্তনের চেষ্টা করুন, ইহাই আপনাদের নিকট আমাদের বিনীত প্রার্থনা। এখন দ্বেষাদ্বেষি ও দলাদলি করিয়া কার্য্য পণ্ড করিবার সময় নহে; জানিবেন অতি গুরুতর সময় আসিয়া পড়িয়াছে। যাহা হউক, এই সমিতি শক্তি-সম্পন্ন হইলে বৈদ্যসমাজের সকল প্রকার উন্নতিই সহজসাধ্য হইবে। তবেই আপনাদের বৈদ্যনাম ধারণ সার্থক হইবে এবং আপনারা পিতৃপুরুষদিগের আশীর্ব্বাদ লাভ করিয়া কৃতকৃতার্থ হইবেন। অধিক কি, আপনাদের আদর্শে সমগ্র হিন্দু-সমাজই জাগিয়া উঠিবে। ইহা অলীক কল্পনামাত্র নহে। এক সময়ে বৈদ্যরাজগণ কর্ত্তৃকই বঙ্গদেশে লুপ্ত ব্রাহ্মণ্যধর্ম্মের পুনরুদ্ধার ও প্রতিষ্ঠা হইয়াছিল ইহা কি আপনারা অবগত নহেন? না, আপনারা ইহা বিস্মৃত হইয়াছেন? আপনাদের দ্বারাই এই কার্য্য সুসম্পন্ন হওয়া বিশেষ সম্ভব। কিন্তু যদি আপনাদের ঔদাসীন্য বশতঃ এই সমিতি উন্নতির পথে অগ্রসর হইতে না পারিয়া ধ্বংসমুখে পতিত হয়, তাহা হইলে বৈদ্যসমাজের অবস্থা অতীব শোচনীয় হইবে বলিয়াই আমাদের মনে হয়।

প্রথম পরিশিষ্ট।

বৈদ্যের ব্রাহ্মণত্ব প্রতিপাদনে ব্রাহ্মণ পণ্ডিতদিগের পত্র।*

১। বঙ্গদেশের অতিপ্রসিদ্ধ স্মার্ত্তশিরোমণি

পণ্ডিতপ্রবর শ্রীযুক্ত দক্ষিণাচরণ স্মৃতিতীর্থ

মহাশয়ের পত্র—

অশেষশাস্ত্রাধ্যাপক—

মহামহোপাধ্যায় শ্রীগণনাথ সেনশর্ম্মা সরস্বতী মহাশয় সুচরিতেষু।

শুভাশিষাং রাশয়ঃ সন্তুবিশেষঃ—

ভবৎপ্রেরিত বৈদ্যপ্রবোধনী নাম্নী পুস্তিকা পাঠে আমার বৈদ্যসম্বন্ধীয় অনেক সন্দেহ দূরীভূত হইল। বৈদ্য যে মন্বাদিপ্রোক্ত অম্বষ্ঠজাতীয় নহে—পরন্তু বিশুদ্ধ ব্রাহ্মণ, এতদ্ বিষয়ে আর কোন সন্দেহ রহিল না। কারণ

---

* বৈদ্যব্রাহ্মণ-সমিতি ব্রাহ্মণপণ্ডিতদিগের নিকট হইতে যে পত্রগুলি প্রাপ্ত হইয়াছেন তৎসম্বন্ধে অনেকের ধারণা এই যে, ঐ গুলি অসৎ উপায়ে সংগৃহীত, বস্তুতঃ উহাতে আন্তরিকতা নাই। ইহার উত্তরে প্রথমতঃ 'বৈদ্য হিতৈষিণী' পত্রিকায় যাহা লিখিত হইয়াছে, [১ম বর্ষ ৭ম সংখ্যা দ্রষ্টব্য] তাহা এস্থলে উদ্ধৃত হইল। যথা—"অনেকে আমাদিগকে জিজ্ঞাসা করিতেছেন, ব্রাহ্মণপণ্ডিতেরা কিরূপে বশীভূত হইলেন? কেহ কেহ এমনও মনে করিতেছেন যে, আমরা হয়তো অর্থ দ্বারা কোন কোন ব্রাহ্মণপণ্ডিতকে বশ করিয়াছি। এই সকল ব্যক্তির সন্দেহ নিরসনার্থ আমরা মুক্ত কণ্ঠে বলিতে বাধ্য হইতেছি যে, আমরা

আপনাদের উদ্ধৃত শাস্ত্রীয় ও ঐতিহাসিক প্রমাণাবলী ও যুক্তিসমূহ অখণ্ডনীয় বলিয়াই বোধ হইল। বৈদ্যগণ কিয়ৎকাল যাবৎ গুপ্তান্ত উপাধি ও পক্ষাশৌচ পালন করিয়া যে তাঁহাদের পিতৃকার্য্যাদি পণ্ড করিয়াছেন, তাহাও আমি অস্বীকার করিতে পারি না। তবে সুখের বিষয় এই যে, উপাধি বিপর্য্যয় বা অশৌচকাল বর্দ্ধন প্রায়শ্চিত্তার্হ রূপে কোন শাস্ত্রে উল্লেখ নাই। তথাপি "শর্ম্মন্নর্ঘ্যাদিকে কার্য্যমিত্যাদি" এবং "ন বর্দ্ধয়েদঘাহানি" (অর্থাৎ 'অর্ঘ্যাদিদানে 'শর্ম্মণ্' শব্দের ব্যবহার কর্ত্তব্য' এবং 'অশৌচের দিন বাড়াইবে না') ইত্যাদি শাস্ত্রব্যবহার অপালনে যে প্রত্যবায় আছে তাহাতে সন্দেহ নাই। এতাবতা আপনাদের শর্ম্মান্ত উপাধি গ্রহণ ও দশাহ অশৌচ পালন আমিও সর্ব্বান্তঃকরণে অনুমোদন করি। অপিচ, ইহাও আশা করি যে, সকল শাস্ত্রজ্ঞ সদ্‌ব্রাহ্মণই অচিরে আপনাদের স্বধর্ম্মপালনে সহায়তা করিয়া স্মৃতিশাস্ত্রের মর্য্যাদা সম্যক্ পালন করিবেন। ইতি—

বাগবাজার, কলিকাতা।	শ্রীদক্ষিণাচরণ স্মৃতিতীর্থ
৭ই ফাল্গুন, সন ১৩২১ সাল।	কলিকাতা পণ্ডিতসভার সম্পাদক।

কখনও কোন ব্রাহ্মণপণ্ডিতকে অর্থের বা অন্য কোনরূপ প্রলোভন দেখাই নাই। যাঁহারা সত্যনিষ্ঠ ও ধার্ম্মিক তাঁহারা স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া আমাদের সহায় হইয়াছেন ও হইতেছেন। বরং অর্থ দিয়া অনুমোদন লওয়া অত্যন্ত অপমানকর মনে করিয়া আমরা কোন কোন অর্থলোভী ব্রাহ্মণপণ্ডিতের সাহায্য প্রত্যাখ্যান করিতে বাধ্য হইয়াছি। দ্বিতীয়তঃ বৈদ্যব্রাহ্মণ সমিতি প্রতিষ্ঠার বহু পূর্ব্বেও ব্রাহ্মণপণ্ডিতগণ বৈদ্যকে 'শর্ম্মা' নামে ভূষিত করিয়াছেন দেখা যায় [১৮।১৯ ২০।২১ সংখ্যক পত্র দ্রষ্টব্য]। অতএব প্রতিবাদীদিগের সন্দেহ যে অমূলক তাহা প্রতিপন্ন হইল।

২। ভট্টপল্লীর প্রসিদ্ধ সর্ব্বজনমান্য গুরুবংশধর ৺মহামহোপাধ্যায় রাখালদাস ন্যায়রত্ন মহাশয়ের ভ্রাতুষ্পুত্র

পণ্ডিত শ্রীযুক্ত কাশীপতি ভট্টাচার্য্য স্মৃতিভূষণ

মহাশয়ের পত্র—

স্নেহাস্পদ শ্রীল শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রমোহন সেনশর্ম্ম-

মহোদয় সুচরিতেষু—

ইতঃপূর্ব্বে আপনি একাদশাহে যথাবিধি ব্রাহ্মণোচিত মাতৃশ্রাদ্ধ করিয়াছেন, তদবধি আপনাদের বৈদ্যশ্রেণীর অনেক ব্রাহ্মণ দশাহ অশৌচ পালন করিতেছেন শুনিয়া ও দেখিয়া আমরা আনন্দিত হইয়াছি। এতকাল পরে আপনারা যে আপনাদের স্বরূপবোধে অবহিত হইতে পারিয়াছেন, ইহাই আমাদের আনন্দের কারণ। বৈদ্যজাতি যে ব্রাহ্মণবর্ণ আমরা ইহা চিরদিনই জানি এবং বিশ্বাস করি। আমাব জ্যেষ্ঠতাত-মহাশয় প্রখ্যাতনামা ৺ মহামহোপাধ্যায় রাখালদাস ন্যায়রত্ন ভট্টাচার্য্য মহাশয় এই কথা আপনার জ্যেষ্ঠ সহোদরকে—স্বনামধন্য গণিতাধ্যাপক ৺ কিশোরীমোহন সেনকে প্রায় ত্রিশ বৎসর পূর্ব্বে আপনার সাক্ষাতে বলিয়াছিলেন, তাহা আপনারও স্মরণ থাকিতে পারে। বৈদ্য যে মনূক্ত চিকিৎসাবৃত্তিক জাতি-অম্বষ্ঠ নহে সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। বিপ্রবর্ণ ভিন্ন কেহ পুরাকালে বৈদ্য ও ভিষক্ নামে অভিহিত হইতে পারিত না। যে বৈদ্যকে বেদে ও রামায়ণে "সর্ব্বতাত" কথা বলা হইয়াছে, তাহা বিপ্রবর্ণ ভিন্ন অন্য বর্ণকে বলা যাইতে পারে না। সর্ব্ববেদ ও স্মৃতিপুরাণাদি অধ্যয়নান্তে বিপ্র পুণ্যতম আয়ুর্ব্বেদে দ্বিতীয় উপনয়ন দ্বারা প্রবেশলাভ পূর্ব্বক বৈদ্য ও ভিষক্ নাম প্রাপ্ত হইতেন। হিন্দু রাজাদের সময় হইতে অবিচ্ছিন্নরূপে বৈদ্য ও ত্রিজ ভিষক্ নাম ধারণ ও বিপ্রের বৃত্তি পালনই আপনাদের ব্রাহ্মণত্ব প্রমাণ

করে, অন্য কোন প্রমাণ প্রয়োজন নাই। এতদিন এই গৌরবান্বিত বৈদ্য-ব্রাহ্মণ যে নিদ্রিত ছিলেন ও অনবধানতা প্রযুক্ত কতকগুলি কদাচার পালন করিতেছিলেন, ইহা অত্যন্ত আশ্চর্য্যের ও দুঃখের বিষয়। আপনাদের সমস্ত সমাজে দশাহ অশৌচ ও শর্ম্মান্ত নাম পালন অবশ্য কর্ত্তব্য। আশা করি, আপনারা তাহাতে চেষ্টার ক্রটী করিবেন না। ধর্ম্মভীরু সদ্‌ব্রাহ্মণগণ এ বিষয়ে নিশ্চয় আপনাদের সহায়তা করিবেন। ২৬ শে কার্ত্তিক ১৩৩১

ভট্টপল্লীবাস্তব্য স্মৃতিভূষণোপাধিক
শ্রীকাশীপতি দেবশর্ম্মা।

৩। থানাকুল কৃষ্ণনগরান্তঃপাতী সোনটিকরি গ্রামনিবাসী
পণ্ডিতপ্রবর শ্রীযুক্ত নীরদবরণ বিদ্যারত্ন (দেবশর্ম্মা)
মহাশয়ের মত্র—

শ্রীপঞ্চানন দত্তশর্ম্মা স্নেহাস্পদেষু—

বৈদ্যগণ শর্ম্মান্ত উপাধি ব্যবহার এবং দশ দিবস অশৌচ পালন করিয়া একাদশাহে ব্রাহ্মণোচিত শ্রাদ্ধ করিতেছেন দেখিয়া আমি বিশেষ আনন্দিত হইয়াছি। চাতুর্ব্বর্ণ্য সৃষ্টির প্রারম্ভ হইতে অদ্যাবধি বৈদ্যেরা ব্রাহ্মণের ষড় বৃত্তি গ্রহণ করিয়া রহিয়াছেন এবং টোল করিয়া দ্বিজ ত্রিবর্ণকে সর্ব্বশাস্ত্র এবং দেবভাষা অধ্যাপন করাইতেছেন ইহাই তাঁহাদের শ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণ্য-ব্যবহার। সর্ব্ব বেদ, স্মৃতি, পুরাণ, বেদাঙ্গাদি অধ্যয়নান্তে দ্বিজ বিপ্র ব্রহ্মচর্য্যাবস্থায় পুনরুপনীত হইয়া আয়ুর্ব্বেদবিৎ হইলে ভিষক্, ত্রিজ ও বৈদ্য উপাধি প্রাপ্ত হইতেন। বহু বংশ পরম্পরাক্রমে যে বিপ্রগণ এইরূপে বৈদ্য

হইয়াছিলেন তাঁহাদেরই বংশধরগণ এক্ষণে বৈদ্যজাতিতে পরিণত, ইহা একবিধ ব্রাহ্মণশ্রেণী মাত্র। মহাভারতে যে বৈদ্যগণকে মুক্তকণ্ঠে দ্বিজবর্ণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ বলা হইয়াছে, সর্ব্ব দ্বিজবর্ণের মধ্যে বিদ্যবত্তায় শ্রেষ্ঠ বলিয়া যাঁহাদের সম্বন্ধে স্বয়ং মনু "বিদ্বাংসঃ" পদ ব্যবহার করিয়াছেন, তাঁহারা কি প্রকারে মোহান্ধকারে স্বরূপ বিস্মৃত হইয়াছিলেন ইহাই আশ্চর্য্য। বৈদ্যের হৃদয়ে নিজ ব্রাহ্মণ্যবিশ্বাস ভস্মাচ্ছাদিত বহ্নিবৎ রহিয়াছে। মোহরূপ ভস্ম দূর করিলেই পুনরায় তাহা প্রদীপ্ত হইয়া উঠিবে। বৈদ্য-ব্রাহ্মণ সমিতির এই মোহ দূরীকরণ প্রচেষ্টা সর্ব্বোতোভাবে প্রশংসার্হ। বৈদ্যের ব্রাহ্মণত্বে সংশয় নাই। এখনও এদেশে তাঁহাদের বৈদ্যব্রাহ্মণ প্রসিদ্ধি আছে। অতএব সমগ্র বৈদ্যসমাজের অবিলম্বে দশাহ অশৌচ এবং শর্ম্মান্ত নাম পালন অবশ্য কর্ত্তব্য। সদ্ব্রাহ্মণগণ এ বিষয়ে আপনাদের সহায় হইবেন। "যতো ধর্ম্ম স্ততঃ কৃষ্ণো যত্র কৃষ্ণ স্ততো জয়ঃ।" আপনার অবগতির জন্য লিখিতেছি—আমার গ্রামবাসী যজমান মায়াপুর রসুলপুর-প্রবাসী কবিরাজ পণ্ডিত শ্রীযুক্ত কালীপদ দাশ কাব্যতীর্থ কবিরত্ন বাবা-জীবনের চতুষ্পাঠীতে ব্রাহ্মণ ও বৈদ্যব্রাহ্মণ ৮।১০টি ছাত্র নানা শাস্ত্র অধ্যয়ন করেন। অধ্যাপনাদি ইঁহাদের বংশপরম্পরা হইয়া আসিতেছে। আমিও বহুদিন যাবৎ বৈদ্যব্রাহ্মণের টোলে অধ্যয়ন করিয়াছি। অলমতি বিস্তরেণ। ২২শে চৈত্র সন ১৩৩১ সাল।

শ্রীনীরদবরণ বিদ্যারত্ন (দেবশর্ম্মা)।

৪। স্মৃতিশাস্ত্রের অধ্যাপক

পণ্ডিতবর শ্রীযুক্ত দ্বারকানাথ স্মৃতিভূষণ

মহোদয়ের পত্র—

স্বস্তি শ্রীদ্বারকানাথ দেবশর্ম্মণঃ শুভাশীর্ব্বিজ্ঞপ্তিরেষা—

যতীন্দ্র বাবু

আপনি জানেন কিনা বলিতে পারি না আমি অনুসন্ধানে জানিতে পারিয়াছি বাঙ্গালার দাক্ষিণাত্য বৈদিকগণের মধ্যে ধর, নন্দী প্রভৃতি উপাধি আছে এবং বৈদিক ধরাদির উপাদিতে যে যে গোত্র. প্রবর ও বেদশাখা আপনাদেরও সেই উপাধিতে সেই গোত্র প্রবর ও বেদশাখা দেখিতে পাওয়া যায়। এইরূপ আশ্চর্য্য সমানতা আছে। আরও অনুধাবন করিবার বিষয় এই যে, দাক্ষিণাত্য বৈদিকগণ উড়িষ্যা হইতে আগত এবং আপনাদের কুলচীতেও কটক যাজপুর ব্রাহ্মণগণের সহিত ২৫০।৩০০ বৎসর পূর্ব্বে বিবাহাদি হইত ইহার উল্লেখ আছে। ইহাতে ধারণা সুদৃঢ় হয় যে, দাক্ষিণাত্য বৈদিক ও বৈদ্য—ব্রাহ্মণজাতির একই শাখা। আরও ব্রাহ্মণেরই ব্যবহার্য্য ওঝা, মিশ্র, পাঁড়ে, দোবে, চোবে প্রভৃতি উপাধিগুলি আবহমান কাল হইতে অদ্যাপিও বাঁকুড়া, বীরভূম, মানভূম অঞ্চলের বৈদ্যগণ ব্যবহার করিয়া আসিতেছেন, ঐ সকল অঞ্চলের লোকেরাও তাঁহাদিগকে ঐ উপাধিতেই সম্ভাষণ অভিবাদনাদি করেন। আপনাদের কুলচীতেও বৈদ্যের চক্রবর্ত্তী, মিশ্র, শিরোমণি, চূড়ামণি, বাচস্পতি প্রভৃতি ব্রাহ্মণমাত্রের ব্যবহার্য্য উপাধিগুলির ছড়াছড়ি দেখিতে পাওয়া যায়। আরও ইংরাজাধিকারের অব্যবহিত প্রাকালে আপনারই বৃদ্ধ প্রমাতামহকে ব্রহ্মোত্তর দানের পত্রও দেখিয়াছি। আরও, বৈদ্যের

বৈশ্যোচিত বর্ণকারক কোন বৃত্তি থাকার কথাও কেহ কখনও শুনে নাই। অদ্যাপি তাঁহারা ব্রাহ্মণের ষড়্‌বৃত্তিক হইয়া রহিয়াছেন, বিশেষতঃ অধ্যাপনা তাঁহাদের চিরপ্রসিদ্ধ, সর্ব্বজনে স্বীকৃত। আমাদের হাবড়া জেলায়ও আপনাদের শ্রেণীয়গণ বৈদ্যব্রাহ্মণ (বদ্দি বামুন) নামে প্রসিদ্ধ। আপনি যখন সেনশর্ম্মা উপাধি ব্যবহার পুর্ব্বক একাদশাহে নিজ জননীর আদ্যকৃত্য করেন তখন আমি সানন্দে অধ্যাপক-বিদায়াদিতে অধ্যক্ষতা করি। তদবধি আমি বৈদ্যগণের সম্বন্ধে বহু শাস্ত্রাদি ও অন্যান্য আলোচনা দ্বারা নিঃসন্দেহ হইয়াছি যে, বৈদ্যগণ অন্যান্য সদ্‌ব্রাহ্মণের ন্যায় এক শ্রেণীর ব্রাহ্মণ।

আপনারা যেহেতু ব্রাহ্মণ সেই হেতু আপনাদের সত্বর গুপ্তান্ত উপাধি ও পঞ্চদশাহ অশৌচ পরিহার পূর্ব্বক শর্ম্মান্ত নাম ও দশাহ অশৌচ গ্রহণ করা কর্ত্তব্য নচেৎ আপনাদের দৈব পিত্র্য কার্য্য অসিদ্ধ হইয়া যায়।

আপনাদিগের এই সংস্কারের সংবাদ পাইলে অত্যন্ত সুখী হইব। দুঃখের বিষয় এখনও বিদ্বান্ বৈদ্যদিগের মধ্যে কোন কোন সম্ভ্রান্ত বৈদ্য গুপ্তান্ত নাম ব্যবহার ও পঞ্চদশাহ অশৌচ পালন দ্বারা নিজ দৈব পিত্র্য কার্য্যের অসিদ্ধি ও স্বশ্রেণীর অপমান করা হইতেছে বলিয়াও তাহা হইতে বিরত হইতেছেন না। ঐ সকল ব্যক্তিকে সমাজ দ্বারা শাসন করিয়া সমাজের যাহাতে মঙ্গল হয় তাহা করিবেন। অলমতি বিস্তরেণ

১৯শে পৌষ বৃহস্পতিবার ১৩৩১

৫। খানাকুল কৃষ্ণনগর নিবাসী

শ্রীঅভিরাম চূড়ামণি

মহাশয়েব পত্র—

শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রমোহন গীতাচার্য্য

শ্রীযুক্ত জ্যোতিঃপ্রকাশ ভাগবতভূষণ

চিরজীবেষু—

মহাশয়, ভবৎপ্রেবিত বৈদ্যপ্রবোধনী পাইয়া আমার বৈদ্যজাতির বিপ্রবর্ণত্ব এবং ত্রিজত্ববিষয়ক সর্ব্ব সংশয় ছিন্ন হইয়াছে। দেশব্যাপী বৈদ্যব্রাহ্মণ প্রসিদ্ধি এবং অধ্যাপনাদি ব্রাহ্মণের শ্রেষ্ঠ আচার এই সত্যই আবহমান কাল ঘোষণা করিতেছে। আমাব বয়স ৭২ বৎসব। বাল্য-কালে মাতুলালয়ে বহুবাব শুনিয়াছি যে, রাজা নবকৃষ্ণের পুত্র রাজা বাজ-কৃষ্ণের আহূত একটি ব্রাহ্মণপণ্ডিত সভায় এই প্রমাণ হয়। তখনকার অদ্বিতীয় পণ্ডিত ত্রিবেণীর সুপ্রসিদ্ধ জগন্নাথ তর্কপঞ্চাননের নেতৃত্বে সেই সভা হয় এবং তাহাতে আমার মাতামহ উপস্থিত ছিলেন। পণ্ডিতগণ সমবেত হইলে রাজা বলিলেন—অধ্যাপকগণ! এই বৈদ্যজাতীয় কবিরাজ রামপ্রসাদ চিন্তামনি ব্রাহ্মণের মত উর্দ্ধপুণ্ড্র ধারণ করেন, আমি আপত্তি করায় তিনি বলেন তাঁহার শাস্ত্রীয় অধিকার আছে। আপনারা নিরপেক্ষ ভাবে বিচার করুন ব্রাহ্মণের উর্দ্ধপুণ্ড্রে বৈদ্যজাতির অধিকার আছে কি না। তর্কপঞ্চানন বলিলেন,বৈদ্যের ব্রাহ্মণত্ব ও উর্দ্ধপুণ্ড্র ব্যবহারের অধিকার সম্বন্ধে যথেষ্ট প্রমাণ আছে, অল্প সময়ে সেই সমস্ত প্রমাণের অবতারণা ও আলোচনা সম্ভব নহে। তবে তিনি দুই একটী প্রমাণ দিবেন তাহা হইলেই যথেষ্ট হইবে। এই বলিয়া তিনি মহাভারত হইতে একটি প্রমাণ

দিলেন তাহার একাংশ "দ্বিজেষু বৈদ্যাঃ শ্রেয়াংসঃ"। আপনাদেব বৈদ্য-প্রবোধনীর ২য় পৃষ্ঠার প্রথমেই আছে। এবং চরকের বচনটি প্রমাণ দিলেন তাহাও ঐ পুস্তকে ৩য় পৃষ্ঠার শেষে প্রদত্ত হইয়াছে। এতদ্ভিন্ন মুকুন্দরাম কবিকঙ্কনের অতি প্রামাণ্য চণ্ডীগ্রন্থ হইতে "বৈদ্যগণের ভালে উর্দ্ধফোটা" ধারণের প্রমাণ দেন। তখন সমবেত পণ্ডিতগণ সর্ব্ব সম্মতি-ক্রমে স্বীকার করিলেন যে বৈদ্যজাতি বিপ্রবর্ণ ও তাহাদের উর্দ্ধপুণ্ড্র ধারণাদি সর্ব্ব ব্রাহ্মণাধিকাব আছে।

৭০নং সিমলা ষ্ট্রীট
কলিকাতা
তারিখ ১২ই চৈত্র ১৩৩১ সাল

ভবদীয় শুভানুধ্যায়ী
থানাকুল কৃষ্ণনগব বাস্তব্য
শ্রীঅভিরাম চূড়ামণি

৬। মেদিনীপুর জেলার অন্তর্গত গোবিন্দপুর চতুষ্পাঠীর অধ্যাপক

পণ্ডিত শ্রীযুক্ত হরিপদ স্মৃতিরত্ন

মহাশয়ের পত্র—

অশেষশাস্ত্রাধ্যাপক সুরাচার্য্যকল্প গীতাচার্য্য শ্রীল শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রমোহন সেন শর্ম্ম মহোদয়েষু—

সবিনয় নমস্কার নিবেদনম্

মহাশয় ভবৎপ্রেরিত "বৈদ্য প্রবোধনী" নাম্নী পুস্তিকা পাঠে আমার হৃদ্বোধ হইল এই যে, বৈদ্যজাতি মনুক্ত অম্বষ্ঠ নহে, বিশুদ্ধ বিপ্রশ্রেণীর ব্রাহ্মণ বা দ্বিজশ্রেষ্ঠ। এতৎপক্ষে অনুমাত্র সন্দেহের কারণ আমার নাই। অতএব আমি সর্ব্বান্তঃকরণে বলিতেছি যে, আপনাদের বৈদ্যশ্রেণীর

[ব্রাহ্ম]ণমাত্রেরই অবিলম্বে দশাহাশৌচ ও শর্ম্মান্ত পদবী প্রয়োগ করা অবশ্য কর্ত্তব্য। হিন্দুধর্ম্মাবলম্বী হইয়া ইহার ব্যতিক্রম করিলে স্মৃতিশাস্ত্রের মর্য্যাদার হানি করা হয়। অলমতি বিস্তরেণ। ইতি ২৬শে ফাল্গুন, ১৩৩১ সাল।

স্মৃতিরত্নোপাধিক-
শ্রীহরিপদ দেবশর্ম্মণাম্।

৭। বসুমতী কার্য্যালয় হইতে প্রকাশিত
"ক্রিয়াকাণ্ডবারিধির" লেখক নানা শাস্ত্রাধ্যাপক
পণ্ডিতাগ্রগণ্য শ্রীযুক্ত নৃত্যগোপাল ভট্টাচার্য্য পঞ্চতীর্থ
মহাশয়ের পত্র—

অশেষশাস্ত্রালোচনোন্মীলিতলোচন
শ্রীবিজয়কৃষ্ণ রায় মহাশয় কবিরাজ-রাজেষু—

সহৃদয় কবিরাজ মহাশয়!

আপনার প্রেরিত বৈদ্য-প্রবোধনী পাঠে বুঝা যায় যে, আপনাদের স্বপক্ষ স্থাপনে প্রদর্শিত যুক্তি ও প্রমাণ শাস্ত্রানভিজ্ঞের প্রলাপ বাক্য নহে। আমি আপনাদের প্রতিপাদ্য বিষয়ের বিরোধী প্রমাণ দ্বারা প্রতিবাদ করিতে অক্ষম। অতএব মনে হয় হিন্দু মাত্রেরই শাস্ত্রমর্য্যাদা রক্ষণীয়।

ভবদীয়
শ্রীনৃত্যগোপাল পঞ্চতীর্থ দেবশর্ম্মণঃ
অভিমতমিদম্।
বালিগঞ্জ শীতল চতুষ্পাঠী

৮। কলিকাতা হাতিবাগান চতুষ্পাঠীর অধ্যাপক

পণ্ডিতপ্রবর প্রমথনাথ বিদ্যারত্ন

মহাশয়ের পত্র—

কবিরাজ ইন্দুভূষণ সেন শর্ম্মা ভিষক্‌রত্ন আয়ুর্ব্বেদশাস্ত্রী

সমীপে—

কল্যাণবরেষু—

বাবা ইন্দুভূষণ, বৈদ্যপ্রবোধনী পুস্তিকা পাঠ করিয়া বিশেষ আনন্দিত হইলাম। তোমরা এতদিন পরে যে নিজেদের স্বরূপ বুঝিতে পারিয়াছ ইহাই আমার আনন্দের বিষয়। আমি ইতিপূর্ব্বে তোমার ভগিনীদের ব্রাহ্মণোচিত বৈদিক পদ্ধতি অনুসারে বিবাহ কার্য্যাদি করিয়াছি তাহাও তুমি জ্ঞাত আছ। যাহা হউক, তোমরা যে "আমাদেরই" একজন তাহাতে কোন সংশয় নাই। আমি তোমাদের সমিতির সাফল্য কামনা করিতেছি। যদি কোন বৈদ্যব্রাহ্মণের ক্রিয়াকলাপে পুরোহিত গিয়া কার্য্য করিতে অগ্রসর না হন, আমাকে জানাইলে আমি পৌরহিত্য করিতেও স্বীকৃত আছি। অলমতি বিস্তরেণ। ইতি তাং ২২শে অগ্রহায়ণ সন ১৩৩১ সাল।

বিদ্যারত্নোপাধিক
শ্রীপ্রমথনাথ দেবশর্ম্মা
হাতিবাগান চতুষ্পাঠী, কলিকাতা।

৯। পূজ্যপাদ শ্রীশ্রীনিবাস আচার্য্য প্রভুর সন্তান

প্রভুপাদ শ্রীযুক্ত কংসারিলাল ঠাকুর গোস্বামী

মহাশয়ের পত্র—

পরম স্নেহভাজন শ্রীমান্ জ্যোতিঃপ্রকাশ সেন দেবশর্ম্মা

ভাগবতভূষণ সমীপে—

বাবাজীবন,

তোমাদের 'বৈদ্যের কর্ত্তব্য' ও 'বৈদ্য প্রবোধনী' পুস্তকাদি পাঠে নিঃসংশয় জানিলাম যে বৈদ্যেরা ব্রাহ্মণ। অবশ্য এ বিষয় আমরা পূর্ব্বেই জানিতাম এবং তদনুযায়ী তোমাদের ব্রাহ্মণোচিত আচারে দীক্ষা দান করিয়া আসিতেছি। তোমাদের জাতীয় উন্নতির কার্য্যে আমার পূর্ণ সহানুভূতি আছে এবং শ্রীকৃষ্ণের নিকট প্রার্থনা করি যে তোমরা এই শুভকার্য্যে কৃতকার্য্য হও এবং ব্রাহ্মণোচিত আচার সর্ব্বদা পালন কারতে পরাঙ্মুখ না হও। ইতি ৫ই আশ্বিন ১৩৩১।

গ্রাম মাণিক্যহাড়
সোমপাড়া পোঃ আঃ
জেলা মুর্শিদাবাদ।

আশীর্ব্বাদক—
শ্রীকংসারিলাল ঠাকুর গোস্বামী।

১০। নোয়াখালী জেলাব অন্তঃপাতী আলিপুর গ্রামনিবাসী

পণ্ডিত শ্রীযুক্ত শ্যামাচরণ শর্ম্মা বিদ্যাবিনোদ

মহাশয়ের পত্র—

শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রমোহন সেন শর্ম্মা গীতাচার্য্য মহাশয়

সমীপেষু—

সবিনয় নমস্কার নিবেদনমিদং—

মহাশয়, বৈদ্যগণ যে বিশুদ্ধ ব্রাহ্মণ—মনূক্ত অম্বষ্ঠ শ্রেণীর ব্রাহ্মণ নহেন তাহা আমি পূর্ব্বেও বিশ্বাস কবিতাম। এক্ষণে তাঁহাদের আচার ব্যবহার এবং আপনাদের প্রদত্ত 'বৈদ্য প্রবোধনী' পড়িয়া ইহা নিঃসংশয়ে বুঝিতে পারিয়াছি। আমাদের দেশে যে সকল বৈদ্য ব্রাত্যভাবাপন্ন আছেন তাঁহাদের আচারও অন্যান্য ব্রাহ্মণ অপেক্ষা কোন অংশে হীন নহে। বিদ্বেষ বশে আপনাদের উপর অম্বষ্ঠ নামের আরোপ করিয়া এবং অম্বষ্ঠের অনুলোমজত্ব দেখাইয়া মূর্খতা পূর্ব্বক বর্ণসঙ্কর বলিয়া থাকে। ইহা অশাস্ত্রীয় এবং যুক্তিযুক্ত নহে। অম্বষ্ঠেরাও সদ্‌ব্রাহ্মণ। যাহা হউক, আমাদের দেশের নামধারী বিপ্রগণ জানেন না তাঁহারা ব্রাত্যভাবাপন্ন বৈদ্যদের সংসর্গে নিজেরাই ব্রাত্য হইয়া পড়িয়াছেন। তাঁহাদের মুখে ব্রাত্য বৈদ্যদের প্রায়শ্চিত্ত সম্বন্ধে আপত্তি মুলেই শোভা পায় না। তদ্দ্বারা তাঁহাদের অধর্ম্মই বৃদ্ধি পাইয়া থাকে। ভগবানের নিকট প্রার্থনা করি ব্রাত্যভাবাপন্ন বৈদ্যগণ সত্বর প্রায়শ্চিত্ত পূর্ব্বক উপনীত হইয়া পুনরায় ব্রাহ্মণসমাজের গৌরব বৃদ্ধি করুন। ইতি—১৫ই চৈত্র ১৩৩১ সাল।

বিনীত—

বিদ্যাবিনোদ উপাধিক-

শ্রীশ্যামাচরণ শর্ম্মা।

১১। সুপ্রসিদ্ধ স্মৃতিশাস্ত্রের অধ্যাপক

পণ্ডিতপ্রবর শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র ভট্টাচার্য্য স্মৃতিতীর্থ

মহাশয়ের পত্র—

(কলিকাতা চোরবাগান স্মৃতির টোল হইতে লিখিত)

শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রমোহন সেন শর্ম্ম সমীপেষু—

সবিনয় নিবেদন মিদং

আঁপনার মাতৃশ্রাদ্ধের পর হইতে বহু স্থানেব বৈদ্যব্রাহ্মণের একাদশ দিবসে শ্রাদ্ধাদি হইতেছে দেখিয়া বিশেষ আনন্দিত হইয়াছি। পরম্পরায় শুনিতেছি কেহ কেহ পঞ্চদশ দিবস অশৌচ গ্রহণ করিয়া ষোড়শাহে শ্রাদ্ধ করিতেছেন, তাঁহাদের এই ব্যবহার দেখিয়া বিশেষ দুঃখিত হইতেছি। কারণ বৈদ্য-ব্রাহ্মণ ইহা শাস্ত্রে কথিত আছে এবং আমাদেরও সম্পূর্ণ জ্ঞান ও বিশ্বাস আছে। অতএব ষোড়শ দিবসে শ্রাদ্ধ করায় এবং শর্ম্মান্ত নাম ব্যবহার না করায় তাঁহাদেব শ্রাদ্ধ পণ্ড হইতেছে, ইহা তাঁহারা কি একবার ভাবিয়া দেখেন না! যাহাতে সাধারণে এইরূপ ব্যবহার না করেন সে বিষয়ে আপনাদের বিশেষ চেষ্টা করা কর্ত্তব্য। দেশাচার, কুলাচার বা বর্ণাচার শাস্ত্রের বিরুদ্ধে হইতে পারে না। ইতি—

স্মৃতিতীর্থোপাধিক-

শ্রীসতীশচন্দ্র দেবশর্ম্মণঃ।

পোঃ আঃ কাড়ীকৃষ্ণনগর, গ্রাম খুনবেড়া,

জেলা মেদিনীপুর।

২২শে কার্ত্তিক

সন ১৩৩১ সাল।

১২। পণ্ডিত শ্রীযুক্ত নিশাকর রায় (দেবশর্ম্মা)
ব্যাকরণতীর্থ ব্যাকরণরত্ন
মহাশয়ের পত্র—

সুহৃদ্বর শ্রীযুক্ত বিনোদবিহারী রায় দাশ শর্ম্মা
কবিরাজ মহাশয় সমীপেষু—

কবিরাজ মহাশয় আমাদেব হাওড়া জেলার অন্তর্গত বাঁকুল গ্রামের বৈদ্যদিগকে অনেক দিন হইতে আমি জানি। তাঁহারা সর্ব্বদাই শুদ্ধাচার শুচি এবং ব্রাহ্মণাচার পালন দ্বারা আপনাদিগকে কদাচাব হইতে রক্ষা করেন, সেই জন্যই তাঁহারা ব্রাহ্মণোচিত জ্ঞানলাভ করিতে সমর্থ হন। যে সমস্ত বৈদ্য নিজেদের ব্রাহ্মণ বলিয়া মনে করিতে পারেন না, তাঁহাদের দর্শনে বড় দুঃখ হয়। কদাচারই তাঁহাদিগকে মলিন করিয়া রাখিয়াছে। আমার বিশ্বাস, বেদের সারাংশ আয়ুর্ব্বেদ শিক্ষা করিতে হইলে, ব্রহ্মচর্য্য পালন করা আবশ্যক। তাহা না হইলে জ্ঞানের উন্মেষ হয় না। অতএব আমার অনুরোধ, হীনাচার পরিত্যাগ করিয়া সমস্ত বৈদ্যদিগেরই ব্রাহ্মণ বর্ণোক্ত সদাচার পালন করা কর্ত্তব্য; যেহেতু ব্রহ্মচর্য্যাশ্রমে আয়ুর্ব্বেদ শিক্ষা করাই সনাতন প্রথা। আয়ুর্ব্বেদ প্রবর্ত্তক দেবতা, মুনি ঋষিগণের বংশধর বৈদ্যগণ কি সমস্তই বিস্মৃত হইয়া থাকিবেন? অলমতি বিস্তরেণ।

১৮।১ নং রামতনু বোস লেন,
সিমলা, কলিকাতা।

বশংবদ
ব্যাকরণতীর্থ-ব্যাকরণরত্নোপাধিক
শ্রীনিশাকর রায় দেবশর্ম্মা।

১৩। পণ্ডিত শ্রীযুক্ত রামকৃষ্ণ শিরোমণি

মহাশয়ের পত্র—

গুণগ্রামাস্পদ শ্রীল শ্রীযুক্ত বিনোদবিহারী দাশ শর্ম্ম-
কবিরাজ মহাশয় সমীপেষু—

কবিরাজ মহাশয়, সম্প্রতি লোকপরম্পরায় শ্রবণ করিয়া জানাইতেছি যে, আপনারা মন্বাদি শাস্ত্রসম্মত দশাহ অশৌচ ও যজন যাজনাদি ষড়্বৃত্তি গ্রহণ করিয়া, আত্মজাতি বোধে বিপ্রোচিত কার্য্য আরম্ভ করায় পরমানন্দ লাভ করিলাম। আপনাদেব স্বশ্রেণীস্থ বৈদ্যব্রাহ্মণগণ অবিলম্বে আপনাদিগের পন্থানুসরণ করুন, ইহাই ভগবৎ সমীপে আমার প্রার্থনা। যেহেতু শাস্ত্রবিরুদ্ধ আচরণ করিলে ধর্ম্মহানি হয়। ইতি শ্রীরামকৃষ্ণ শিরোমণি

২রা চৈত্র ১৩৩১ সাল ২৫ এ, ঘোষের লেন, কলিকাতা।

১৪। পূর্ব্ববঙ্গীয় বহু ব্রাহ্মণের দীক্ষাগুরু
পণ্ডিত শ্রীযুক্ত ক্ষিতীশচন্দ্র ভট্টাচার্য্য তন্ত্রভূষণ

মহাশয়ের পত্র—

(কলিকাতা প্রেসিডেন্সী কলেজের অধ্যাপক শ্রীযুক্ত হেমচন্দ্র
সেন শর্ম্মা এম, এ মহাশয়কে লিখিত)

মঙ্গলাস্পদেষু—

আপনার প্রেরিত 'বৈদ্যপ্রবোধনী' পুস্তিকা পাঠ করিয়া প্রীত হইলাম। বৈদ্য যে ব্রাহ্মণ এ সম্বন্ধে আরও ভূরি ভূরি শাস্ত্রীয় প্রমাণ আছে। 'বৈদ্য'

শব্দটি জাতিবাচক নহে, উহা কতকগুলি গুণ ও কর্ম্মবিশিষ্ট ব্রাহ্মণের উপাধিবিশেষ। ব্রাহ্মণের ন্যায় প্রণবাদি মন্ত্রে ও ষড়্‌বৃত্তিতে বৈদ্যদিগের আবহমান অধিকার দেখা যায় কিন্তু অতীব পরিতাপের বিষয় এখনও বৈদ্য-সমাজে সর্ব্বজনীন ভাবে ব্রাহ্মণাচার প্রচলিত হয় নাই।

আমাকে 'বৈদ্য হিতৈষিণী' মাসিক পত্রিকার গ্রাহক শ্রেণীভুক্ত করিবেন। আমি ধারাবাহিক ভাবে একটি প্রবন্ধ লিখিব মনে করিতেছি। অত্র শুভ, আগামীতে আপনাদের মঙ্গল লিখিবেন। অলমতি বিস্তরেণ। ইতি

ঢাকা মহাবিদ্যাশ্রম — শুভার্থিনঃ

তারিখ ২৫শে জ্যৈষ্ঠ ১৩২ — শ্রীক্ষিতীশচন্দ্র দেবশর্ম্মণঃ।

১৫। মুর্শিদাবাদের বহু বৈদ্যের পুরোহিত শ্রীযুক্ত করুণাময় ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের পত্র—

মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত গণনাথ সেনশর্ম্ম মহোদয়

সমীপেষু—

মহোদয়

আন্তরিক আনন্দের সহিত আপনাকে জানাইতেছি যে, স্নেহাস্পদ শ্রীমান নলীগোপাল দাশশর্ম্মা বিদ্যারত্নের নিকট হইতে বৈদ্যপ্রবোধনী, বৈদ্যহিতৈষিণী পত্রিকা ও এতদ্ব্যতীত বৈদ্যগণের উন্নতিকল্পে প্রকাশিত অনেকগুলি গ্রন্থ পাঠ করিয়া এবং এ বিষয়ে বিশেষভাবে আলোচনা

করিয়া জানিয়াছি যে, বৈদ্যগণ ব্রাহ্মণ ব্যতীত অন্য বর্ণ নহেন। সেই ধারণা হৃদয়ে বদ্ধমূল হওয়াতেই সানন্দচিত্তে আমার বৈদ্য যজমানের যাবতীয় কার্য্য যাহাতে ব্রাহ্মণোচিতভাবে নিষ্পন্ন হয়, সে বিষয়ে সাধ্যানুসারে সচেষ্ট হইয়াছি। দশাহ অশৌচ পালন এবং শর্ম্মান্ত উপাধি গ্রহণ বৈদ্যগণের একান্ত কর্ত্তব্য। যদি কোন স্থানে কুলপুরোহিত এই প্রকারে কার্য্য করিতে অসম্মত হন সেস্থলে আমি সানন্দে পৌরোহিত্য করিতে প্রস্তুত আছি। ভগবানের নিকট প্রার্থনা করি যেন তাঁহার আশীর্ব্বাদে আপনারা এই মহদনুষ্ঠানে সাফল্য লাভ করিয়া বৈদ্যের গৌরব বৃদ্ধি করেন।

ডুমকল পোঃ, মুর্শিদাবাদ — শ্রীকরুণাময় দেবশর্ম্মণঃ
৮ই আষাঢ় ১৩৩২

১৬। পূর্ব্ববঙ্গীয়
পণ্ডিত শ্রীযুক্ত শরচ্চন্দ্র ভট্টাচার্য্য
মহাশয়ের পত্র—

কল্যাণীয় শ্রীমান্ শান্তিময় গুপ্তশর্ম্ম নিরাপদেষু—

পরম শুভাশীর্ব্বাদ বিশেষ। বৈদ্যপ্রবোধনা পাঠে পূর্ব্ববর্ত্তী সংশয় বিদূরিত হইয়াছে। এতদ্দেশীয় বৈদ্যসম্প্রদায় যে ব্রাহ্মণগণেরই অন্যতম শাখা ইহা বুঝিতে পারিলাম। তবে যতদিন ইহারা ব্রাহ্মণোচিত আচার (যথাকালে উপনয়ন, ও দশাশৌচ প্রভৃতি) সম্যক্‌রূপে প্রতিপালন না করিবেন, ততদিন পূর্ব্বকৃত কলঙ্ক হইতে মুক্ত হইতে পারিবেন না। মঙ্গলময় ভগবানের নিকট প্রার্থনা করি তিনি এই সম্প্রদায়ের মধ্যে বিপ্রাচারের

সম্যক্ অনুবর্ত্তন করুন এবং ব্রাহ্মণ্যধর্ম্মের পুনঃপ্রতিষ্ঠা পক্ষে ইঁহারাও কায়মনোবাক্যে যত্নপরায়ণ হউন।

ধন্য তাঁর দয়া, যাঁহার কৃপায় ধীরে ধীরে উন্নতির সূত্রপাত হইতেছে। বিজাতীয় আচার হইতে তাই জনগণ স্বজাতীয় আচারে এবং স্ব স্ব বর্ণোচিত ও আশ্রমোচিত আচারে পুনঃ প্রত্যাবর্ত্তন করিতেছে। বৈদ্যসম্প্রদায়ের এতাদৃশ অভ্যুদয় লক্ষণে আমি বিশেষ আনন্দিত। ইহাতে আমার সম্পূর্ণ সহানুভূতি আছে। ইতি

২৭শে বৈশাখ ১৩৩২ শ্রীশরচ্চন্দ্র দেবশর্ম্মণঃ।

কারমাটার।

১৭। বেহালা চতুষ্পাঠীর অধ্যাপক

পণ্ডিতপ্রবর শ্রীযুক্ত রজনীকান্ত কাব্য-পুরাণ-তীর্থ

মহাশয়ের পত্র—

(রায় বাহাদুর দীনেশ চন্দ্র সেন শর্ম্মা মহাশয়কে লিখিত)

"ভবৎপ্রেরিতাং বৈদ্যপ্রবোধনীং নাম বৈদ্যব্রাহ্মণবিষয়ক-প্রবন্ধ-গৌরবিতাং পুস্তিকাং সমনোনিবেশং পঠিত্বা সানন্দমঙ্গীক্রিয়তে বৈদ্যাঃ পুরাণেতিহাসবোধিতা ব্রাহ্মণা ইতি। কিঞ্চ বঙ্গভাষারুণপ্রকাশো ভবান্ রামায়ণাদিষু কৃতশ্রমঃ সাম্প্রতং বৈদ্যানাং ব্রাহ্মণত্বপ্রচারণেঽপি সার্থকশ্রমঃ সন্ প্রভূতমঙ্গলং সাধয়িষ্যতীতি সম্যগাশাস্মহে।" ইতি

১৮৪৭ শকাব্দীয় সৌরমার্গশীর্ষমাসস্য দ্বাদশদিবসীয়মিদং পত্রম্।

শ্রীচন্দ্রনাথ-পাদাম্বুজ-পবিত্রিত চট্টলবাসি-
বেহালা চতুষ্পাঠী প্রবাসি-
শ্রীরজনীকান্ত কাব্যপুরাণতীর্থ জ্যোতির্ব্বিনোদ
শর্ম্মণো বয়ম।

১৮। শ্রীযুক্ত ভোলানাথ দাশ শর্ম্ম প্রণীত "সন্ধিবোধম্"
নামক পুস্তক সম্বন্ধে
৺মহামহোপাধ্যায় রাখাল দাস ন্যায়রত্ন
মহাশয়ের অভিমত।

বিষ্ণুপুরবাস্তব্য নানাদেশবিখ্যাত চিকিৎসাদি-শাস্ত্রকুশলস্য শ্রীযুক্ত হৃষীকেশ দাশশর্ম্মণ-স্তৃতীয় পুত্রেণ শ্রীমতা ভোলানাথ দাশ শর্ম্মণা বাল্যে বয়সি বিরচিতমিদং সন্ধিবোধং দৃষ্ট্বা বয়মতীব সন্তুষ্টা ভবামঃ।

১৩২০ সাল ৯ই ভাদ্র

ন্যায়তর্কতীর্থোপাধিক-
শ্রীরাখালদাস দেবশর্ম্মণাম্।

রঘুনাথ শিরোমণি
মহাশয়ের অভিমত।

বিষ্ণুপুরনিবাসিনা ধন্বন্তরিপ্রতিম বৈদ্যাবংশাবতংস শ্রীহৃষীকেশ দাশ শর্ম্মণঃ পিত্রানুকারিণা তত্তৃতীয় পুত্রেণ শ্রীভোলানাথ দাশ শর্ম্মণা সঙ্কলিতঃ সন্ধিবোধ-নামায়ং গ্রন্থঃ সন্ধিৎসূনাং সুকুমারমতীনামপি বালানামনায়াসেন সন্ধিবোধোপযোগী ভবিষ্যতি।

শিরোমণ্যুপাধিক-
১৪ই আষাঢ় ১৩২১ সাল শ্রীরঘুনাথ শর্ম্মণঃ।

১৯। দ্বারভাঙ্গার মহারাজা শ্রীযুক্ত রামেশ্বর সিংহ বাহাদুরের ভ্রাতুষ্পুত্রের উপনয়ন উপলক্ষে কবিরাজ শ্রীযুক্ত গণনাথ সেনশর্ম্মা মহোদয়কে প্রদত্ত নিমন্ত্রণ পত্র-

স্বস্তি

তর্কে গৌতমতা জগৎসুবিদিতা বেদাননে শেষতা
ব্রহ্মণ্যে জমদগ্নিতা স্মৃতিবিধৌ শ্রীযাজ্ঞবল্ক্যাত্মতা,
মীমাংসাসু মুরারিতা চ বচনে বাগীশতা, কেশতা
মর্য্যাদাসু, রতীশতা রুচিচয়ে যানাঽপ্য বিশ্রাম্যতি।
তান্ মহমহোপাধ্যায় শ্রীগণনাথ সেনশর্ম্মণো
মহাশয়ান্নত্বা নিবেদয়তি বাবু্ ব্রজনন্দন সিংহঃ।
চৈত্রে চন্দ্রমরীচি-চর্চ্চিতদলে দিক্‌সম্মিতায়াস্তিথৌ
বারে হেমকরে মমাত্মজসুযো মৌঞ্জীনিবন্ধোদ্ভবঃ।
সম্ভাব্যঃ কৃপয়া ভবদ্ভিরমলৈ ভূ্য়োঽপি সোঽত্রাগতৈঃ
কীর্ত্তিব্রাতবদাতপূর্ণ-শশভৃদ্দিদ্যোতিতাশৈঃ স্বয়ম্॥

[এখানে ইহা লক্ষ্য করিবার বিষয় যে, যে সভায় বাঙ্গালার প্রায় সমস্ত মহামহোপাধ্যায় ব্রাহ্মণপণ্ডিত নিমন্ত্রিত সেই সভায় মিথিলার প্রাচীন ব্রাহ্মণ রাজবংশের বংশধর এবং ভারতধর্ম্ম মহামণ্ডলীর সভাপতি রামেশ্বর সিংহ বাহাদুরের ভ্রাতা শ্রীযুক্ত ব্রজনন্দন সিংহ বাহাদুর প্রায় দশ বৎসর পূর্ব্বে নিমন্ত্রণ পত্রে বৈদ্য গণনাথকে "গণনাথ সেনশর্ম্মণো মহাশয়ান্নত্বা নিবেদয়তি" লিখিয়াছেন]।

২০। শ্রীযুক্ত জ্যোতিঃপ্রকাশ সেন শর্ম্মাকে

'তত্ত্বসাধন' ও 'ভাগবতভূষণ'

উপাধি দানের পত্র—

শ্রীমদ্ রাধাগোবিন্দ-পদদ্বন্দ্বারবিন্দ-মকরন্দ-পানানন্দিত-মধুব্রত-

শ্রীমৎ জ্যোতিঃপ্রকাশ দেবশর্ম্ম ভাগবৎভূষণ-

সকলমঙ্গলনিলয়েষু—

শ্রীমদ্ভগবৎপদপঙ্কজে অনন্যচিন্তা ও স্থিরপরিচর্য্যা পরিদর্শনে সুরাচার্য্যকল্প ধর্ম্মাত্মা বিদ্বজ্জনসমাজ—ভক্তপ্রবর জিতাত্মা শ্রীমান্ জ্যোতিঃপ্রকাশ দেবশর্ম্মা মহোদয়কে "তত্ত্বসাধন" ও "ভাগবতভূষণ" উপাধি অলঙ্কারে ভূষিত ও সম্মানিত করিলেন। ইতি ১৫ই মাঘ, সন ১৩২৯ সাল।

স্বাক্ষরকারিগণের নাম—

শ্রীক্ষেত্রমোহন দেবশর্ম্মণঃ।
গড়পাড়, কলিকাতা।

মাণিক্যহার নিবাসিনঃ
শ্রীশারজিস্থন্দর গোস্বামীনঃ।

বেদান্তশাস্ত্রিণঃ—
শ্রীনিত্যরঞ্জন দেবশর্ম্মণঃ।
কলিকাতা।

মাণিক্যহার নিবাসিনঃ
শ্রীকংসারিলাল ঠাকুর গোস্বামিনঃ।

শ্রীগঙ্গাধর শর্ম্মণা তন্ত্ররত্নেন।
কলিকাতা।

শ্রীঅভিরাম ভট্টাচার্য্যেন
কলিকাতা।

শ্রীঈশ্বরচন্দ্র শর্ম্ম শাস্ত্রিণঃ।
কলিকাতা।

শান্তিপুর নিবাসিনঃ—
জ্যোতীরত্নোপাধিক-
শ্রীরাধারমণ দেবশর্ম্মণঃ।

১। শ্রীযতীন্দ্রমোহন সেন শর্ম্মণে

প্রদত্তং

প্রশংসা পত্রম্।

আশোদ্ভাসিযশঃশ্রিয়া শমগুণৈঃ সন্তষিতো যঃ পুমান্
গীতাপাঠমপাঠিনোঽপি মনুজাঃ শংসন্তি যস্য স্বতঃ।
গীতাভাষ্য সুভাষণাচ্চ কৃতিভি র্যঃ কীর্ত্তিতঃ ক্ষ্মাতলে
গীতাচার্য্য ইতি প্রতীতিবিষয়া প্রীতিশ্চিরং তিষ্ঠতু॥

স্বাক্ষরমিদং—

মহামহোপাধিক—শ্রীভুবনমোহন ভট্টাচার্য্য তর্কালঙ্কারস্য।

বিদ্যভূষণোপাধিক—শ্রীসতীপতি দেবশর্ম্মণঃ।

স্মৃতিতীর্থোপাধিক—শ্রীসতীশচন্দ্র দেবশর্ম্মণঃ।

(কলিকাতা চোরবাগান চতুষ্পাঠী)।

শ্রীরসময় দেবশর্ম্মণঃ।

(১২।৫ গোয়াবাগান ষ্ট্রীট টোল)।

স্মৃতিভূষণোপাধিক—শ্রীকাশীপতি দেবশর্ম্মণঃ। শ্রীকালীপ্রসন্ন বিদ্যারত্নস্য। শ্রীনগেন্দ্রনাথ কবিরত্নস্য। শ্রীভোলানাথ কাব্যতীর্থস্য। শ্রীঘনরাম বাচস্পতেঃ। শ্রীবিজয়কৃষ্ণ স্মৃতিতীর্থস্য। শ্রীকান্তিচন্দ্র কাব্য স্মৃতিতীর্থস্য। শ্রীঅশ্বিনীকুমার স্মৃতিরত্নস্য। শ্রীরমেশচন্দ্র বিদ্যারত্নস্য। শ্রীদ্বারকানাথ দেবশর্ম্মণাম্।

ঊনত্রিংশদধিক-ত্রয়োদশশততম-শালাব্দীয়
আষাঢ়স্যৈকবিংশতি দিবসে
লিপিরিয়ং চলিতা ভট্টপল্লীগ্রামতঃ।

আর একখানি পত্র।

ললনাকুলগৌরব স্বনামধন্যা

বিদুষী শ্রীযুক্তা সরলা দেবী

পণ্ডিতপ্রবর শ্রীযুক্ত উমেশচন্দ্র বিদ্যারত্ন

মহাশয়কে লিখিয়াছেন—

বাঙ্গালার বৈদ্যগণ যে ব্রাহ্মণ তাহা ঠিকই; কেননা লাহোর অঞ্চলে আমার শ্বশুর মহাশয়দিগের সাতটি শাখা বিদ্যমান তন্মধ্যে একটি শাখা "বৈদ্য" নামে পরিচিত। ১৪ই আষাঢ় ১৩২১। [শ্রীযুক্ত রামভুজ দত্ত চৌধুরীর সহিত সরলা দেবীর বিবাহ হইয়াছে। 'দত্তোপাধিক ব্রাহ্মণ বলিয়া ইঁহারা যে, বৈদ্যশ্রেণীর ব্রাহ্মণ, পত্রেও ইহা প্রকাশ পাইয়াছে]।

দ্বিতীয় পরিশিষ্ট।

মূল বচনাবলী।

(১) অধ্যাপনমধ্যয়নং যজনং যাজনং তথা। দানং প্রতিগ্রহশ্চৈব ষট্ কর্ম্মাণ্যগ্রজন্মনঃ॥ ষণ্ণান্তু কর্ম্মণামস্য ত্রীণি কর্ম্মাণি জীবিকা। যাজনাধ্যাপনে চৈব বিশুদ্ধাচ্চ প্রতিগ্রহঃ॥ ত্রয়ো ধর্ম্মা নিবর্ত্তন্তে ব্রাহ্মণাৎ ক্ষত্রিয়ং প্রতি। অধ্যাপনং যাজনঞ্চ তৃতীয়শ্চ প্রতিগ্রহঃ। বৈশ্যং প্রতি তথৈবৈতে নিবর্ত্তেরন্নিতি স্থিতিঃ॥ (মনু)

(২) অধিয়ীরং স্রয়ো বর্ণাঃ স্বকর্ম্মস্থা দ্বিজাতয়ঃ। প্রব্রুয়াদ্ ব্রাহ্মণস্তেষাং নেতরাবিতি নিশ্চয়ঃ॥ (মনু)

(৩) বেদাভ্যাসো ব্রাহ্মণস্য ক্ষত্রিয়স্য চ রক্ষণম্। বার্ত্তাকর্ম্মৈব বৈশ্যস্য বিশিষ্টানি স্বকর্ম্মসু॥ [রক্ষাবার্ত্তাভ্যাং বৃত্ত্যর্থাভ্যাং সহোপদেশাৎ ব্রাহ্মণস্য বেদাভ্যাসঃ বেদাধ্যাপনম্ – কুল্লুকটীকা] (মনু)

(৪) দেশানাং বরদাতটং বরমতঃ সার্থাভিধানং মহা-স্থানং বেদপদাস্পদাগ্রজগণাগ্রণ্যঃ সহস্রং দ্বিজাঃ। তত্রামীষু ধনেশকেশববিদৌ বৈদ্যৌ বরিষ্ঠৌ ক্রমাৎ, চক্রে শিষ্যসুতস্তয়োঃ কৃতিমিমাং শ্রীবোপদেবঃ কবিঃ॥

(শতশ্লোকী)

(৫) বিদ্বদ্ধনেশ্বরচ্ছাত্রো ভিষক্‌কেশবনন্দনঃ। মুগ্ধবোধশ্চকারেদং বিপ্রো বেদপদাস্পদম॥ (মুগ্ধবোধ)

(৬) বৈদ্যেষু হি নৃপঃ শ্রেষ্ঠস্তপরে তস্য শাসনাৎ। বিপ্রাঃ স্তে বৈদ্যতাং যান্তি রোগদুঃখপ্রণাশকাঃ॥ তে সর্ব্বে ভিষজঃ প্রোক্তা আয়ুর্ব্বেদেষু দীক্ষিতাঃ। তেষাং বৃত্তিস্তু বিজ্ঞেয়া চিকিৎসাধ্যাপনাদিকা॥

(উশনা)

(৭) উভয়াভাবস্বরূপস্য উভয়াত্মকত্বমপি পূর্ব্ববৎ লোকগুরুতামেব নময়ন্তি। নতু বিরোধবিধৌ শ্রীমদাচার্য্যাভিনবগুপ্তপাদাঃ॥ (কাব্যপ্রকাশ)

(৮) তস্য প্রিয়তমাঃ শিষ্যাশ্চত্বারো ব্রাহ্মণোত্তমাঃ। শ্রীমুখো মাধবাচার্য্যো যাদবাচার্য্যপণ্ডিতঃ॥ দৈবকীনন্দনো দাসঃ প্রখ্যাতো গৌড়মণ্ডলে। যৈনৈব রচিতা পুস্তী শ্রীমদ্ বৈষ্ণববন্দনা॥ (চৈতন্যচরিত)

(৯) অভানি লোকৈরথ রায়ঠাকুরঃ স বৈষ্ণবত্বেন জগৎপ্রতিষ্ঠিতঃ। দয়ালুতাক্রান্তমনা মুরদ্বিষো দদৌ চ মন্ত্রং নিখিলাসু জাতিষু॥ (চন্দ্রপ্রভা)

(১০) বৈদ্যং চরিত্রবন্তং ব্রাহ্মণমুপবেশ্য সপলাশমার্দ্রশাখং যূপং নিধায়—ইত্যাদি। (আশ্বলায়ন গৃহ্যসূত্র)

(১১) নাত্মার্থং নাপি কামার্থমথভূতদয়াং প্রতি। বর্ত্ততে যশ্চিকিৎসায়াং স সর্ব্বমতিবর্ত্ততে॥ কুর্ব্বতে যে তু বৃত্ত্যর্থং চিকিৎসাপণ্যবিক্রয়ম্। তে হিত্বা কাঞ্চনং রাশিং পাংশুরাশিমুপাসতে॥ (চরক)

(১২) ন বৈ কুর্ব্বীত লোভেন চিকিৎসাপুণ্যবিক্রয়ম্॥ (ভাবপ্রকাশ)

(১৩) কপিলাকোটিদানাদ্ধি যৎফলং পরিকীর্ত্তিতম্। ফলং তৎ কোটীগুণিতমেকাতুরচিকিৎসয়া॥

(১৪) ভিষগপ্যাতুরান্ সর্ব্বান্ স্বসুতানেব যত্নবান্। অবাধেভ্যো হি সংরক্ষেদিচ্ছেদ্ধর্ম্মমনুত্তমম্॥ (অগ্নিবেশ)

(১৫) তস্যায়ুষঃ পুণ্যতমো বেদো বেদবিদাং মতঃ। বক্ষ্যতে যন্মনুষ্যাণাং লোকয়োরুভয়োর্হিতঃ॥ (চরক)

(১৬) ধর্ম্মার্থকামমোক্ষাণামারোগ্যং মূলমিত্যতঃ। চিকিৎসিতাদ্ধিতত্তরং নাস্তি লোকে হি দেহিনাম্॥ চিকিৎসিতাৎ পুণ্যতমং নকিঞ্চিদপি শুশ্রুম॥ (সুশ্রুত)

(১৭) মন্ত্রায়ুর্ব্বেদবচ্চ তৎ প্রামাণ্যমাপ্তপ্রমাণাৎ॥

(গৌতমসূত্র)

(১৮) পুরাণং মানবো ধর্ম্মঃ সাঙ্গো বেদশ্চিকিৎসিতম্। আজ্ঞাসিদ্ধানি চত্বারি ন হন্তব্যানি হেতুভিঃ॥ (মহাভারত)

(১৯) কৃষিগোরক্ষ্যবাণিজ্যং বৈশ্যকর্ম্মস্বভাবজম্। (গীতা)

(২০) তত্রানুগ্রহার্থং প্রজানাং ব্রাহ্মণৈঃ আত্মরক্ষার্থং ক্ষত্রিয়ৈর্ব্বৃত্ত্যর্থং বৈশ্যৈরিতি। (চরক)

(২১) যত্রৌষধীঃ সমাগমৎ রাজানঃ সমিতাবিব। বিপ্রঃ স উচ্যতে ভিষক্ রক্ষোহামীবচাতনঃ॥ (ঋগ্বেদ)

(২২) ওষধয়ঃ সংবদন্ত সোমেন সহ রাজ্ঞা। যস্মৈ কৃণোতি ব্রাহ্মণস্তং রাজন্ পারয়ামসি॥ (ঋগ্বেদ)

(২৩) বুদ্ধিবৃদ্ধিকরাণ্যাশু ধন্যানি চ হিতানি চ। নিত্যং শাস্ত্রাণ্যবেক্ষেত নিগমাংশ্চৈব বৈদিকান্॥ (মনু)

(২৪) আয়ুর্ব্বেদে কৃতাভ্যাসো ধর্ম্মশাস্ত্রপরায়ণঃ। অধ্যয়নমধ্যাপনং চিকিৎসা বৈদ্যলক্ষণম্॥

(২৫) আয়ূর্ব্বেদকৃতাভ্যাসো শাস্ত্রজ্ঞঃ প্রিয়দর্শনঃ। আর্য্যশীলগুণোপেত এষ বৈদ্যো বিধীয়তে॥ (চাণক্য)

(২৬) সর্ব্ববেদেষু নিপুণঃ সর্ব্বশাস্ত্রবিশারদঃ। চিকিৎসাকুশলশ্চৈব স বৈদ্যশ্চাভিধীয়তে॥ (উশনা)

(২৭) প্রত্যুৎপন্নমতি র্ধীমান্ ব্যবসায়ী বিশারদঃ। সত্যধর্ম্মপরো যশ্চ স ভিষক্ পদ উচ্যতে॥ (সুশ্রুত)॥

(২৮) শ্রুতৌ পর্য্যাবদাতৃত্বং বহুশো দৃষ্টকর্ম্মতা। দাক্ষ্যং শৌচমিতিজ্ঞেয়ং বৈদ্যে গুণচতুষ্টয়ম্॥ (চরক)

(২৯) বিপ্রাঃ শূদ্রসমাচারাঃ সন্ধ্যোপসনবর্জ্জিতাঃ। অযাজ্যযাজকা লুব্ধা দুর্ব্বৃত্তা পাপকারিণঃ॥ (মহানির্ব্বাণ তন্ত্র)॥ যে পরেষাং ভৃতিহরাঃ ষট কর্ম্মাদিবিবর্জ্জিতাঃ। কলৌ বিপ্রা ভবিষ্যন্তি শূদ্রা এব বরাননে॥ (তন্ত্রবাক্য)। অগ্নিকার্য্যপরিভ্রষ্টা সন্ধ্যোপাসনবর্জ্জিতাঃ। বেদঞ্চৈবানধীয়ানঃ সর্ব্বে তে বৃষলাঃ স্মৃতাঃ। (পরাশর)

(৩০) রিক্তহস্তো ন পশ্যেত্তু রাজানং ভিষজং গুরুং।

(৩১) কচ্চিৎ বৃদ্ধাংশ্চ বালাংশ্চ বৈদ্যমুখ্যাংশ্চ রাঘব। দানেন মনসা বাচা ত্রিভিরেতৈ র্বিভূষসে॥ (রামায়ণ)

(৩২) ঋত্বিক্ পুরোহিতাচার্য্যৈরাশীভিরভিনন্দিতঃ। দৃষ্ট্বা জ্যোতির্ব্বিদো বৈদ্যান্ দদ্যাৎ গাং কাঞ্চনং মহীম্। নৈবেশিকানি চ তথা শ্রোত্রিয়াণাং গৃহাণি চ॥ (যাজ্ঞবল্ক্য)

(৩৩) ওষধীরিতি মাতরস্তদ্বো দেবী রুপব্রুবে।
সনেয়ম্ অশ্বং গাং বাসঃ আত্মানং তব পূরুষ ॥ (ঋগ্বেদ)

(৩৪) শ্রোত্রিয়ায়ৈব দেয়ানি হব্যকব্যানি দাতৃভিঃ। অর্হত্তমায় বিপ্রায় তস্মৈ দত্তং মহাফলম্॥ একৈকমপি **বিদ্বাংসং** দৈবে পিত্র্যে চ ভোজয়েৎ। পুষ্কলং ফলমাপ্নোতি নামন্ত্রজ্ঞান্ বহূনপি॥ জ্ঞানোৎকৃষ্টায় দেয়ানি কব্যানি চ হবীংষি চ। (মনু)

(৩৫) ··· ·····মকরগুপ্তস্য প্রপৌত্রায় বরাহগুপ্তস্য পৌত্রায় সুমঙ্গল-গুপ্তস্য পুত্রায় শান্তিবারিক শ্রীশ্রীপীতবাস-**গুপ্তশর্ম্মণে** বিধিবদুদকপূর্ব্বকং তাম্রশাসনীকৃত্য প্রদত্তোঽস্মাভিঃ॥

(৩৬) ইত্থং চতুঃসীমাবচ্ছিন্নঃ··· ·····মণ্ডলগ্রামীয় কিয়ানপি ভূভাগঃ জগদ্ধর-দেবশর্ম্মণঃ প্রপৌত্রায় নারায়ণ-ধর দেবশর্ম্মণঃ পৌত্রায় নারসিংহ-ধর দেবশর্ম্মণঃ পুত্রায় গার্গ্যগোত্রায় অঙ্গিরা-বৃহস্পতি-শিনি-গর্গ-ভরদ্বাজ-প্রবরায় ঋগ্বেদাশ্বলায়ন-শাখাধ্যায়ী শান্তিবারিক **শ্রীকৃষ্ণধর দেবশর্ম্মণে** পুণ্যেঽহনি বিধিবদুদকপূর্ব্বকং··· ·· তাম্রশাসনীকৃত্য প্রদত্তোঽস্মাভিঃ॥

(৩৭) বিদ্যা হ বৈ ব্রাহ্মণমাজগাম তবাস্মি, ত্বং মাং পালয়, অনর্হতে মানিনে নৈব মা দাঃ, গোপায় মাং শ্রেয়সা তেঽহমস্মি॥ (ছান্দোগ্য)। বিদ্যা ব্রাহ্মণমেত্যাহ শেবধিস্তেঽস্মি রক্ষ মাং। অসূয়কায় মাং মা দা স্তথা স্যাং বীর্য্যবত্তমা॥ (বিষ্ণু)। যমেব তু শুচিং বিদ্যান্নিয়তং ব্রহ্মচারিণম্। তস্মৈ মাং ব্রূহি বিপ্রায় নিধিপায়াপ্রমাদিনে॥ (মনু)

(৩৮) অভিরামঃ কবীন্দ্রোঽসৌ সীতারামাদ্ধি ভূপতেঃ। **মহোপাধ্যায়পদবীং মহৎপূর্ব্বম**বাপ্তবান্॥—চায়ুঃ শ্রীপতি-দাশস্য **বিদ্যাভূষণ**-সংজ্ঞিতঃ। পরো রামেশ্বরো দাশো **বাচস্পতি**-রিতিশ্রুতঃ॥—রাঘবেন্দ্রস্য দাশস্য পুত্রো বিশ্বেশ্বরোঽভবৎ। **বাচস্পতি**-রিতিখ্যাতো গুণবান্ সচ্চিকিৎসকঃ॥—পুত্রঃ সুদামদাশস্য **শিরোমণি**-

রিতিশ্রুতঃ ॥—রূপনারায়ণো জ্যেষ্ঠো যশ্চূড়ামণি-সংজ্ঞকঃ। পরো রত্নেশ্বরো **বাচস্পতি**বন্যস্তু রাঘবঃ॥ অন্যো মুরারি গুপ্তোঽভূৎ যঃ **শিরোমণি**-সংজ্ঞকঃ॥ (চন্দ্রপ্রভা)॥—জগাম ভগনগরে পুণ্যাত্মা চন্দ্রশেখরঃ। রমানাথ **সার্ব্বভৌমঃ** কন্যামস্য ব্যবাহ চ॥—**সার্ব্বভৌমো** নরহরিঃ ভরদ্বাজকুলোদ্ভবঃ॥—**বিদ্যাধরো**ঽনন্তসেনো মুরারিগুণবারিধিঃ॥—কর্ণপুবাৎ সুতো জাতো রামচন্দ্রঃ **শিরোমণিঃ**। দুর্গাদাসস্ততো যজ্ঞে **শিরোমণি**রিতি স্মৃতঃ॥—**চূড়ামণি**রিতিখ্যাতো কনিষ্ঠো রঘুনন্দনঃ॥—গোপীকান্ত **সরস্বত্যা** কণ্ঠাভরণমগ্রজঃ। রতিকান্ত স্তথা গৌরীকান্তশ্চ রামকান্তকঃ। জ্যেষ্ঠো হি **কণ্ঠাভরণো** মধ্যমঃ **কবিভারতী**॥ কণীয়ান্ **কণ্ঠহারশ্চ** কন্যয়োরুভয়োঃ পতী। গঙ্গাধরশ্চ সেনশ্চ গোপীনাথশ্চ সেনকঃ (কণ্ঠহার)॥—সার্ব্বভৌমো জগন্নাথঃ কণীয়ান্ রামচন্দ্রকঃ। বিদিতসকলশাস্ত্রো ধার্ম্মিকঃ সত্যসন্ধঃ॥ (যশোরঞ্জিনী)॥

(৩৯) নিরোলে শ্যামসেনায় **মিশ্রায়** চ কণীয়সী॥—সুতঃ কৌতুকগুপ্তস্য পরমানন্দগুপ্তকঃ। স শিলাগ্রামসংস্থায়ি **চক্রবর্ত্তি**সুতাপতিঃ॥—গাণ্ডেয়ি-বিশ্বনাথস্য দৌহিত্রো চক্রবর্ত্তিনঃ॥ (চন্দ্রপ্রভা)

(৪০) বংশপরম্পরা-প্রসিদ্ধম্ আদিপুরুষং ব্রাহ্মণরূপম্। ক্ষত্রিয় বৈশ্যশূদ্রানাং * * * পুরোহিত-গোত্রপ্রবরম্॥

(৪১) যস্য যস্য মুনের্যো যঃ সন্তানঃ স স এব হি। তত্তদ্ গোত্রাদিনা বেদ্যঃ শ্রৈষ্ঠাদ্যস্তু স্বকর্ম্মণা॥ (চন্দ্রপ্রভা)

(৪২) ঊর্দ্ধপুণ্ড্রং দ্বিজঃ কুর্য্যাৎ ক্ষত্রিয়স্তু ত্রিপুণ্ড্রকম্। অর্দ্ধচন্দ্রস্তু বৈশ্যশ্চ বর্ত্তুলং শূদ্রযোনিজঃ॥ (ব্রহ্মাণ্ড পুরাণ)

(৪৩) সামান্যানি তু কর্ম্মাণি ব্রহ্মক্ষত্রবিশাং পুনঃ। যজনাধ্যয়নং দানং সামান্যানি তু তেষু চ॥ (ব্রহ্মাণ্ড পুরাণ)। বিপ্রক্ষত্রিয়বৈশ্যানাং

শালগ্রাম-শিলার্চ্চনে। অধিকারো ন শূদ্রানাং হরেরর্চ্চার্চ্চনে তথা॥ (ব্রহ্মবৈবর্ত্ত পুরাণ)

(৪৪) দোরুষ্মক্ষপিতারি সঙ্গররসো **রাজন্যধর্ম্মাশ্রয়ঃ**। শ্রীমল্লক্ষ্মণ সেন ভূপতিবতঃ সৌজন্যসীমাজনি॥

(৪৫) বিখ্যাতঃ ক্ষিতিপালমৌলিরভবৎ শ্রী**বিশ্ববন্দ্যো নৃপঃ**॥

(৪৬) তস্মিন্ সেনান্বয়ায়ে প্রতিসুভটশতোৎসাদন-**ব্রহ্মবাদী**। স ব্রহ্মক্ষত্রিয়াণামজনি কুলশিরোদাম-সামন্তসেনঃ॥

(৪৭) সেবাবনম্র-নৃপকোটি-কিরীট-রোচি-রম্বূল্লসৎপদনখদ্যুতিবল্লরীভিঃ। তেজো বিষজ্বরমুষো দ্বিষতামভুবন্ ভূমিভুজঃ স্ফুটমথৌষধিনাথবংশে॥

(৪৮) অবাতবদথান্বয়ে মহতি তত্র দেবঃ স্বয়ম্, সুধাকিবণশেখরো বিজয়সেন ইত্যাখ্যয়া। যদজ্ঘ্রিনখধোরণি স্ফুরিতমৌলয়ঃ ক্ষ্মাভুজো। দশাস্ত-নতিবিভ্রমং বিদধিরে কিলৈকৈকশঃ॥

(৪৯) আসীৎ গৌড়ে মহারাজ আদিশূরঃ প্রতাপবান্। সদ্বৈদ্যকুল-সম্ভূত আসমুদ্রকরগ্রহঃ। (চতুর্ভুজ)॥ শ্রীমদ্ বল্লালসেনঃ প্রকৃতি-সুচতুরঃ পুণ্যবানেকধাতা। সবিপ্রো বৈদ্যবংশোদ্ভব ভুবনপতিঃ পাতি পুত্রং তথৈব॥ ('গৌড়ে-ব্রাহ্মণ'ধৃত বারেন্দ্র-কুলপঞ্জী)। ততো বহুতিথে কালে গৌড়ে বৈদ্যকুলোদ্ভবঃ। বল্লাল-সেননৃপতিরজায়ত গুণোত্তরঃ॥ (বারেন্দ্র-কুলপঞ্জিকা)। -বৈদ্যব.শাবতংসোহয়ং বল্লালো নৃপপুঙ্গবঃ। তদাজ্ঞয়া কৃতমিদং বল্লালচরিতং শুভম্॥ (বল্লাল চরিত)।—পুরা বৈদ্যকুলোদ্ভূত বল্লালেন মহীভুজা। ব্যবস্থাপি চ কৌল্বিন্যং দুহিসেনাদি বংশজে॥ (সদ্বৈদ্য-কুলপঞ্জিকা)।

(৫০) করশর্ম্মা ভরদ্বাজো ধরশর্ম্মা পরাশরঃ (ধরশর্ম্মা চ কৌশিক ইতি বা পাঠঃ)। মৌদগল্যো দাশশর্ম্মা চ গুপ্তশর্ম্মা চ কাশ্যপঃ। ধন্বন্তরিঃ সেনশর্ম্মা দত্তশর্ম্মা পরাশরঃ। শাণ্ডিল্যশ্চ চন্দ্রশর্ম্মা অম্বষ্ঠা ব্রাহ্মণা ইমে॥

(৫১) রাম-সেনেন জগৃহে নিজদুর্দ্দৈবদোষতঃ। শ্যামদাশস্য মিশ্রস্য কন্যকা কটকস্থিতেঃ॥—অথ শরণকৃষ্ণেণ বালেশ্বর-নিবাসিনঃ। কন্যা মহেশদাশস্য গৃহীতা দৈবদোষতঃ॥—রাম সেনঃ শশী সেনঃ পুণ্ডরীকাক্ষশ্চ সেনকঃ। তে সর্ব্বে ঔড্র দেশীয় বিদদাশসুতা সুতাঃ॥—ধনিরাম ভদ্রকস্থং গোবিন্দদাশজা পতিঃ॥ (চন্দ্রপ্রভা)

(৫২) আধ্বর্য্যবং যজুর্ভিশ্চ ঋগ ভি হৌমং তথা মুনিঃ। ঔদ্গাত্রং সামভিশ্চক্রে **ব্রহ্মত্বঞ্চাপ্যথর্ব্বভিঃ**॥ ততঃ স ঋচমুদ্ধৃত্য ঋগ্বেদং কৃতবান্ মুনিঃ। যজুংষি চ যজুর্ব্বেদং সামবেদঞ্চ সামভিঃ। রাজ্ঞস্ত্বথর্ব্ব-বেদেন সর্ব্বকর্ম্মাণি স প্রভুঃ। কারয়ামাস মৈত্রেয় **ব্রহ্মত্বঞ্চ যথা স্থিতিঃ**॥ (বিষ্ণু পুরাণ)

(৫৩) বিধাতামথর্ব্বসর্ব্বস্বমায়ুর্ব্বেদং প্রকাশয়ন্। স্বনাম্না সংহিতাং চক্রে লক্ষশ্লোকময়ীং ঋজুম্॥ (ভাব প্রকাশ)

(৫৪) বেদাহ্যমৃতাঃ। (ছান্দোগ্য)। আয়ুর্ব্বেদোহ্যমৃতানাং শ্রেষ্ঠঃ।
(চরক)

(৫৫) অথোবাচ ভগবান্ ধন্বন্তরিরিতি। * * * শিষ্যোপনীয়মিতি উপনয়নং দীক্ষা। তদধিকৃত্য কৃতোঽধ্যায়ঃ শিষ্যোপনীয়স্তং তথা। অন্যে তু উপনয়নায়াত্মবত্ম নার্থকরণম্। **যদ্যপি ব্রাহ্মণাদয়ঃ প্রাগুপনীতা তথাপি আয়ুর্ব্বেদপঠনারম্ভে পুনরুপনয়নম্**। ঋক্‌যজুঃসামানি অধীত্য অথর্ব্বারম্ভে পুনর্ব্রতাবতরণং ধনুর্ব্বেদারম্ভে চ। তদ্বদত্রাপি ব্রাহ্মণক্ষত্রিয়বৈশ্যানামিত্যাদি। (ডল্বনাচার্য্যকৃত-সুশ্রুতটীকা)

(৬) বিদ্যাসমাপ্তৌ ভিষজস্তৃতীয়া জাতিরুচ্যতে। অশ্নুতে বৈদ্যশব্দং হি ন বৈদ্যঃ পূর্ব্বজন্মনা॥ বিদ্যাসমাপ্তৌ ব্রাহ্মং বা সত্ত্বমার্ষমথাপি বা। ধ্রুবমাবিশতি জ্ঞানাৎ তস্মাদ্ বৈদ্যস্ত্রিজঃ স্মৃতঃ॥ (চরক)

(৫৭) ত্রয়ী বৈ বিদ্যা ঋচো যজুংষি সামানি। (শতপথ ব্রাহ্মণ)

(৫৮) তদধীতে তদ্বেদ। (পাণিনীয় সূত্র)

(৫৯) বৈদ্য বিদ্বাংসো ভিষজো বা। (মেধাতিথি)

(৬০) বেদাজ্জাতো হি বৈদ্যঃ স্যাৎ (শব্দ)। টীকা—বেদাৎ বেদ-জ্ঞানাৎ। যথা বেদবাচক-ব্রহ্মশব্দাৎ ব্রাহ্মণশব্দো ব্যুৎপন্নস্তথা বৈদ্যোপি বেদশব্দাদিত্যর্থঃ॥ (ধরণীধর)

(৬১) অব্রাহ্মণাঃ সন্তি তু যে ন বৈদ্যাঃ সর্ব্বচ্ছেদং সাধু মন্যতে তেভ্যঃ। তদধ্বানঃ পিতরো যে চ পূর্ব্বে পিতামহা যে চ তেভ্যঃ পরেঽন্যে॥

(মহাভারত)

(৬২) নাবিদ্যানাস্তু বৈদ্যেন দেয়ং বিদ্যাধনং ক্বচিৎ।

(কাত্যায়ন-সংহিতা)

(৬৩) বিদ্যা প্রশস্তাস্যাস্তীতি বৈদ্যঃ। (চক্রদত্ত-টীকা)

(৬৪) বিদ্বান্ বিপশ্চিদ্দোষজ্ঞঃ সন্ সুধীঃ কোবিদো বুধঃ। ধীরো মনীষি জ্ঞঃ প্রাজ্ঞঃ সংখ্যাবান্ পণ্ডিতঃ কবিঃ॥ (অমরকোষ)

(৬৫) বিত্তং বন্ধুর্ব্বয়ঃ কর্ম্ম বিদ্যা ভবতি পঞ্চমী। এতানি মান্যস্থানানি গরীয়ো যদ্যদুত্তরম্॥ বিপ্রাণাং জ্ঞানতো জ্যৈষ্ঠ্যং ক্ষত্রিয়াণাস্তু বীর্য্যতঃ। বৈশ্যানাং ধান্যধনতঃ শূদ্রাণামেব জন্মতঃ॥ (মনু)

(৬৬) ভূতানাং প্রাণিনঃ শ্রেষ্ঠা প্রাণিনাং বুদ্ধিজীবিনঃ। বুদ্ধিমৎসু নরাঃ শ্রেষ্ঠা নরেষু ব্রাহ্মণাঃ স্মৃতাঃ॥ **ব্রাহ্মণেষু বিদ্বাংসো** বিদ্বৎসু কৃতবুদ্ধয়ঃ। কৃতবুদ্ধিষু কর্ত্তারঃ কর্ত্তৃষু ব্রহ্মবেদিনঃ॥ (মনু)। ভূতানাং * * * নরেষ্বপি দ্বিজাতয়ঃ॥ **দ্বিজেষু বৈদ্যাঃ শ্রেয়াংসো** বৈদ্যেষু কৃতবুদ্ধয়ঃ। কৃতবুদ্ধিষু ইত্যাদি॥ (মহাভারত)

(৬৭) কচ্চিদ্দেবান্ পিতৃন্ ভৃত্যান্ গুরূন্ পিতৃসমানপি। বৃদ্ধাংশ্চ **তাতবৈদ্যাংশ্চ** ব্রাহ্মাণাংশ্চাভিমন্যসে॥ (রামায়ণ)

(৬৮) অহং পুরা মন্দসানো ব্যৈরং নবসাকং নবতীঃ শম্বরস্য। শততমং বৈদ্যং **সর্ব্বতাতং** দিবোদাসমতিতিগ্মং যদাবম্॥ (ঋগ্বেদ)

(৬৯) ততঃ প্রকৃতিমান্ বৈদ্যঃ পিতুরেষাং পুরোহিতঃ। বশিষ্ঠো ভরতং বাক্যমুত্থাপ্য তমুবাচ হ॥ (রামায়ণ)

(৭০) ক্ষীরোদমথনে বৈদ্যো দেবো ধন্বন্তরির্হ্যভূৎ। বিভ্রৎ কমণ্ডলুং পূর্ণমমৃতেন সমুত্থিতঃ॥ (গরুড় পুরাণ)

(৭১) ওঁ চন্দ্রোঽমৃতময়ঃ শ্বেতো বিধুর্বিমলরূপবান্। যজ্ঞরূপো যজ্ঞভাগী বৈদ্যো বিদ্যাবিশারদঃ॥ (বৃঃ ধর্ম্মপুরাণ)

(৭২) ত্বাং গন্ধর্ব্বা অখনং স্ত্বামিন্দ্র স্ত্বাং বৃহস্পতিঃ। সোমো ত্বামোষধে রাজা বিদ্বান্ যক্ষ্মাদমুচ্যতে॥ (ঋগ্বেদ)

(৭৩) সৈনাপত্যঞ্চ রাজ্যঞ্চ দণ্ডনেতৃত্বমেব চ। সর্ব্বলোকাধিপত্যঞ্চ বেদশাস্ত্রবিদর্হতি॥ (মনু)

(৭৪) যথা জাতবলো বহ্নি দ´হত্যাদ্রানপি দ্রুমান্। তথা দহতি বেদজ্ঞঃ কর্ম্মজং দোষমাত্মনঃ॥ বেদশাস্ত্রার্থতত্ত্বজ্ঞো যত্র তত্রাশ্রমে বসন্। ইহৈব লোকে তিষ্ঠন্ স ব্রহ্মভূয়ায় কল্পতে॥ (মনু)

(৭৪।১) ততো দশাহেঽতিগতে কৃতশৌচো নৃপাত্মজঃ। দ্বাদশেঽহনি সংক্রান্তে শ্রাদ্ধকর্ম্মাণ্যকারয়ৎ॥

(৭৪।২) বৈয়াঘ্রপদ্যগোত্রায় সাঙ্কৃতিপ্রবরায় চ। অপুত্রায় দদাম্যেতৎ সলিলং ভীষ্মবর্ম্মণে॥

(৭৫) ব্রহ্ম ক্ষত্রেণ সহিতং ক্ষত্রঞ্চ ব্রহ্মণা সহ। সংযুক্তে দহতঃ শত্রূন্ বনানিবাগ্নিমারুতৌ॥ (মহাভারত)

(৭৬) শ্রীমদ্‌বল্লাল-সেন-দেববিরচিতঃ শ্রীদানসাগরঃ সমাপ্তঃ॥

(৭৭) শর্ম্মা দেবশ্চ বিপ্রস্য (যম)

(৭৮) বিদ্বাংসো হি দেবাঃ। (ঋগ্বেদ্)

(৭৯) ইন্দ্রাগ্নী চাশ্বিনৌ চৈব স্তূয়ন্তে প্রায়শো দ্বিজৈঃ। স্তূয়ন্তে বেদবাক্যেষু ন তথান্যা হি দেবতাঃ॥ অজরৈরমরৈস্তাবদ্ বিবুধৈঃ সাধিপৈ

ধ্রুবৈঃ। পূজ্যতে প্রযতৈরেবমশ্বিনৌ ভিষজাবিতি॥ মৃত্যুব্যাধি জরাবশ্যৈ-র্দুঃখপ্রায়ৈ সুখার্থিভিঃ। কিং পুনর্ভিষজো মর্ত্ত্যৈঃ পূজ্যাঃ স্যুর্নাতিশক্তিতঃ॥ শীলবান্ মতিমান্ যুক্তস্ত্রিজাতিঃ শাস্ত্রপারগঃ। প্রাণিভির্গুরুবৎ পূজ্যো প্রাণাচার্য্য স হি স্মৃতঃ॥ * * * প্রাণাচার্য্যং বুধস্তস্মাৎ ধীমন্তং বেদ-পারগম্। অশ্বিনাবিব দেবেন্দ্রঃ পূজয়েদাতশক্তিতঃ॥ (চরক)

(৮০) স বৈ ভাগবতঃ সাক্ষাদ্বিষ্ণোবংশাংশসম্ভবঃ। ধন্বন্তরিরিতি খ্যাত আয়ুর্ব্বেদদৃগিজ্যভাক্॥ (ভাগবত)

(৮১) মন্ত্রৈর্ব্রতৈর্জপৈ হোমৈশ্চরুভিস্তং দ্বিজাতয়ঃ। যজন্তি দেববদ্ ধন্বন্তরিরমৃতসম্ভবম্॥

(৮২) বিশ্বদেবস্য সিদ্ধস্য গৃহেঽগ্নৌ বিধিপূর্ব্বকম্। আভ্যঃ কুর্য্যাৎ দেবতাভ্যো ব্রাহ্মণো হোমমন্বহম্॥ অগ্নেঃ সোমস্য চৈবাদৌ তয়োশ্চৈব সমস্তয়োঃ॥ বিশ্বেভ্য শ্চৈব দেবেভ্যো ধন্বন্তরয়ে এব চ (মনু)

(৮৩) গুরুবদ্ভাবয়েদ্রোগী বৈদ্যং তস্য নমস্ক্রিয়াম্। মুনয়ো যদি গৃহ্নন্তি তে ধ্রুবং দীর্ঘরোগিনঃ॥ (অথর্ব্ব সংহিতা)

(৮৪) পিতৃকৃতা জনিরস্য শরীরিণঃ সমবনং গদহারিষু তিষ্ঠতি। জনিতমপ্যফলং ভিষজং বিনা ভিষগসৌ হরিরেব তনুভৃতঃ॥

(শঙ্করবিজয়কাব্য)

(৮৫) নাভিধ্যায়েন্নচাক্রোশেদহিতং ন সমাচরেৎ। প্রাণাচার্য্যং বুধঃ কশ্চিদিচ্ছন্নায়ুরনিত্বরম্॥ (চরক)

(৮৬) নাবজানাম্যহং বৈদ্যান্নবৃদ্ধান্নতপস্বিনঃ। * * * দানেন বিত্তামভিবাঞ্ছামি সত্যেনার্থং ব্রাহ্মণানাঞ্চ গুপ্ত্যা। শুশ্রূষয়া চাপি গুরূ-নুপৈমি ন মে ভয়ং বিদ্যতে রাক্ষসেভ্যঃ॥

(৮৭) সর্ব্বাসামেব জাতীনাং বৃত্তিরেব গরীয়সী। বৃত্তিঃ স্বর্গ্যা চ পুণ্যা চ বৃত্ত্যা জাতিঃ প্রবর্ত্ততে॥ (ব্যাস)

(৮৮) শ্রেয়ান্ স্বধর্ম্মো বিগুণঃ ন পারক্যঃ স্বনুষ্ঠিতঃ। পরধর্ম্মেণ জীবন্ হি সদ্যঃ পততি জাতিতঃ॥ (মনু)

(৮৯) যে ত্যক্তারঃ স্বধর্ম্মস্য পরধর্ম্মে ব্যবস্থিতাঃ। তেষাং শাস্তিকরো রাজা স্বর্গলোকে মহীয়তে॥ (অত্রি)

(৯০) স্বকর্ম্মাণি পরিত্যজ্য অর্থলোভেন বৈ দ্বিজঃ। চিকিৎসাং কুরুতে হ্যাশু পাতিত্যং সোঽধিগচ্ছতি॥

(৯১) ব্রাহ্মণাঃ ক্ষত্রিয়া বৈশ্যাঃ শূদ্রা জাতয় এব চ। সর্ব্বে তে প্রলয়ং যান্তি বৈদ্যবৃত্তিপরিগ্রহাৎ॥ (অগ্নিপুরাণ)

(৯২) অন্যজাতিকৃতঃ পাকোঽস্পৃশ্যঃ সর্ব্বজাতিভিঃ। ইতি বিজ্ঞায় মতিমান্ বৈদ্যং পাকে নিয়োজয়েৎ॥ মোহাদ্দ্বিজাতিবর্ণাদ্যৈঃ পাচিতং খাদিতে সতি। প্রায়শ্চিত্তী ভবেচ্ছূদ্রো জাতিহীনো ভবেদ্দ্বিজঃ॥

(৯৩) অম্বষ্ঠা দ্বিবিধা প্রোক্তা সারস্বতাশ্চ সৈন্ধবাঃ। সিন্ধুতীর-সমাশ্রিতাঃ সৈন্ধবাঃ পরিকীর্ত্তিতাঃ॥ (বৈদ্যকুলপঞ্জী)

(৯৪) আর্য্যাবর্ত্তাৎ সমাগত্য বঙ্গদেশে মহাবলাঃ। অম্বষ্ঠাহ্যবসন্ রাজন্ স্বাধিপত্যং ব্যতন্বত॥ (বৈদ্যকুলপঞ্জী)

(৯৫) সৌবীরাঃ সৈন্ধবা হূণাঃ শাল্বাঃ শাকলবাসিনঃ। মদ্রারাম-স্তথাম্বষ্ঠাঃ পারসীকাদয়স্তথা॥ আসাং পিবন্তি সলিলং বসন্তি সহিতাং তদা। সমীপতো মহাভাগ হৃষ্টপুষ্টজনাকুলাঃ॥ (বিষ্ণুপুরাণ)

(৯৬) তান্ দশার্নান্ স জিত্বা চ প্রতস্থে পাণ্ডুনন্দনঃ। শিবিং স্ত্রিগর্ত্তানম্বষ্ঠান্ মালবান্ পঞ্চকর্পটান্॥—অম্বষ্ঠাঃ কৌকুরাস্তার্ক্ষ্যা বস্ত্রপাঃ পল্লবৈঃ সহ॥ (মহাভারত)

(৯৭) কাশ্মীরাম্বষ্ঠসিন্ধবঃ শতমাত্রাশ্চতুরস্রাশ্চ (বার্হস্পত্যসূত্রম্)

(৯৮) বিপ্রান্ মূর্দ্ধাভিষিক্তো হি ক্ষত্রিয়ায়াং বিশঃ স্ত্রিয়াম্। জাতোঽম্বষ্ঠো * * * বিন্নাস্বেষ বিধিঃ স্মৃতঃ॥ (যাজ্ঞবল্ক্য)

(৯৯) ব্রাহ্মণঃ ক্ষত্রিয়ো বৈশ্যস্ত্রয়োবর্ণা দ্বিজাতয়ঃ। এতেষু ধর্ম্মঃ বিহিতো ব্রাহ্মণস্য যুধিষ্ঠির॥ বৈষম্যাদথবা লোভাৎ কামাদ্বাপি পরন্তপ। ব্রাহ্মণস্য ভবেচ্ছূদ্রা ন তু ধর্ম্মার্থতঃ স্মৃতাঃ॥ (মহাভারত)

(১০০) দ্বিজস্য শূদ্রাভার্য্যা তু ধর্ম্মার্থে ন ভবেৎ ক্বচিৎ। রত্যর্থমেব সা তস্য রাগান্ধস্য প্রকীর্ত্তিতাঃ॥ (বিষ্ণু)

(১০১) উঢায়াস্তু সবর্ণায়ামন্যাং বা কামমুদ্বহেৎ। তস্যামুৎপাদিতঃ পুত্রো ন সবর্ণাৎ প্রহীয়তে॥ উদ্বহেৎ ক্ষত্রিয়াং বিপ্রো বৈশ্যাঞ্চ ক্ষত্রিয়ো বিশাম্। ন তু শূদ্রাং দ্বিজঃ কশ্চিন্নাধমঃ পূর্ব্ববর্ণজাম্॥ (ব্যাস)

(১০২) তিস্রো ভার্য্যা ব্রাহ্মণস্য দ্বে ভার্য্যে ক্ষত্রিয়স্য চ। বৈশ্যঃ স্বজাত্যাং বিন্দেত তাস্বপত্যং সমং ভবেৎ॥ অব্রাহ্মণন্তু মন্যন্তে শূদ্রাপুত্র মনৈপুণাৎ। ত্রিষু বর্ণেষু পত্নীষু ব্রাহ্মণাদ্ ব্রাহ্মণো ভবেৎ॥ ব্রাহ্মণ্যাং ব্রাহ্মণাজ্জাতো ব্রাহ্মণস্যান্ন সংশয়ঃ। ক্ষত্রিয়ায়াং তথৈব স্যাদ্বৈশ্যায়ামপি চৈব হি॥ ইত্যাদি। (মহাভারত)

(১০৩) ক্ষেত্রভূতা স্মৃতা নারী বীজভূতঃ স্মৃতঃ পুমান্। ক্ষেত্রবীজ-সমাযোগাৎ সম্ভবঃ সর্ব্বদেহিনাম॥ বীজস্য চৈব যোন্যাশ্চ বীজমুৎকৃষ্টমুচ্যতে। সর্ব্বভূতপ্রসূতির্হি বীজলক্ষণলক্ষিতাঃ॥ যাদৃশন্তূপ্যতে বীজং ক্ষেত্রে কালোপ-পাদিতে। তাদৃগ্রোহতি তত্তস্মিন্ বীজং স্বৈর্ব্যঞ্জিতং গুণৈঃ॥ ইয়ং ভূমির্হি ভূতানাং শাশ্বতী যোনিরুচ্যতে। ন চ যোনিগুণান্ কাংশ্চিদ্বীজং পুষ্যতি পুষ্টিষু॥ ভূমাবপ্যেককেদারে কালোপ্তানি কৃষীবলৈঃ। নানারূপাণি জায়ন্তে বীজানীহ স্বভাবতঃ॥ ব্রীহয়ঃ শালয়ো মুদ্গাস্তিলামাষাস্তথা যবাঃ। যথাবীজং প্ররোহন্তি লশুনানীক্ষবস্তথা॥ অন্যদুপ্তং জাতমন্যদিত্যেতন্নোপ-পদ্যতে। উপ্যতে যদ্ধি যদ্বীজং তত্তদেব প্ররোহতি॥ (মনু)

(১০৪) মাতা ভস্ত্রা পিতুঃ পুত্রো যেন জাতঃ স এব সঃ॥ (বিষ্ণু)

(১০৫) সর্ব্ববর্ণেষু তুল্যাসু পত্নীঘক্ষতযোনিষু। অনুলোম্যেন সম্ভূতা

জাত্যা জ্ঞেয়াস্ত এব তে॥ স্ত্রীষ্বনন্তরজাতাসু দ্বিজৈরুৎপাদিতান্ সুতান্। সদৃশানেব তানাহুর্মাতৃদোষবিগর্হিতান্॥ (মনু)

(১০৬) ব্রাহ্মণাদ্বৈশ্যকন্যায়ামম্বষ্ঠো নাম জায়তে। (মনু)

(১০৭) পাণিগ্রহণিকা মন্ত্রাঃ কন্যাস্বেব বিধীয়তে। (মনু)

(১০৮) অসৎসন্তস্তু বিজ্ঞেয়া প্রতিলোমানুলোমজাঃ। (যাজ্ঞবল্ক্য)

(১০৯) যে দ্বিজানামপসদা যে চাপধ্বংসজাঃ স্মৃতাঃ। তে নিন্দিতৈর্বর্ত্তয়েয়ু দ্বিজানামেব কর্ম্মভিঃ॥ সূতানামশ্বসারথ্যমম্বষ্ঠানাং চিকিৎসিতম্॥ ইত্যাদি। (মনু)

(১১০) চতুর্ণামেব বর্ণানামাগমঃ পুরুষর্ষভ। অতোঽন্যেত্ব্যতিরিক্তা যে তে বৈ সঙ্করজাঃ স্মৃতাঃ॥ ক্ষত্রিয়াতিরথাম্বষ্ঠা.....এতে চতুর্ভ্যো বর্ণেভ্যো জায়ন্তে বৈ পরস্পরাৎ॥ (মহাভারত)

(১১১) বৈশ্যায়াং ব্রাহ্মণাজ্জাতোঽম্বষ্ঠো মুনিসত্তম। ব্রাহ্মণানাং চিকিৎসার্থং নির্দ্দিষ্টো মুনিপুঙ্গবৈঃ॥ (বৃদ্ধ পরাশর)

(১১২) বৈশ্যায়াং বিধিনা বিপ্রাজ্জাতোঽম্বষ্ঠ উচ্যতে। কৃষ্যাজীবো ভবেৎ সোঽপি তথৈবাগ্নেয়বৃত্তিকঃ। ধ্বাজনীজীবিকশ্চৈব চিকিৎসা-শাস্ত্রজীবিকঃ॥ (উশনা)

(১১৩) **আবেদনপত্রম্**—ব্রহ্মচর্য্যাশ্রমে বেদবেদাঙ্গাদি শাস্ত্রাণ্যনধীততয়া যাজনাদিষু ষটকর্ম্মসু নৈষাং অধিকারাস্তিষ্ঠন্তি। চতুর্ব্বেদোক্ত-ক্রিয়াসু হীনতমা চিকিৎসা এতেষাং বৃত্তি ন ষটকর্ম্ম। যদুক্তমম্বষ্ঠানাং চিকিৎসিতমিতি। যদ্বিহিতং ক্ষত্রবৈশ্যশূদ্রজাতীনাং কন্যায়াং জাতা পুত্রাঃ পিতৃবৎ জননমরণাশৌচমাচরেয়ুঃ যথা চোক্তম্ "ক্ষত্র বিট্ শূদ্রজাতীনাং যে স্বে স্বে মৃতসূতকে। তেষাস্তু পৈতৃকং শৌচং বিভক্তানাস্তু মাতৃকম্॥" যতঃ অধুনা এতে পিতৃসংসর্গত্যাগিনঃ আচারভ্রষ্টাশ্চাভবন্ ততঃ মাতৃকুলা-

শৌচভাগিনঃ। ষটকর্ম্ম সন্ত্যজ্য চিকিৎসাবৃত্ত্যৈব জীবিষ্যন্তি তথা পোষ্যবর্গ-পরিপোষণায় বৈশ্যবৃত্তিং করিষ্যন্তি। ইত্যাবেদনপত্রম্।

আজ্ঞাপত্রম্—সত্যত্রেতাদ্বাপরেষু বৈদ্যাস্তপোজ্ঞানযুক্তা বিদ্বাংসঃ আসন্। সম্প্রতি এতে শক্তিহীনা আচারভ্রষ্টাশ্চাভবন্। শ্রীমন্মহারাজাধিরাজ গণেশ-চন্দ্র নৃপতেঃ অনুজ্ঞয়া **বিপ্রাণামনুরোধাৎ** অদ্যঃ প্রভৃতি অম্বষ্ঠা বৈশ্যাচারিণো ভবিষ্যন্তি। মূলা ব্রাহ্মণাঃ অম্বষ্ঠৈঃ সহ ভোজনাদিকং নাচরেয়ুঃ। যে চ ব্রাহ্মণাঃ অমীভিঃ সহ ভোজনাদি করিষ্যন্তি তে পতিতা ভবিষ্যন্তি।

(১১৪) শর্ম্মবদ্ ব্রাহ্মণস্যস্যাদ্ বর্ম্মেতি ক্ষত্রসংযুতম্। গুপ্তদাসাত্মকং নাম প্রশস্তং বৈশ্যশূদ্রয়োঃ॥ (বিষ্ণুপুরাণ)

(১১৫) সেন রাঘবশর্ম্মণঃ।

(১১৬) ন বর্দ্ধয়েদঘাহানি প্রত্যূহেন্নাগ্নিষু ক্রিয়াঃ। ন চ তৎকর্ম্ম কুর্ব্বাণঃ সনাভ্যোঽপ্যশুচির্ভবেৎ। (মনু)

(১১৭) যেনাস্য পিতরো জাতাঃ যেন যাতাঃ পিতামহাঃ। তেন যায়াৎ সতাং মার্গং তেন গচ্ছন্ ন রিষ্যতে॥ (মনু)

(১১৮) ধর্ম্মং জিজ্ঞাসমানানাং প্রমাণং পরমং শ্রুতিঃ। দ্বিতীয়ং ধর্ম্মশাস্ত্রঞ্চ তৃতীয়ং লোকসংগ্রহঃ॥ (মহাভারত)

(১১৯) যে শাস্ত্রবিধিমুৎসৃজ্য বর্ত্ততে কামচারতঃ। ন স সিদ্ধি-মবাপ্নোতি ন সুখং ন পরাং গতিং॥ (গীতা)

(১২০) কারবঃ শিল্পিনো **বৈদ্য**। দাসা দাস্যস্তথৈব চ। দাতারো নিয়মী চৈব ব্রহ্মবিদ্ ব্রহ্মচারিণৌ। সত্রিণো ব্রতিনস্তাবৎ সদ্যঃশৌচা উদাহৃতাঃ॥ (কূর্ম্মপুরাণ)। শিল্পিনঃ কারুকা **বৈদ্যা** দাসী দাসশ্চ নাপিতাঃ। শ্রোত্রিয়াশ্চৈব রাজানঃ সদ্যঃশৌচাঃ প্রকীর্ত্তিতাঃ॥ (পরাশর)

(১২১) ত্রিরাত্রং দশরাত্রং বা শাবমাশৌচমুচ্যতে। (যাজ্ঞবল্ক্য)

(১২২) সর্ব্বেষামেব বর্ণানাং সূতকে মৃতকে তথা। দশাহাচ্ছুদ্ধি-রেতেষামিতি শাতাতপোঽব্রবীৎ॥ (মিতাক্ষরোদ্ধৃত অঙ্গিরাবচন)

(১২৩) দশাহং শাবমাশৌচং সপিণ্ডেষু বিধীয়তে॥ (মনু)

(১২৪) মৎস্যাদাঃ সর্ব্বমাংসাদা তস্মাৎ মৎস্যং বিবর্জ্জয়েৎ।

(১২৫) ন মাংসভক্ষণে দোষো ন মদ্যে ন চ মৈথুনে। প্রবৃত্তিরেষা ভূতানাং নিবৃত্তিস্তু মহাফলা [মাংসভক্ষণে মদ্যে মৈথুনে চ দোষঃ ন বিদ্যতে। অত্র তু ভূতানাং এষা প্রবৃত্তিঃ এব দোষ ইতিশেষঃ নিবৃত্তিশ্চ মহাফলা মহাফলদায়কা ইত্যর্থঃ] (মনু)

(১২৬) জাতিরত্র মহাসর্প দুষ্পরীক্ষ্যেতি মে মতিঃ। সঙ্করস্তত্র নাগেন্দ্র বলবান্ প্রসমীক্ষিতঃ॥ (মহাভারত)

(১২৭) সঙ্করে জাতয়স্ত্বেতাঃ পিতৃমাতৃপ্রদর্শিতাঃ। প্রচ্ছন্না বা প্রকাশা বা বেদিতব্যা স্বকর্ম্মভিঃ॥ (মনু)